বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান

কল্হন

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
প্রবীর মিত্র
৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
সুনীল গুহ

মুদ্রাকর :
রামকৃষ্ণ রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে এটা প্রবন্ধ নয়, তথ্যভিত্তিক রচনা— অধুনা যার পরিচিতি 'রাজনৈতিক উপন্যাস' নামে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষ্যকারকে একটু-আধটু স্থান-কালের স্বাধীনতা নিয়ে হ'য়েছে; আর তা হ'য়েছে ঘটনার শৈল্পিক বিন্যাসের প্রয়োজনেই। তবে কোথাও মূল ঘটনা বা তথ্যের বিকৃতি ঘটে নি। নিরাপত্তার কথা ভেবেই 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা গুপ্ত সমিতি'র কার্যকলাপ প্রসঙ্গে উল্লেখিত ব্যক্তিদের শুধু ছদ্মনামের মোড়কে মুড়তে হ'য়েছে।

এই বই লিখতে পূর্বপাকিস্তানের অনেক বন্ধু নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন, ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের নাম উল্লেখ করার উপায় নেই। হাকিম ভাই, সিকান্দার আবু-জাফর প্রমুখদের কবিতা এই বইয়ে ব্যবহার করা হ'য়েছে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার কয়েকজন বন্ধু তরুণ সাহিত্যিক সুভাষ সমাজদার, মনোরঞ্জন পাল, বিনয় সাহা এবং দিলীপ মিত্রের কথা উল্লেখ না ক'রলে তাঁদের কিছু হবে না, কিন্তু আমি নিজের কাছে ছোটো হ'য়ে যাব। বলতে গেলে তাদের উৎসাহ এবং অকৃপণ সহযোগিতা ছাড়া এ-বই বেরুত না। মৌখিক ধন্যবাদে তাদের ঋণ শোধ হবার নয়। ইতি।

—লেখক

মা,

ছোটোবেলায় পিলসুজের স্বপ্নালোকে বসে
তোমার মুখে রাজপুত্তুর, রাক্ষস-খোক্কস
আর দৈত্যি-দানো-ভূত-প্রেতের
গল্প শুনতে শুনতে প্রথম ছাড়পত্র পেয়েছিলাম
গল্পের সেই আশ্চর্য জগতের।
আর-একটু বড়ো হ'য়ে
তোমারই চোখ দিয়ে
একদিন ভালো বাসতে শিখলাম বাঙলাকে,
ভালোবাসলাম বাঙলার নদী, মাঠ,
ভাঁটফুল আর নরম ধানের গন্ধ,
ভালোবাসলাম বাংলাভাষাকে ;
তাই তোমার হাতে এই বই তুলে দিতে পেরে
আজ আমি তৃপ্ত।

'আমরা বাঁচতে চাই, ভোটাধিকার চাই'— ভুট্টোর ডাকে হাত তুলে সাড়া দিচ্ছে পশ্চিমপাকিস্তানের সাধারণ মানুষ।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টো বিরাট এক জনসভায় বলছেন :
আওয়াজ তুলুন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে চাই।

মিসেস ভুট্টোর নেতৃত্বে লাহোরে মেয়েরা পথে নেমে পড়েছেন ; নিন্দা করছেন
ধরপাকড় আর পুলিশি নির্যাতনের।

জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দু'-দুবার আমায় পাকিস্তানের সামরিক-শাসনের ভার নিতে বলেছিলেন। আমি রাজী হই নি। তখন দেশের পরিস্থিতির এমন কিছু অবনতি ঘটে নি যার জন্য সামরিক-শাসন জারি হ'তে পারে। ওদিকে আয়ুবের নিজেরই অজ্ঞাতে একটা সুপ্ত বাসনা বোধ হয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। তখন থেকেই চলল আয়ুব আর মির্জার সলাপরামর্শ। দু'জনই বিলাতের স্যানড্‌হারস্ট সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। আয়ুবের জন্মভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মির্জা অনেকদিন চাকুরি করেছেন।

১৯৫৩ সালের গোড়া থেকেই খাজা নাজিমুদ্দিন আর গোলাম মোহাম্মদের মধ্যে সুরু হ'ল অন্তর্দ্বন্দ্ব। লিয়াকত আলীর হত্যার পর যে নাজিমউদ্দীন একদিন নিজের গভর্নর জেনারেলের আসনটি ডেকে এনে ছেড়ে দিয়েছিলেন গোলাম মোহাম্মদকে আর নিজে নেমে বসেছিলেন প্রধান মন্ত্রীর আসনে সেই নাজিমউদ্দীনকেই শেষে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ '৫৩ সালের ২৭ এপ্রিল বরখাস্ত ক'রে তার জায়গায় এনে বসালেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে। গোলাম মোহাম্মদেরই নির্দেশে পুর্ণবিন্যস্ত মোহাম্মদ আলীর '৫৪ সালের মন্ত্রিসভায় তাঁর দুই প্রিয় জঙ্গী অফিসার ইস্কান্দার মির্জা আর আয়ুব খানেরও ঠাঁই হ'লো। আয়ুব হ'লেন দেশরক্ষা-মন্ত্রী। কিন্তু যাঁর মনের কোণে পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হওয়ার বাসনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে শুধু দেশরক্ষা-মন্ত্রী হ'য়েই তিনি তৃপ্ত হবেন কেন?

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে গোলাম মোহাম্মদ নিজের জায়গায় ইস্কান্দার মির্জাকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। মহম্মদ আলী পদত্যাগ ক'রলেন। সেই সঙ্গে আয়ুবও আবার নিজের আসনে ফিরে এলেন। দেখলেন, দেশরক্ষা-মন্ত্রী হওয়ার থেকে চীফ অফ আর্মি স্টাফ থাকাই ভালো। আসল ক্ষমতাটা থাকবে নিজের মুঠোয়। একদিন সেখান থেকেই তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। মির্জার সঙ্গে কিন্তু আয়ুবের ঘনিষ্ঠতা কমল না, আরও বাড়ল। মির্জা দেখলেন,

আয়ুবের সহায়তা ছাড়া এই টলমলে তখতে বেশি দিন টেকা যাবে না। আর আয়ুবও মির্জার মতো মুরুব্বি পেয়ে বর্তে গেলেন। সেনা-বাহিনীতে নিজের আধিপত্য দ্রুত বিস্তার ক'রে চললেন। প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ইস্কান্দার মির্জা যখন মধ্যপ্রাচ্য সফরে যান, তখন তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র আয়ুবকেও সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। সেই সফরের সময়েই নিরিবিলিতে দু'জনে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসন-কাঠামোর খসড়া পরিকল্পনা রচনা ক'রেছিলেন। ক্ষমতা ভাগাভাগির একটা রফাও হ'লো দু'জনের মধ্যে। মাত্র কুড়ি দিন আগে সামরিকশাসন জারি ক'রে যেই আয়ুবকে তিনি চীফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিসট্রেটর ক'রেছেন, সেই আয়ুবই আজ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছেন!

সামনে উঁচানো পিস্তল দেখে প্রেসিডেণ্ট মির্জার নেশার ঘোর ফিকে হ'য়ে এলো। সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তখত্ ছাড়তে হবে, নয় তো মৃত্যু অনিবার্য। বড়ো সাধের তখত্। মির্জার ভিতরটা হু হু ক'রে উঠল। মুখ তুলে তাকালেন পিস্তলধারীদের দিকে। একে একে প্রত্যেকের উপর নজর বুলিয়ে নিলেন। প্রত্যেকেই চেনা। তাঁর সাবঅরডিনেট সামরিক কর্মচারি লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কে. এম. শেখ, লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ডব্লু. এ. বারকি এবং লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আজম খান। আজম খান একহাতে একটি টাইপ-করা কাগজ মির্জার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন, অন্য হাতে উঁচানো পিস্তল।

ঘরে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। কারো মুখে রা নেই। তিনজন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল যেন তিনটি নিরেট পাথরের মূর্তি। মুখের রেখা স্থির। স্থির তাঁদের চোখের তারা।

মির্জা ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে আজম খানের হাত থেকে কাগজটা নিলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখের তারা কেঁপে উঠল। ঠোঁট কাঁপছে তির তির।

লে. জেনারেল কে. এম. শেখ কলম বাড়িয়ে দিলেন। মির্জা কলমটা হাতে নিলেন। হাত কাঁপছে। আবার তিনি তাকালেন

তিন জনের মুখের দিকে, কোনো ভাবান্তর নেই তাঁদের মুখে। কম্পিত হস্তে সই করে দিলেন সেই ঘোষণায়। তাতে লেখা, মির্জা স্বেচ্ছায় দেশের স্বার্থে আয়ুবকে প্রেসিডেণ্ট ক'রে বিদায় নিলেন চিরদিনের জন্য। শুধু তখত্ থেকে নয়, পাকিস্তান থেকেও। পাকিস্তানের সর্বেসর্বা মানুষটি মুহূর্তে নেমে এলেন পথের ধুলোয়। নিসম্বল হয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কোয়েকটা হ'য়ে কাবুলের পথ ধরে চলে এলেন লণ্ডনে। প্রেসিডেণ্ট মির্জা আজ হোটেলের মালিক। হোটেলের ব্যবসা চালাচ্ছেন পাকিস্তান থেকে অনেক দূরে, ব্রিটিশ রাজত্বে। ভাগ্যিস সময় মতো বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন !

টাইপ-করা কাগজে সই হ'তেই আজম খান কাগজটা হাতে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। প্রেসিডেণ্ট হাউসের 'হটলাইন' থেকে করাচির আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করলেন। ফোন ধরলেন পাকিস্তানের ভাবি-নায়ক জেনারেল আয়ুব খান। আজম খানের কণ্ঠস্বর ভেসে গেল। আয়ুব শুনলেন : 'এভরিথিং ডান ওয়েল। নো আনটোয়ার্ড ইনসিডেণ্ট।'

রিসিভার রেখে দিলেন আজম খান। একটু বাদেই তিন লে. জেনারেলের সতর্ক প্রহরায়, আগে পিছে সৈন্য বেষ্টিত হ'য়ে মির্জা পৌঁছলেন রেডিও-স্টেশনে। মুহূর্তে স্টেশন ডাইরেক্টর ছুটে এলেন। রেডিও-স্টেশনে আগেই মিলিটারি বসানো হয়েছে।

রাত দশটায় করাচি রেডিও-স্টেশনের ভি. আই. পি রুম থেকে ইথারে ইথারে খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা পাকিস্তানে, সারা বিশ্বে— ইস্কান্দার মির্জা বিদায় নিলেন। আয়ুব হ'লেন পাকিস্তানের সর্বেসর্বা।

আয়ুবের লেখা ভাষণটি পড়তে পড়তে সেদিন কান্নায় মির্জার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এই শেষ। সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে আজ। যেতে হবে পাকিস্তান ছেড়ে।

পাকিস্তানের লোক এ ঘোষণায় সেদিন আশ্চর্য হয় নি। মির্জার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ায় সাধারণ লোক বরং খুশিই হ'লো।

ঢাকার নবাবপুর রোডের এক পানের দোকানে দাঁড়িয়ে খবরটা শুনতে শুনতে জনৈক মোল্লাসাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বেঈমান!' জানি না কার উদ্দেশে কথাটা নিক্ষেপ ক'রলেন। বোধহয় এস্কান্দার মির্জার উদ্দেশ্যে; হয়তো আয়ুব-মির্জা দু'জনেরই উদ্দেশ্যে।

সেদিনের খবর শুনে সাধারণ লোক একটু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রেছে মাত্র। কিন্তু ৭ অক্টোবর বিস্ময়ে বোবা হ'য়ে গিয়েছিল মার্শাল ল জারির কথা শুনে। সেদিন রাত সাড়ে দশটায় বেতারে প্রেসিডেন্ট মির্জা প্রথম সে-কথা ঘোষণা ক'রেছিলেন। মার্শাল ল যে কী সাধারণ লোক তখনও জানে না। বেতারে ঘোষণা ছড়িয়ে পড়া মাত্র সারা ঢাকা শহর থম্-থম্ করতে শুরু ক'রল। রেঁস্তোরায় রেঁস্তোরায় রাজনীতির আলোচনা হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

কেন্দ্রে ফিরোজখান নূন সেদিনই দু-দুবার মন্ত্রিসভা গঠন ক'রেছেন। প্রথমবার আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে। শপথ গ্রহণ হ'তে-না-হ'তেই বাতিল হ'ল সে মন্ত্রিসভা। আওয়ামী লীগের নেতাদের বাদ নিয়ে আবার মন্ত্রিসভা গড়লেন তিনি।

এদিকে মির্জার আসনও টলটলায়মান। পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর মুস্তাক আহম্মদ গুরমানি আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে মির্জার বিরোধ তখন চরমে পৌঁছেছে। তাঁরা দু'জনেই পশ্চিম-পাকিস্তান মুসলিম লীগের পাণ্ডা। মির্জা আঁচ ক'রতে পারলেন এই বিরোধের পরিণতি, প্রেসিডেন্টের আসন থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হবে। তাই ফিরোজ খান নূন যখন মন্ত্রিসভা-গঠন নিয়ে ব্যস্ত, সারা দেশের লোক যখন দেশের রাজনৈতিক হালচাল নিয়ে আলোচনায় মত্ত, সেই সময় সবার অলক্ষ্যে মির্জা আর আয়ুবের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র হ'ল। মধ্যপ্রাচ্য শহরে গিয়ে যে-পরিকল্পনা রচনা ক'রেছিলেন দু'জনে তারই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল ৭ অক্টোবর, বিকেলবেলা।

আয়ুব পদস্থ কয়েকজন সামরিক অফিসার নিয়ে করাচি আর্মি

হেড কোয়ার্টার্সে গোপন মীটিং করলেন। তাঁদের মধ্যে তিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান, কে. এম. শেখ এবং ডব্লু. এ. বারকিও ছিলেন।

সারা পাকিস্তানকে তিনটি সামরিক জোন-এ বিভিক্ত করা হ'লো। করাচি হ'লো 'এ' জোন, করাচি বাদে সারা পশ্চিমপাকিস্তান হ'লো জোন 'বি' এবং সারা পূর্বপাকিস্তান হ'লো জোন 'সি'।

মেজর জেনারেল মালিক শেরবাহাদুর জোন 'এ'-এর সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'লেন। নির্দেশ গেল পশ্চিমপাকিস্তান জোনের শাসনকর্তা মোহাম্মদ আজাদ খানের কাছে, নির্দেশ গেল পূর্বপাকিস্তানের জি.ও.সি মেজর জেনারেল ওমরাও খানের কাছে।

সন্ধ্যে থেকেই সৈন্যদের মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। মির্জা মার্শাল ল ঘোষণা ক'রলেন রাত সাড়ে দশটায়। কিন্তু দশটার মধ্যেই পাকিস্তানের রেডিও-স্টেশন, টেলিগ্রাফ-অফিস, ওয়্যারলেস সেণ্টার মিলিটারির দখলে চলে গেছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে সমস্ত যোগাযোগ। বিমানবন্দরগুলোও এখন মিলিটারির কর্তৃত্বাধীনে। মির্জার ঘোষণার আগেই কার্যত দেশে মিলিটারি শাসন সুরু হ'য়ে গেছে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে জনসাধারণ দেখল, সারাদেশ মিলিটারিতে ছেয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় বসেছে সামরিক আদালত। সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ঘোষিত হয়েছে, গণ-পরিষদ ভেঙে গেছে, পত্রিকার ওপর সেনসর আরোপ ক'রা হ'য়েছে। আর রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করা সুরু হ'য়েছে। নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে ৯ অক্টোবর একুশটি সামরিক আইন জারি করা হ'লো। আইন অমান্যকারীদের সাজা নির্দিষ্ট হ'লো চোদ্দ বৎসর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সঙ্গে বেত্রদণ্ড এবং জরিমানা। কয়েক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হ'য়েছে এমন নজিরও আছে।

২২ অক্টোবর খান আব্দুল গফ্ফার খান, জি. এম. সৈয়দ (সিন্ধু-প্রদেশ), মৌলানা ভাসানী, সাবেক কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, আবুল মনসুর আহম্মদ, আবদুল খালেক, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ গ্রেপ্তার হ'লেন। ন্যাপ-কর্মীরা গ্রেপ্তার হ'লেন বেশি, বিশেষ ক'রে ন্যাপের হিন্দুকর্মীদের সামান্যই রইলেন কারাগারের বাইরে। যাঁরা গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, ননী চৌধুরী, চিত্ত সুতার প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মনোরঞ্জন ধর, ভবেশ নন্দী প্রমুখরাও গ্রেপ্তার হ'লেন। তাছাড়া প্রচুর রাজনৈতিক নেতার ওপর জারি করা হ'লো এবডো। এই আদেশের অর্থ হ'লো তাঁরা '৬৬ সালের আগে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না বা কোনো রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত হ'তে পারবেন না। বহু রাজনৈতিক কর্মী পলাতক হ'লেন।

মির্জা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা ক'রে দেশটাকে একজন জঙ্গী ডিক্‌টেটরের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন পাকিস্তান থেকে।

মির্জাকে বিতাড়নের কারণ দেখাতে গিয়ে কিছুদিন পরে আয়ুব সাংবাদিকদের বলেছিলেন, মির্জার সঙ্গে অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজস আছে। তাছাড়া আমি নিজে তাঁর সম্পর্কে এমন সব কথা জানতে পেরেছি যে এরপর আর তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদে রাখা চলে না। মির্জা সম্পর্কে এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না।

আয়ুব সেদিন বলেন নি বটে, কিন্তু সে-রহস্য উদঘাটিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালের মে মাসে। সারা দেশে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল সেই ঘটনায়।

তখ্‌তে বসেই আয়ুব আলীবাবার মতো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেলেন। রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুবের আর একটি কাজ হ'লো মজুতদার আর চোরাইচালানকারীদের গ্রেপ্তার করা।

সোনা চোরাইচালান করার অভিযোগে করাচির কয়েকজন কোটিপতি ব্যবসায়ীকে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হ'লো। তাছাড়া তাদের সমস্ত সোনাও বাজেয়াপ্ত করা হ'লো। করাচির আরও দু'জন চোরাই-চালানদার হাজি হাবিব খোজা এবং আগা রসুলকে ৪ লক্ষ টাকা ক'রে জরিমানা এবং সাতবছর জেল দেওয়া হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী খুরোও রেহাই পান নি। কালোবাজারী ব্যবসায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু এসবের চেয়েও এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। যে-ঘটনায় সারা পাকিস্তানে তোলপাড় সুরু হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন। হঠাৎ একদিন সকলে ঘুম থেকে উঠে খবর পেল, আয়ুব গুপ্তধন পেয়েছেন। করাচি বন্দরের অদূরে আরব-সাগরের নিচ থেকে বস্তা বস্তা সোনার বাট পাওয়া গেছে। করাচি অনেকদিন থেকেই সোনা চোরাইচালানের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত। সৎ কর্মচারিরা সেই ঘাঁটির উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেরাই উৎখাত হ'য়েছেন। যে-ঘাঁটি এতকাল ছিল দুর্ভেদ্য। মার্শাল ল-এর পর সেই সব ঘাঁটির রহস্য উন্মোচিত হ'লো। আমেরিকার একটি বিখ্যাত সোনার ব্যবসাদার কোম্পানীর ছাপ-মারা সোনার বাট পাওয়া গেল অজস্র। শেষ পর্যন্ত তার মূল্য দাঁড়াল ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড। কে ভাবতে পেরেছিল তখ্‌তে বসতে-না বসতেই আয়ুব এমন কুবেরের ভাণ্ডার পেয়ে যাবেন!

সকলেরই মনে সেদিন প্রশ্ন, কোত্থেকে এলো এই সোনার বাট? আবদুল্লা ভাট্টি আর কাসিম ভাট্টি ধরা পড়ার পরই সে উত্তর পাওয়া গেল। আবদুল্লা ভাট্টি আর কাসিম ভাট্টি দুই ভাই। সারা বিশ্বের স্বর্ণ-চোরাইচালানকারীদের মুখে মুখে তাদের নাম। আমেরিকা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের পুলিশ-অফিসাররা পর্যন্ত যাদের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছেন এই সেই ভাট্টি ভ্রাতৃদ্বয়। নানান পরিচয়ে, নানান পোশাকে

ঘুরে বেড়ায় তারা দেশে দেশে। কখনো আরব-ব্যবসায়ী, কখনো সিন্ধুপ্রদেশের ব্যবসায়ী, কখনো-বা হজযাত্রী। গোপনে সংবাদ পেয়ে পুলিশ এলো এয়ারপোর্টে কাসিম ভাট্টিকে ধরতে। কোথায় কাসিম ভাট্টি? সেই নামের, সেই পরিচয়ের কোনো লোকই যে প্লেন থেকে নামল না। মাছের পেটে ক'রে সোনা চালান যে দেয়, পাসপোর্ট জাল করা আর পোশাক পাল্টানো তো তার কাছে নস্য। তাছাড়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে সাধারণ একজন পুলিশ পর্যন্ত যার সহায় তার আবার ভয় কী? একজন চোরাই-চালানদারের সঙ্গে যে একটি রাষ্ট্র-প্রধানের যোগসাজস থাকতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে হয়েছিল আবদুল্লা ভাট্টি আর কাসিম ভাট্টি ধরা পড়ার পর। যারা ছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আয়ুবের হাতে তারাও ধরা পড়ল। আর পড়ল বলেই এ যুগের এক আশ্চর্য কাহিনী আমরা জানতে পেলাম।

দিনটা ছিল ১৯৫৯ সালের ১৩ মে।

কয়েকদিন থেকেই পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকার পাতা জুড়ে কাসিম ভাট্টি সম্পর্কে এমন সব চাঞ্চল্যকর কথা বেরুতে লাগল যে সেদিন দশটা না বাজতেই সারা করাচি শহরের লোক ভেঙে পড়ল স্পেশাল কোর্টের প্রাঙ্গণে। বিচারগৃহে তিল ধারনের স্থান নেই। উকিল-ব্যারিস্টার আর সাংবাদিকে গিজগিজ করছে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে মামলা সুরু হওয়ার অপেক্ষা ক'রছে।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। ধীরে ধীরে কাসিম ভাট্টি আসামীর ডেকে এসে দাঁড়াল, সোজা হ'য়ে। চারিদিকে একবার চোখটা বুলিয়ে নিল। সরকারি এডভোকেট 'মাননীয় বিচারক' বলে মামলা সুরু ক'রলেন।

সরকারি উকিলকে জেরা ক'রতে হয় নি। কাসিম ভাট্টি

নিজে থেকেই তিন হাজার শব্দের এক স্বীকারোক্তি দাখিল ক'রল। শোনাল তার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী। তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী শুনে শুধু কোর্টের লোক নয়, পাকিস্তানের লোক সারা বিশ্বের লোক স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন।

ভিটদ্বীপের এক দরিদ্র জেলের সন্তান কাসিম ভাট্টি। বাবার সঙ্গে জেলে-ডিঙ্গিতে আরবসাগরের নীল জলের ঢেউ কেটে কেটে অনেক দূর দূর চলে যেত কিশোর কাসিম। পরিবারে নিত্য অনটন। উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও তার বাবা তাদের জন্য সবদিন দু'মুঠো অন্ন সংস্থান ক'রতে পারতো না। কিশোর কাসিম তাই সব সময়ই ভাবত-কী করে এই অনটন দূর করা যায়, কী করে টাকা করা যায়।

সেই সময় ভিটদ্বীপেই ব্লু রঙের স্যুট পরিহিত একটা লোকের সঙ্গে তার আলাপ হ'লো। সাহেব দেখে ভাট্টি লোকটির কাছে পয়সা চাইছিল। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। লোকটি তাকে কাছে ডেকে বসাল। তাদের পরিবারের খবরাখবর নিল। বলল, তাদের কোনো অভাবই থাকবে না যদি কাসিম তার কথামতো কাজ ক'রে। অনেক টাকা দেবে সে তাকে। কাসিম সানন্দেই রাজী হ'য়ে গেল সে-প্রস্তাবে। কাসিম তখনো জানতো না কী সে কাজ।

পরদিন থেকে সুরু হলো তার নতুন জীবন। মাছের ঝুড়ির নিচে সোনার বাট লুকিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে সুরু ক'রল কাসিম, প্রথম যেদিন সে একাজে নেমেছিল সেদিন ভয়ে বুকটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠেছিল। সে শুধু একবারই। ডানপিটে কাসিমের তখনই মনে পড়ল ক্ষুধায় কাতর তার মা-বাপ-ভাই-বোনের কথা। দুর্জয় সাহসে সে তার নতুন কাজ সুরু ক'রল। আস্তে আস্তে ঘাঁতঘোঁত জেনে নিয়ে কাসিম একদিন নিজেই দল ক'রল। কাসিমের প্রধান সহায় হ'লো তার ভাই আবদুল্লা। দিনে দিনে ভিটদ্বীপ থেকে করাচিতে, করাচি থেকে বার্মা,

বার্মা থেকে লণ্ডন, ন্যুইয়র্ক সব জায়গায় তার দলের বিস্তার ঘটল। নিঃস্ব কাসিম হ'য়ে উঠল কোটিপতি।

তারপরে কাসিম ভাট্টি যা জানিয়েছিল সে কাহিনী আরও, আরও আশ্চর্য, বলতে কি প্রায় অবিশ্বাস্য! কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তানীদের যে সে-সব কথার একটাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

সেদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে কাসিম ভাট্টি সেই কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই শোনাচ্ছি সেই আশ্চর্য কাহিনী :

মাননীয় বিচারপতি, প্রথমেই আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমি দোষী। ছোটোবেলায় দারিদ্র্য আর পরবর্তী জীবনে আপনারা যাঁদের বলেন দেশনেতা, দেশপ্রেমিক, যাঁদের আপনারা রেখেছেন দুর্নীতি বন্ধ করতে, মজুতদার, কালোবাজারী আর চোরাচালানদার ধরতে, তাঁদেরই চাপে আমি এপথে থাকতে বাধ্য হ'য়েছি।

বার বার আমি এজীবন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছি, কিন্তু পেতে দেন নি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা, মুক্তি পেতে দেন নি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন। আমাকে ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রেছেন করাচির চীফ পুলিশ কমিশনার এ. টি. নাকভি, পুলিশের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল মালিক হক নওয়াজ তিয়ানা, আরো সব পুলিশ অফিসার এবং সরকারি কর্মচারি। তাঁদের খাঁই মেটাবার জন্যেই আমি এই ঘৃণ্য জীবন ছাড়তে পারি নি।

একদিন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদকেও আমি বলেছিলাম, আর এসব ভালো লাগে না। জীবনের আর কয়টা দিনই-বা বাকি। এবারে ভদ্রভাবে বাঁচার মতো সুযোগ দিন।

গোলাম মোহম্মদ সেদিন মুচকি হেসে বলেছিলেন, কেন, এইতো দিব্যি আছেন। আপনি তো সব সুযোগই পাচ্ছেন। পার্টি, হোটেল কিছুই বাদ যাচ্ছে না। সমাজের উঁচুতে আছেন। আপনার

জন্য তো সাতখুন মাপ, মিঃ নাকভিকে আপনার সম্পর্কে আমার বলাই আছে। শুধু আমাব পাওনাটা........বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন আমাব দিকে। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে কয়েকটা দিন। নিরাশ হ'য়ে আমাকে সেদিন হোটেলে ফিরে আসতে হ'য়েছিল এবং পরদিনই লোক মারফত পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাতে হ'য়েছিল গোলাম মোহম্মদকে।

আর-একদিন গোলাম মোহম্মদ আমায় ফোনে ডেকে পাঠালেন। গাড়ি হাঁকিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে তার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে দেখি আবও তিন ভদ্রলোক। বসলাম। অন্য লোকেব সামনে কেন ডেকেছেন কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত করছিলাম। তখন গোলাম মোহম্মদ নিজেই বললেন, মিঃ ভাট্টি এঁবা আমাব বিশেষ বন্ধু। আববের লোক। এদেশে থেকে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চান, আপনাব লাইনেই, বুঝতেই তো পারছেন। পাকিস্তান আর পাবস্য উপসাগব দিয়ে এবা ব্যবসা কবতে চান। আপনারই ব্যবসা। যাকে আমি বলি 'কিং অব বিজ্‌নেস্'। আপনি এদেব একটু হেলপ্ ক'ববেন। বলে ভদ্রলোক তিনজনকে আমাব হোটের ঠিকানা দিয়ে আমাব সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ বক্ষা ক'রতে বললেন। মনে মনে তখন ভাবছিলাম, বলি, মাপ ক'ববেন স্যার। আমি ·সব পারব না। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কবতে সাহস পাই নি। আমি তাঁদের সাহায্য ক'বেছিলাম। গভর্নব জেনাবেলেব আদেশে একান্ত অনুগত নাগবিকেব মতো আমি আমাব কর্তব্য পালন ক'রেছিলাম।

ইস্কান্দার মির্জা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পব ভাবলাম, এবারে হয়তো ভালো ভাবে বাঁচার সুযোগ পাব। হায় হতোস্মি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মির্জা নিশ্চয়ই এসব অনুমোদন ক'রবেন না। অভ্যন্তরীণ বিষয়কমন্ত্রী থাকৃ. কালেই আমার সঙ্গে মির্জার যোগাযোগ হয়। পাকিস্তান স্পেশাল পুলিশের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল শেখ রফিউদ্দীন একদিন হোটেলে এসে আমাকে বললেন,

আমি মিঃ মির্জার ডানহাত। বিশ্বস্ত অনুচর। যদি বাঁচতে চান, গারদের বাইরে থাকতে চান তাহ'লে পঞ্চাশ হাজার টাকা আজই চাই। আপনি ব্যবসা ক'রে কোটি কোটি টাকা ক'রবেন আর আমরা আমাদের ন্যায্য বখরা পাব না—এ তো হয় না মিঃ ভাট্টি। বুঝলাম, টাকা না দিলে রেহাই নেই। ৫০,০০০ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম। এর পর দফায় দফায় মোটা টাকা আমি তাঁকে দিয়েছি।

আগেকার পুলিশ কমিশনার মিঃ নাকভিকেও আমি প্রচুর টাকা দিয়েছি। একবার একসঙ্গে দিয়েছিলাম ৬০,০০০ টাকা।

মির্জা যখন প্রেসিডেন্ট হ'লেন তখনও রেহাই পাই নি। তাঁর স্ত্রীর জন্য দামি হার গড়িয়ে দিতে হ'য়েছে। বার বার চাহিদা মাফিক টাকার জোগান দিতে হ'য়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনও বাদ যান নি। তাঁকেও আমি অনেক টাকা দিয়েছি। তিনি টাকা নিতেন পুলিশের তদানিন্তন ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল মিঃ মালিক হক নওয়াজ তিয়ানার মারফত। টাকা ছাড়াও একবার মিঃ ফিরোজ খান নূনকে আমি ১০০০ হাজার তোলা সোনা দিয়েছি।

মাননীয় বিচারপতি, এই সব রথী-মহারথীদের খাঁই মেটাতে গিয়েই আমি ভালো হবার সুযোগ পাইনি। তাঁরা আমায় এপথে থাকতে বাধ্য ক'রেছে। মহামান্য আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা, সুযোগ পেলে আমি সৎনাগরিক রূপে বাস ক'রব। এই ঘৃণ্য জীবন ছেড়ে দেব। আমার অপরাধ মার্জনা ক'রে আমাকে একবার মানুষের মতো বাঁচতে দিন।

কথা বলতে বলতে কোটিপতি ভাট্টির গলাও কান্নার আবেগে রুদ্ধ হ'য়ে এসেছিল। দুর্ধর্ষ চোরাইচালানকারীর চোখও সেদিন সজল হ'য়ে উঠেছিল।

কোর্টের চার দেওয়াল ছাড়িয়ে পরদিন সারা পাকিস্তানে সেই চাঞ্চল্যকর কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। রেঁস্তোরায় রেঁস্তোরায়

শুধু একই আলোচনা। গোলাম মোহম্মদ, ফিরোজ খান নূন, ইস্কান্দার মির্জাকে পাকিস্তানের মানুষ কোনোদিনই ক্ষমা ক'রতে পারবে না। তাদের উদ্দেশ্যে সারা দেশের লোক সেদিন ছ্যা-ছ্যা ক'রে উঠেছিল। তথাকথিত স্বার্থান্বেষী, লোলুপ, দেশের শত্রু রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ আর ঘৃণা সেদিন সোচ্চারিত হ'য়ে উঠেছিল। তাদের শাস্তিতে জনসাধারণ খুশিই হ'য়েছিল। কিন্তু বালুচ নেতা সরদার আতাউল্লাহ খান মোঙ্গল, আবদুল বাকি, আবদুল গফ্‌ফার খান, মৌলানা ভাসানী, শেখ মজিবুর রহমান—এরাঁও কি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত? না। তাঁদের বিরুদ্ধে সে অপবাদ দেবার দুঃসাহস আয়ুবেরও নেই। তাঁদের অপরাধ তাঁরা দেশ-প্রেমিক। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা নিজেদের প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন চান, জনগণের মঙ্গল চান। আয়ুব কথাটা ঘুরিয়ে বলেন। বলেন, তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। তাঁরা পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা সায়ত্বশাসনের ধুয়া তুলে দেশটাকে টুকরো টুকরো ক'রে দিতে চায়।

আয়ুবের সে কথা দেশবাসী কখনো বিশ্বাস করে নি, করবেও না। সেই সব নেতারা দশকোটি মানুষের নমস্য। দেশবাসী তাঁদের কথা পবিত্র বাণী বলে মনে ক'বে।

তাই তো আয়ুবের আক্রোশের খর্গ নেমে এসেছিল তাদের ওপর। তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে পথের কাঁটা সরিয়ে রাখলেন আয়ুব।

আয়ুব প্রায়ই বলতেন, তাঁর ক্ষমতায় আসা এক আশ্চর্য ঘটনা। পৃথিবীতে এই অক্টোবর বিপ্লবের তুলনা নেই। এমন রক্তপাতহীন বিপ্লব আর কেউ কখনো দেখে নি।

তাই কি?

বেলুচিস্তানের নিরীহ মানুষের ওপর আয়ুব যে নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছেন সারা বিশ্বে তারও নজি ' বড়ো বেশি নেই।

শহীদভাই মানে সংবাদের সহযোগী সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ কায়সারই আহম্মদজাই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। আহম্মদজাই বেলুচ সাংবাদিক, ন্যাপের একজন কর্মীও। ন্যাপ কনফারেন্স কভার ক'রতে ঢাকায় এসেছিলেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল পার্টির কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়া, পদ্মা-মেঘনা বিধৌত পূর্ববাঙলাব সবুজ মাঠ আর ছায়া-ঢাকা গ্রাম দেখে বেড়ানো। প্রেসক্লাবের বেলকনিতে শহীদভাই আর আহম্মদজাই বসে কথা বলছিলেন। সামনের টেবিলে ধূমায়িত কফির কাপ। একটা চেয়ার খালি ছিল। বোধ হয় কেউ ছিল একটু আগে। আমাকে দেখেই শহীদভাই কৃত্রিম আদেশের স্বরে বললেন, 'এদিকে এসো।'

সুবোধ বালকের মতো গুটি গুটি গিয়ে বসলাম। মুখে আমি তখন কৃত্রিম ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছি।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শহীদভাইকে আহম্মদজাই জিজ্ঞেস করলেন, 'হি ফিয়ার্স ইউ মাচ। ইজ হি ইউব ইয়ংগার ব্রাদার ?'

শহীদভাইও আমার দিকে একবার তাকিয়ে সকৌতুকে বলে উঠলেন, 'ওহ্ সিওর।'

আমি এবারে হেসে আহম্মদজাইকে ইংরেজিতে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ, শহীদভাইকে ভয় পায় না, এমন ইয়ং সাংবাদিক ঢাকায় কমই আছে। শহীদভাইয়ের কাছে আমাব মতো অনেকেরই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি, বুঝলে ? শহীদভাই শুধু আমাদের ওস্তাদ নন, সকলেরই প্রিয় ভাইয়া।'

কৃশ বেঁটে-খাটো মানুষটি শহীদভাই ক্যাপসটেন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'কলহন, তোষামোদের বহরটা একটু বেশি দেখছি। আজকে চা ছাড়া কিছু পাবে না।' বলেই আমার জবাবের অপেক্ষা না ক'রে বয়কে ডেকে একটা চিকেন কাটলেট, এক কাপ কফির অর্ডার দিলেন।

আহম্মদজাই এতোক্ষণে আমাদের সম্পর্কটা বুঝতে পেরে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, উপভোগ ক'রছিলেন শহীদভাইয়ের ভাবভঙ্গি। শহীদভাইয়ের অর্ডার দেওয়া শেষ হ'তেই আহম্মদজাই আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'আান ইউ আর এ জার্নালিস্ট ?'

শহীদভাই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'শুধু একজন প্রমিজিং সাংবাদিকই নয়, সাহিত্যিকও।'

যে-প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়, শহীদভাইয়ের মুখে তা শুনে সত্যিই রাগ হ'লো। বললাম, 'শহীদভাই চললাম, কাটলেট খাওয়া আজ কপালে নেই দেখছি।' বলে উঠতে যেতেই শহীদভাই হাত ধরে টেনে বসালেন। 'আরে, এতেই চটে যাচ্ছো ?'

'চটবো না !' যিনি আদমজী পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্য-কৃতির জন্য, সারেঙ বউ-এর মতো উপন্যাস যাঁর লেখা, আর কবিতার কথা বাদই দিলাম। সেই আপনি যদি আমায় সাহিত্যিক বলতে সুরু করেন তাহ'লে কথাটা ব্যঙ্গের মতো শোনায়। কীই-বা দু'চারটে টুকিটাকি গল্প-প্রবন্ধ লিখি যে সাহিত্যিক হ'য়ে গেলাম। ক্ষুব্ধস্বরে শহীদভাই-এর কথার জবাব দিলাম।

'আচ্ছা বাবা, ঘাট হ'য়েছে। তুমি সাহিত্যিক নও। এবার থেকে তোমায় পচা সাংবাদিক বলব।' শহীদভায়ের কণ্ঠে মৃদু কৌতুকের সুর।

আহম্মদজাই আমাদের মান-অভিমান আর কলহ উপভোগ ক'রছিলেন সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে।

শহীদভাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হ'লো আমাদের দু'জনের এখনো পরিচয়ই তো হয় নি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কলহন, ইনি হ'লেন....'

কাটলেটে ছুরি চালাতে চালাতে তার কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই বললাম, 'জানি, নাম শুনেই পরিচয় পেয়ে গেছি। বেলুচ-সাংবাদিক। আনোয়ার জাহিদের কাছে আগেই পরিচয় পেয়েছি।'

'আচ্ছা সে নয় হ'লো। আসল কথা হ'চ্ছে আহম্মদজাই পূর্ব-বাঙলার গ্রাম দেখতে চান। তুমি দু-একদিন ওঁকে সঙ্গ দিতে পারবে?'

শহীদভাইয়ের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই বলে উঠলাম, 'বাঃ রে, সুদূর বেলুচিস্তান থেকে এসেছেন; আমাদের সম্মানীয় অতিথি। আর এই সামান্য কাজটুকু ক'রতে পারব না?'

'বেশ। শাহাবাগের রুম নাম্বার থারটি ওয়ান। কাল সকালে ডেকে নিয়ে বেরিও। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শহীদভাই আবার বললেন, 'একটু বেরুচ্ছি, কাজ আছে। তোমরা গল্প ক'রো।

পর দিন আহম্মদজাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নারায়ণগঞ্জে এসে লঞ্চে উঠলাম। পূর্বপাকিস্তানের বিখ্যাত নদীবন্দর। পাটের ব্যবসার জন্য এর আর-এক নাম প্রাচ্যের ডাণ্ডি।

২নং জেটিতে দেখলাম স্টীমার 'গাজী' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূম্র উদ্‌গীরণ ক'রছে। আট-ন' বছর আগেকার নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে এ-নারায়ণগঞ্জের কোনো মিল নেই। নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং হ'য়েছে। যেখানটায় ছিল এক সময় কাঠের পাটাতনের সারি সারি ঘর, সারি সারি চায়ের স্টল, দোকানে দোকানে লাউডস্পীকারের প্রতি-যোগীতায় কান পাতা যেত না, সেইখানে হ'য়েছে সুন্দর বাগান। এ-দেখে আয়ুবের আমলে পূর্বপাকিস্তানের যে উন্নতি হ'য়েছে, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। ছিঁটে-ফোঁটা যা দিয়েছে তাতেই এ-ই। পূর্বপাকিস্তান যদি তার ন্যায্য বখরা পেত তাহ'লে এদেশ আবার সোনার দেশ হ'য়ে যেত। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, আর গোয়ালে গোরু নিয়ে সুখী সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠত পূর্ববাঙলা। একটা হিসাব দিচ্ছি। তাতেই খানিকটা বোঝা যাবে অবস্থাটা।

পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬৫ ভাগ জোগায় পূর্বপাকিস্তান। অথচ রাজস্ব বণ্টনকালে লোকসংখ্যা পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্বপাকিস্তান পায় মাত্র ৩৫ ভাগ। ১৯৪৭ থেকে '৬১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হ'য়েছে ১২৯৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ব্যয় করা হ'য়েছে। মাত্র ৩ শ' কোটি টাকা। উন্নয়ন-প্রকল্পে বিদেশ থেকে পাকিস্তান যা সাহায্য পায়, তার ৮০ ভাগই ব্যয় হয় পশ্চিমপাকিস্তানে। বেসরকারি অর্থ বিনিয়োগেরও ৯০ ভাগ যায় পশ্চিমপাকিস্তানে। এমনি বৈষম্য আছে চাকুরির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সর্ব ক্ষেত্রে।)

বাঁশের ওপর কাঠের পাটাতন ফেলা সিঁড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে মনে হচ্ছিল লঞ্চ-ঘাটটা পাশের সুদৃশ্য টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পাশে যেন এঁদো বস্তি।

এ-লঞ্চের ও-লঞ্চের ছাদ থেকে কিছু লোক চোঙা মুখে দিয়ে তালতলা-সিরাজদীঘা-কমলাঘাট বলে তারস্বরে চীৎকারের প্রতিযোগীতা সুরু ক'রে দিয়েছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে কানে তালা প্রড়ে যাবার দাখিল। আমাদের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না। কিছু না ভেবেই তালতলার লঞ্চে উঠে পড়লাম।

আহম্মদজাই লঞ্চের রেলিং-এ ভর দিয়ে অবাক হ'য়ে বড়ো বড়ো চোখ ক'রে দেখছে লঞ্চ-ঘাটার দৃশ্য।

সময় হ'তেই, আসলে যাত্রী বোঝাই হ'তেই সুকানি এসে হাল ধরল ছাদের ওপরকার ছোট্ট কুঠরি মতো ঘরটাতে। টুং টুং ক'রে বেল বাজাল। লঞ্চের দড়ির বাঁধন খোলা হ'লো। লগি ঠেলে প্রথমে লঞ্চটাকে গভীর জলে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়া হ'লো। পিছনে জলের বগ্‌লানি ছেড়ে ঘট্-ঘট্-ঘট্ আওয়াজ তুলে লঞ্চ ছুটে চলল শীতলক্ষ্যার ওপর দিয়ে।

দুদিকের বড়ো বড়ো গুদামগুলো দেখিয়ে আহম্মদজাই জিজ্ঞেস ক'রল, 'এগুলো কী?'

বললাম, 'পাটের গুদাম। সারা পূর্বপাকিস্তানের সব পাট প্রথমে এখানে আসে। বেলিং হয়ে পরে চিটাগাং পোর্ট হ'য়ে বিদেশে চালান যায়।'

একটু থেমে আবার বললাম, 'জানো, এই পাটকে সোনালি সুতো বলা হয়। পাটের ওপর এখানকার লোকের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর ক'রছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশিটাই আসে পাট থেকে। সেই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা হ'চ্ছে, টেলিভিসন আসছে অথচ যেসব চাষী এই পাট উৎপাদন করে তারা দু'বেলা দুমুঠো খেতেও পায় না। মৌলানাসাহেব এইসব সর্বহারা বঞ্চিত চাষীদের মুখে দুটো ভাত দেওয়ার জন্যই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।'

মৌলানাসাহেব বলতে যে মৌলানা ভাসানীকেই বোঝায়, দেখলাম আহম্মদভাইও তা জানে। তাই কোনো প্রশ্ন তুলল না। ন্যাপকর্মীদের কাছে মৌলানা ভাসানী 'মৌলানাসাহেব' বলেই পরিচিত।

এই বৃদ্ধ বয়সেও মৌলানাসাহেব পূর্বপাকিস্তানের সায়ত্বশাসন এবং শ্রমিক-চাষীদের জন্য সংগ্রাম ক'রে চলেছেন। মৌলানা-সাহেব নিজে কখনো মন্ত্রীত্ব নেন নি। অনেকবার সে সুযোগ তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি মন্ত্রী ক'রেছেন অনেককেই। কিন্তু নিজে কখনো মন্ত্রী হন নি। পাকিস্তানে তিনি 'কিং মেকার' বলেই পরিচিত।

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ করে সিটি বাজিয়ে একটা ইস্টিমার পাশ কাটিয়ে গেল। দূর থেকে নামটা ভালো ক'রে পড়তে পারলাম না। চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে 'অস্ট্রিচ'। ইস্টিমারের ঢেউয়ের ঝাপটা এসে লাগল লঞ্চের গায়। লঞ্চটা দুলে-দুলে উঠে চলতে লাগল। অদূরে জেলেরা ডিঙি ক'রে মাছ ধরছে। নৌকার সঙ্গে লাগানো আছে একটা বাঁশের চৌকো ফ্রেম। ফ্রেমে আটকানো জাল।
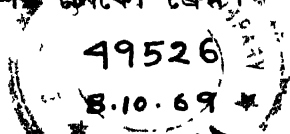
নৌকার ওপরকার বাঁশের ফ্রেমের একাংশে পা চেপে ধীরে ধীরে জালটা তুলল জেলেরা। জাল ভর্তি কতো মাছ। রৌদ্রের আলোয় রুপোর টাকার মতো চকচক ক'রছে মাছগুলো।

আহম্মদজাই বলে উঠল, 'বাঃ কী সুন্দর!'

'তুমি ইলিশমাছ খেয়েছ?' আহম্মদজাইকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম।

'হিল্‌শা! সে আবার কী মাছ?' বলে অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে।

মৃদু হেসে বললাম, 'ইলিশমাছই খেলে না, বাঙলাদেশের খেলে কী তবে? হোটেলের চপ-কাটলেট আর মাংস খেয়ে বাঙলাদেশের মহিমা আর কী বুঝবে? পদ্মার ইলিশমাছভাজা আর লেবুপাতা দিয়ে পান্তাভাত যা লাগে না কী বলব! খেলে জীবনে তা ভুলবে না।'

'সত্যি!' বড়ো বড়ো চোখ ক'রে আহম্মদজাই আমার দিকে তাকাল।

আমি একটু ভেবে বললাম, 'কাল তো হবে না, পরশু তোমায় ইলিশমাছভাজা আর পান্তাভাত খাওয়াব। দেখবে খেয়ে।'

তালতলা নেমে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম অনেক দূর। দু'পাশে মাঠ আর মাঠ। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে বিখ্যাত আইরলবিলে। বিল তো নয়, যেন নদী। প্রচুর মাছ পড়ে প্রতি বছর।

মাথার ওপর চড়া রোদ। একটানা অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আহম্মদজাই অবশ্য নির্বিকার। ওঁর বোধ হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি বলে কিছুই নেই। পথের পাশে এক জায়গায় কয়েকটা হিজলগাছ জরাজরি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার নিজের গরজেই তার ছায়ায় বসে পড়লাম। আহম্মদজাইও বসল।

ঝোলা থেকে মুড়ি আর ফেনি বাতাসা বের ক'রে সোদনকার খবরের কাগজের ওপর রেখে চিবুতে সুরু ক'রলাম। আসার সময় তালতলাবাজার থেকে নিয়ে এসেছিলাম। বাতাসা আর মুড়ি খেতে খেতে আহম্মদজাই 'নাইস' 'হাউ টেস্টফুল' বলে বারবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রছিল। ইংরেজিটা আহম্মদজাই ভালোই বলে। তবে দেশি টানটা আছে। বালুচ, ব্রাহুই, পশ্‌তু—এই তিনটি ভাষায়ই বেলুচিস্তানে চলে। তিনটের একটাও আমার জানা নেই। তাই ইংরেজিতেই কথা হচ্ছিল আহম্মদজাই-এর সঙ্গে। ভাঙা ভাঙা উর্দুতেও কথা বলা চলত। আহম্মদজাই-এর আবার তা পছন্দ নয়। পারতে সে পশ্‌তু ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে না। না হ'লে ইংরেজি। উর্দু কখনোই নয়।

রাস্তার ঢাল থেকে সুরু হ'য়েছে ধানক্ষেত।

যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠভরা সবুজধান। দিগন্তে সবুজ বনানী দৃষ্টি সীমার বাইরে পর্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে দুষ্টু হাওয়া ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে তুলে যাচ্ছিল। সর্ সর্ সর্ আওয়াজ উঠছিল সেই সঙ্গে। দেখতে দেখতে আহম্মদজাই বলল, 'সত্যি, তোমাদের দেশটা ভারি সুন্দর! কতো সহজে এখানে ফসল ফলে। কতো বড়ো বড়ো নদী তোমাদের এখানে। আমাদের ওখানে মাটি যেমনি রুক্ষ তেমনি জলের বড়ো অভাব। মার্চ-এপ্রিলে নদীর জল তির-তির ক'রে বয়। নুড়িগুলো পর্যন্ত দেখা যায়।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছ, আমাদের দেশটা ভারি সুন্দর। তাইতো আমাদের এক কবি বলেছেন, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।....এখানে আশ্বিনের ভোরে আকাশের গাঢ় নীল পাখনায় নিঙড়ে নিয়ে বক্ আর মাছরাঙা উড়ে চলে। দেখবে, আম জাম কাঁঠাল গাছে অজস্র চুলের চুমা। এমন নরম ধানের গন্ধ, কলমীর ঘ্রাণ, এমন কচি ঘাস, ঘাসের বুকে গঙ্গাফড়িং আর কাঁচপোকাদের আনন্দ বিহার কোথাও পাবে

না।' একটু থামলাম, আমার অজান্তেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভিতর থেকে। বললাম, একসময় দুধ ভাত আর মাছের কোনো অভাবই ছিল না। কিন্তু করাচি আর পিণ্ডির কর্তারা তিলে তিলে আমাদের শুষতে শুষতে ছোবড়া ক'রে ফেলেছে। দু'চারটে শহরের সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট দিয়েই দেশের উন্নতি নয়। নারায়ণগঞ্জের যে সুন্দর জেটিটা দেখলে তা তৈরীর পিছনে অবশ্য অন্য কারণ আছে। বিদেশ থেকে যত অতিথি আসেন, আদমজী জুটমিল তাদের দেখানো চাই, এসিয়ার সবচেয়ে বড়ো জুটমিল। চাই লক্ষ্যার বুকে বেড়ানো। তাদের যাওয়া-আসার পথটা তো আর নোংরা ক'রে রাখা চলে না।' একটু থেমে আবার বললাম, 'আমাদেরই পয়সায় করাচি-রাওয়ালপিণ্ডিতে বড়ো বড়ো দালান উঠছে। মন্ত্রীরা দেশে দেশে তোফা আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান ক'রতেই গলদঘর্ম হ'য়ে যাচ্ছি। আমাদেরই পয়সায় কেনা সেবার জেট থেকে আমাদেরই বালুচ আর পাখতুন ভাইদের ওপর আয়ুব বোমা বর্ষণ ক'রছে—এর থেকে দুঃখের আর কী হ'তে পারে।')

আমার কথায় কী ছিল জানি না। দেখলাম, আহম্মদজাই-এর দৃষ্টি ইষৎ উদাস; দু'চোখে বিষণ্নতা। তা' দিকে একবার তাকিয়েই আবার বললাম, 'আয়ুবের জঙ্গীশাসনের প্রতিবাদে তোমরাই সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছ, নির্যাতিত হ'য়েছ। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কায়েমীশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা তোমরা। প্রেরণা আমাদের বরকত-সালাম। শহীদভাই তাই বলেছেন :

'তোমাদের জন্য আমার
কান্না পায় না
তোমাদের জন্য হৃদয়ে কোনো বিক্ষোভের
ঝড় ওঠে না
কোনো আক্ষেপও না।

তোমাদের জন্য বেদনায় উন্মথিত
হয় না হৃদয়টা
কেন না হৃদয় তো এখন কানায় কানায় পূর্ণ
গৌরবে, উপলব্ধিতে আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধায় —
আমার এই ঐশ্বর্য, এই গৌরব, এই স্পর্ধা
তোমাদেরই দেওয়া
তোমাদেরই জন্যে।'

আহম্মদজাই বাংলা বোঝে না। কিন্তু দেখলাম তন্ময় হ'য়ে শুনছে শহীদভাইয়ের কবিতাটা। হয়তো কণ্ঠধ্বনি তাঁর হৃদয় স্পর্শ ক'রে থাকবে। ইংরেজিতে কবিতাটার মানে বলে দিতেই আহম্মদজাই আমার হাতছুটো চেপে ধরে বলল, 'কলহন, তোমাদের বাঙলাদেশের মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষকে তোমাদের এই কবিতার কথা জানাব। বলব তোমাদের কথা। বাঙলাদেশে এসে আমার অনেক লাভ হ'লো। অনেক পেলাম।'

তারপরই তার দৃষ্টি উদাস হ'য়ে গেল। বুঝি-বা হারিয়ে গেল দিগন্তরাল প্রসারিত সবুজ ধানক্ষেত পেরিয়ে লালপাথরের এবড়ো-খেবড়ো পথের ধারে বেলুচিস্তানের কোনো গ্রামে। একটু বাদে ধীরে ধীরে একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে আহম্মদজাই বললো, মার্শাল ল জারি হবার পর আমাদের ওপর যে কী অত্যাচার গেছে, এখনো চলছে এতদূরে বসে তোমরা তার কতটুকুই-বা জানো। সে অত্যাচার তো চোখে দেখ নি, দেখলে শিউরে উঠতে। খবরের কাগজে সে-সব খবর বেরুলে সারা ছুনিয়া আঁতকে উঠত।'

তারপর একটু ম্লান হেসে বলল, 'আর-একদিন তোমায় সে কথা শোনাব। বেলা পড়ে আসছে, আজ ওঠো।'

সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, দূরে বাঁশবাগানের মাথায় তার আলোটা যাই-যাই ক'রছে।

ফিরতির পথ ধরলাম। তু'জনেই নীরবে হাঁটছি। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি সেদিন। বেলুচিস্তানে সৈন্যদের অত্যাচারের টুকরো টুকরো কাহিনী যা এ-পর্যন্ত কানে এসেছে সে-সব ছবির মতো মনের পর্দায় এলোমেলো ভাবে ঘোরা-ফেরা ক'রছিল।

এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিং-এর রেস্তোঁরায় বসে সেই নারকীয় অত্যাচারের কাহিনী আহম্মদজাই আমায় শুনিয়েছিল। তাঁর প্লেনের কিছুটা দেরি আছে। কোল্ড ড্রিংকস্-এ স্ট্র ডুবিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে আহম্মদজাই বললো, 'আমাদের দেশটা বড় গরীব। পাথুরে জমিতে ফসল ফলাতে হিঙ্গল-ঝোব-পিসিন লোরার জল আর কতটুকু? তোমাদের মতো পদ্মা-মেঘনা তো আমাদের নেই। বড়ো কষ্টে জোয়ার ফলাতে হয়। মেষ চরাতে হয় দূর দূরান্তে গিয়ে।

'ভেবেছিলাম, দেশ স্বাধীন হ'লে আমাদের তুঃখ যাবে, আমরা মোটামুটি খেতে-পরতে পারব, মাতৃভাষার বিকাশ সাধনের অধিকার পাব, পাব সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার। কিন্তু আমাদের মতো বঞ্চিত আর কেউ নয়। তোমরা তবু তোমাদের মাতৃভাষার ইজ্জতটা রেখেছ।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আমরা পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষা-ভাষীদেরই ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ চাই। আমরা চাই না যে, শুধু বাংলা বা উর্হু ই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হ'য়ে থাকুক। লোক-সংখ্যার দিক থেকে বিচার ক'রলে আমরা নিশ্চয় দাবি ক'রতে পারি বাংলাই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হউক। কিন্তু আমরা তা বলি না, আমরা চাই বাংলা-উর্হুর মতো প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষা বিকাশের সুযোগ পাক্। প্রত্যেকেই সায়ত্বশাসন লাভ করুক। সায়ত্বশাসন ছাড়া আঞ্চলিক উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু কায়েমীশাসকরা তা হ'তে দেবে না। তাদের আঁতে ঘা পড়ে যে!'

'জানি। হাজি দানেশসাহেব, মৌলানাসাহেবের মুখে এ কথা আমি শুনেছি। তোমরা সকলেরই জন্য ভাব। তোমাদের

নৈতিক সমর্থনই তো আমাদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে মদৎ জোগাচ্ছে। তারপরে বলল, 'যাক্, যে-কথা বলছিলাম। জানো তো, আমরা জান দিতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারি না। দুর্ধর্ষ বৃটিশও আমাদের মাথা নোয়াতে পারে নি। ১৮৪৫ সালে স্যার চার্লস্ ন্যাপিয়ারের সৈন্যবাহিনীও বালুচদের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে নি। বীরের শোণিতে এখানকার মাটি ধৌত হয়ে আসছে বহু যুগ ধরে। তাই আয়ুবের সৈন্যদের কাছে আমরা পরাজয় মানি নি। জোয়ারের রুটি আর দিশি বন্দুক সম্বল করে আয়ুবী ফৌজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। পনের লাখ বালুচের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আয়ুবের সেবার জেট, মেসিনগান, মর্টার আমাদের মাথা নোয়াতে পারবে না। আয়ুব আর আয়ুবের মোসাহেবরা কী বলে জানো?' বলে আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে সুরু ক'রলো, 'বলে, আমরা বালুচরা নিজেদের ভালো বুঝি না, নিজেদের উন্নতি চাই না। আমরা সড়ক উন্নতিতে বাধা দিয়েছি। উদাহরণ দেখিয়ে বলেছে, আমরা সারভন্দ্ রোড তৈরী ক'রতে দিচ্ছি না। হ্যাঁ, সারভন্দ্ রোড আমরা তৈরী করতে দিই নি সত্যি, কিন্তু কেন দিই নি জানো?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

আহম্মদজাই বলতে লাগল, 'সারভন্দ্ রোডের আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। কোনো জায়গার সঙ্গে সংযোগের প্রয়োজনও নেই। খুজদুর থেকে বেলি পর্যন্ত তো রাস্তা আছেই। তাতেই আমাদের কাজ চলে যায়। আমাদের ফসল ফলানোর সুযোগ সুবিধা না ক'রে দিয়ে, লেখাপড়া শেখার জন্য স্কুল-কলেজ তৈরী না ক'রে দিয়ে হঠাৎ ৭ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এই রাস্তা তৈরীর গরজ পড়ে গেল কেন সরকারের? এই রাস্তা তৈরীর পিছনে সরকারি দুরভিসন্ধির কথা আমরা বুঝি। বুঝি বলেই বাধা দিয়েছি। এই রাস্তা তৈরী ক'রে সরকার চায় ১৫ হাজার বর্গমাইলের ২লক্ষ লোককে

মিলিটারির টহলের আওতায় আনতে। আমাদেরই হত্যার জন্য, নির্যাতনের জন্য যে-রাস্তা তৈরী হচ্ছে আমরা তা তৈরী করতে দিতে পারি না।'

একটু নীরব রইল আহম্মদজাই। তার দৃষ্টি উদাস। সম্ভবতঃ সেই দৃষ্টি বেলুচিস্তানের দারামূলা, সারুনা, খুজদুর, নূরদিন-না-আনার, ঈদ মোহাম্মদ, বানত্ আনারি প্রভৃতি গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছিল। বোধ হয় শুনছিল, কতো স্বামীহারা, পুত্রহারা নারীর আর্তনাদ। কতো প্রেমিক-প্রেমিকার হতাশ্বাস যে বেলুচিস্তানের গেরুয়া রঙের পাহাড়ি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!

রেঁস্তোরার জানালা দিয়ে রানওয়ের দিকে তাকালাম। অদূরে খুলনো হ্যাংগারে দেখলাম 'কনভেয়ার' একটা মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে।

আহম্মদজাই আবার সুরু ক'রলো। কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্তন হ'য়েছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে ভেসে আসছে সে স্বর। 'ঠিক কোন্ তারিখ মনে নেই, তবে '৬৩ সালের নভেম্বরের কোনো একদিন হবে। আরহালজি গ্রামে নাচের উৎসব চলেছে। আমি আরহালজির লোক। গাঁয়ের সেরা ব্যাকপাইট বাদক নওয়াজ খান মাঝে দাঁড়িয়ে ব্যাকপাইট বাজিয়ে চলেছে। তার পরনে লাল-নীল রঙচঙে পোশাক। চক্রাকারে নাচছে গাঁয়ের মেয়েরা তার চারিদিকে। তারাও সেজেছে রঙ-বেরঙের পোশাকে। অদূরে স্থানে স্থানে আগুনের ধুনি। পরীবানুও আজ সেজেছে খুব। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। রঙ লেগেছে মনে, ভালোবাসার রঙ। সানঝের-খেল বন্দুকের ওপর থুতনি রেখে দেখছিল পরীবানুর নাচ। বালুচদের কাঁধে বন্দুক সর্বদাই থাকে। বিশেষ করে সারভন্দ্ রোড তৈরী করার পরিকল্পনা শোনার পর থেকে। পাহারা বসিয়েছি আমরা। সরকারি লোক রাস্তা তৈরী ক'রতে এলেই বাধা দেব। সান্ঝের-খেলের বন্দুক হাতছাড়া করা উপায় নেই। আরহালজির নেতৃত্ব যে তারই ওপর।

মজবুত তার শরীরের গঠন। সুপুষ্ট পেশি। যথার্থ পুরুষ বলতে যা বোঝায়, সান্‌ঝেরখেল তাই। বয়স পঁচিশ-এর বেশি নয়। চোখে তার দীপ্তি। দীপ্তি পরীবানুর চোখে। পরীবানু তার খালাত বোন। আরহালজি গাঁয়ে পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয় আর নেই। পরীর বয়স আঠারো হয়তো পেরোয় নি। তার বাবা ছিল গাঁয়ের সর্দার। বালুচদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি জানাতে গিয়ে আয়ুবের সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে সে। যুবক সান্‌ঝেরখেলই এখন সর্দার। কুমারীদের 'হীরো' সান্‌ঝেরখেল। পরীর স্বামী ভাগ্য নিয়ে ওর বান্ধবীরা ওকে ঈর্ষা করে। বিয়ে অবশ্য এখনো দু'জনের হয় নি। সামনের মার্চে হবে। সবাই জানে সেকথা। বান্ধবীদের ঈর্ষাকাতর কথার জবাবে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে পরী বলে, 'সান্‌ঝারখেলকে সাদি ক'রতে আমার বয়েই গেছে। বীর না ছাই! এখন পর্যন্ত শত্রুদের একটা এরোপ্লেনই ঘায়েল ক'রতে পারল না!'

বান্ধবীরা হেসে জবাব দেয়, 'তুই পাশে থাকলে দেখবি, ঠিক ঘায়েল করবে।'

সানঝেরখেল বন্দুকের নলে থুতনি রেখে হয়তো ভাবছিল পরীবানুর কথা। ছোটোবেলায় ওই পাহাড়ি ঝরনাটা পেরিয়ে ওরা চলে যেত আঙুর ঝোপে, কোনোও দিন বা তাগাজ ঝোপের আড়ালে বসত। বসে বসে দু'জনে কতো গল্প ক'রত। রাঙা ধুলো উড়িয়ে ছুটোছুটি ক'রত গাঁয়ের পথে পথে। দূরে পাহাড়ের মাথায় যখন বরফ জমত, দু'জনে তাকিয়ে থাকত নিঃশব্দে সেইদিকে। চোখের দৃষ্টিতে সারত না-বলা কথা।

নাচ খুব জমে উঠেছে। ব্যাকপাইটের সুরেলা আওয়াজ গড়িয়ে চলেছে উপত্যকা থেকে উপত্যকায়। আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে সে সুর।

রাত বেশি হয় নি। গোটা আটেক হবে বোধহয়। নাচ দেখছে গাঁয়ের যুবক ছেলে বুড়ো আর বুড়িরা।

এমন সময় মোহাম্মদ খান ছুটে এলো। উত্তেজিত স্বরে সানঝের-খেলের কানে কানে কী বলল। শুনেই সানঝেরখেল থামাতে বলল নাচ। ব্যাকপাইট হঠাৎ স্তব্ধ হ'লো। মেয়েরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল অজানা আশঙ্কায়। সানঝেবখেল উত্তেজিত স্বরে বলল, সরকারি ইঞ্জিনীয়াররা সারভন্দ্ রোড তৈরী ক'রছে। আমরা আমাদের মৃত্যুর রাস্তা কিছুতেই তৈরী হ'তে দিতে পারি না। চলো, বেরিয়ে পড় সব।'

মুহূর্তে চাপা উত্তেজনায় ভিড়টা দুলে উঠল একবার। পর-মুহূর্তেই ছিটকে বেরিয়ে গেল জোয়ান মবদরা। বন্দুক হাতে বেরিয়ে পডলাম সবাই। সবার আগে চলেছে সানঝেবখেল। একবার পেছন ফিরে তাকাল সে। দেখল, অপলকে তাঁর দিকে চেয়ে আছে তাঁর পরী, পবীবানু।

এতগুলো লোক যে বাতের বেলায়ও বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে সরকারি ইঞ্জিনীয়ারবা ভাবতেই পারে নি। ওরা হৈ-হৈ করে এসে পড়তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল যন্ত্রপাতি ফেলে। একজন সৈন্য গুলি চালাল। কিন্তু সানঝেরখেলের গুলির আঘাতে পর-মুহূর্তেই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। গড়িয়ে পডল পথের ঢালে। অপর সেপাইরা তখন গুলি চালাতে চালাতে পিছনে হটছে।

জয়ের আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে ফিরলাম গাঁয়ে। জানতাম, এই শেষ নয়, সুরু। সরকার এতে ক্ষিপ্ত হ'যে আমাদের ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালাবে। দারামূলা, সারুনা, খুজদূর, নূরদিন-না-আনার, ঈদ মোহাম্মদ, আনারি বান্ত প্রভৃতি গ্রামে খবর পাঠানো হ'লো। প্রস্তুতি সুরু হ'য়ে গেল লড়াইয়ের। আমাদের নেতা আলাউল্লাহ খান মোঙ্গল, আব্দুল বাকিকে আয়ুব কারাগারে আটকে রেখেছিল। ভেবেছিল, নেতার অভাবে আমাদের আন্দোলন বানচাল হ'য়ে যাবে। কিন্তু সরকার জানে না জেলে থাকলেও তাঁদের আত্মা, হাজার হাজার দেশবাসীর ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি আমাদের সামনে র'য়েছে।

তারাই জোগাচ্ছে উদ্দীপনা। লড়াই করার সাহস দিচ্ছে। লড়াই আমাদের চলবেই। আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই। আমরা আয়ুবের জাঁবে হ'য়ে থাকতে চাই না।

পরদিন খবর পাওয়া গেল লাকি বারান, ওয়াদ-শহর, ওয়াদ-তহসিল, সারীদা সালাবি এবং কানরানচ্ থেকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বহু নিরীহ গ্রামবাসীকে; ঘর দোর ভেঙে তছনচ ক'রে দিয়েছে। মেয়েদের চুলের ঝুটি ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলেছে।

শুনে টগবগিয়ে উঠল গায়ের রক্ত। রাতের অন্ধকার নামতেই ওই সব জায়গার পুলিশ-ফাঁড়িতে আক্রমণ চালালাম। অনেক দূর দূর গাঁ থেকে লোক এসেছে। আমাদের দিশি বন্দুকের পাশেও ওরা টিকতে পারল না। পারবে কেন? ওরা ক'রছে চাকুরি, আমরা লড়ছি নিজেদের জন্যে। নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে। নিজেদের স্বাধিকার আদায় ক'রতে।

অনেক পুলিশকে সেদিন প্রাণ দিতে হ'য়েছিল আমাদের হাতে। হতাহতের সংখ্যা আমাদের দিকেও কম ছিল না।

পুলিশ-ফাঁড়ি থেকে বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যা পাওয়া গেল বেটে দেওয়া হ'লো আশ-পাশ গাঁয়ের সর্দারদের মধ্যে। আধুনিক, উন্নত সে-সব অস্ত্র। আহত আর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হ'লো যার যার গাঁয়ে।

ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠাতে সুরু ক'রল। সংঘর্ষ চলল দু'তরফে। পাহাড়ের আড়াল থেকে লড়াই ক'রতে লাগলাম আমরা। কিছুতেই ওরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। দিনের পর দিন চলল তীব্র লড়াই।

রোজার মাসটা আমরা শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আয়ুবের সৈন্যরা আমাদের তা থাকতে দেয় নি। সেই সময়ও মুহূর্তের জন্য কাঁধ থেকে বন্দুক নামাতে পারি নি। প্রতি মুহূর্তে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা। এরই মধ্যে চলল ঈদের আয়োজন। আসন্ন

কাঁধে ক'রে আহতদের নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো গাঁয়ে, চিকিৎসার জন্য। পরে মৃত দেহগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো কবর দিতে। গুনে দেখা গেল, বোমার আঘাতে ৩০০ জনের মতো আহত হ'য়েছে, ২৬ জন মারা গেছে, তার মধ্যে ছয়টি শিশুও র'য়েছে। ঘরে ঘরে মেয়েদের যত্নে তৈরী খাবার সেদিন আর কারু খাওয়া হয় নি।

মৃতদেহ সামনে রেখে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা বন্দুক হাতে শপথ নিলাম, এর বদলা নেবই।

জোর প্রস্তুতি চালালাম। আতাউল্লাহ খান মোঙ্গল আর আব্দুল বাকির পরিবারের লোকেরা আমাদের নেতৃত্ব দিল। গাঁয়ে গাঁয়ে যুবকরা রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে! রক্তে জেগেছে সংগ্রামের ডাক।

২০ ফেবরুয়ারি সকালে বিমান থেকে লিফলেট ছড়ানো হ'লো। কালাত ডিভিসনে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই এসে দেখল আকাশে আকাশে হাজার হাজার কাগজ সূর্যকরে চিক চিক ক'রতে ক'রতে নামছে নিচে। ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামময়। ছেলেরা ছুটোছুটি ক'রে কাগজ কুড়োচ্ছে। একটা লিফলেট তুলে নিলাম। লিফলেটের মর্ম: ওই অঞ্চলের সকল ছেলেবুড়ো মেয়ে শিশুকে তিন দিনের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত হ'তে হবে। অন্যথায় তাদের গ্রাম ঘর-দোর সব ছারখার ক'রে দেওয়া হবে। লিফলেট লেখা হ'য়েছে দু'ভাষায় উর্দু আর পশ্‌তুতে। স্বাক্ষর করেছেন কালাত ডিভিসনের কমিশনার।

দুটি কারণে এ আদেশ মানা অসম্ভব। প্রথমত, তিন দিনে কয়েক লক্ষ লোকের একত্র হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এ তো ভীরুর মতো আত্মসমর্পণ। কমিশনারের আদেশ আমরা অগ্রাহ্য ক'রলাম। জানি, নির্যাতন বাড়বে। বাড়ুক। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও নিজেদের ইজ্জত র'খব।

মাত্র তিনদিন সময় দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু সেই তিনটি দিনেরও তর সইল না। ২৩ ফেবরুয়ারি বোমা ফেলল সারুনায়

একটি কাফেলার ওপর। ঝালাওয়ান যাচ্ছিল তারা। সেই নিরীহ, নিরস্ত্র কাফেলার ওপর বোমা ফেলার কী প্ররোচনা ছিল সেদিন ? কী ক্ষতি তারা ক'রেছিল ? বহু নিরীহ লোক প্রাণ দিল সেই বোমার ঘায়ে।

খবর শুনে উপত্যকা থেকে উপত্যকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল দুরন্ত বেগে। বুঝলাম, সংঘর্ষ বাঁধবে বড়ো ক'রেই।

২৬ তারিখে দারামূলাতে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটল। এবাব আর-একটি বড়ো কাফেলার ওপর ফেলা হ'লো বোমা! ভাবতেও পারে নি ওরা এমনটা ঘটবে। ছেলে মেয়ে বাচ্চাবুড়োর একটি বিরাট দল উটের ওপর হেলেদুলে চলেছে। সূর্য উঠে গেছে তখন মাঝ-আকাশে, লাল পাথুরে পথে ধুলো উড়ছে। চড়া বোদে মাঝে মাঝে চোখ আসছে কুঁচকে। নিশ্চিন্ত মনে চলেছে তারা। মেয়েবা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব আর হাসিঠাট্টায় মশগুল। হঠাৎ একঝাঁক বিমান কোত্থেকে সাঁই সাঁই ক'বে উড়ে এলো তাদের প্রায় মাথাব ওপর। পরক্ষণেই বুম্ বুম্ আওয়াজ!

ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলে মুহূর্তে প্লেনগুলো মিলিয়ে গেল দিগন্ত-রেখায়। উট থেকে মানুষজন ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। উটগুলোও মুখ থুবড়ে পড়েছে এখানে-ওখানে। জিনিসপত্র ছত্রাকার। ধোঁয়া, চীৎকাব, আর্তনাদ, কান্না, আর গোঙানি। সে এক করুণ দৃশ্য! বোমাব ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে গল গল ক'রে। পাশের গ্রাম থেকে ছুটে এলো লোক।

হিসেব ক'রে দেখা গেল, ২৭ জন পুরুষ, ১৯ জন স্ত্রীলোক এবং ১৩ জন শিশু মারা গেছে। বোমাব আঘাতে একসঙ্গে এর আগে এত লোক আর কখনো মারা যায় নি। কানরান্চ-এ বোমার ঘায়ে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৬; এবারে ৫৯।

আর সহ্য করা চলে না। অত্যাচার বেড়েই চলেছে, শত্রুবিমান ঘায়েল ক'রবার জন্য পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে সেচ্ছা-যোদ্ধাদের

মোতায়েন করা হ'লো। বন্দুক হাতে আকাশের দিকে চেয়ে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রছি শত্রুবিমানের।

আরহালজিতে বোমা ফেলতে এসেছিল দুটো সেবার জেট। নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছিল সে দুটো। সানঝেরখেল পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি ক'রল। একটি গুলিবিদ্ধ হ'লো। আগুন ধরে গেল প্লেনটিতে। দাউ দাউ আগুন গায়ে নিয়ে কানরানচ গাঁয়ে গিয়ে পডল সেটা। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে গাঁয়ের লোক গিয়ে দেখল, টুকবো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছে প্লেনেব নানান অংশ। আগুন জ্বলছে তখনো। ২০ লক্ষ ডলারের মহার্ঘ বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা সেবার জেটটির আব কোনো পরিচয়ই বইল ন।

সানঝেবখেলেব বোধ হয মনে মনে একটু গবই হ'লো। এতদিনে একটি মনের মতো কাজ ক'রতে পেবেছে। পবীবাস্থব অভিলাষ পূর্ণ ক'রেছে আজ সে। বড়ো তৃপ্তি! শত্রুর বিমান ঘায়েল ক'রেছে। পরদিন ওয়াদের লোকেবা গুলিবিদ্ধ ক'রে নামাল আর-একটি সেবার জেট, একটি হেলিকপ্টার।

দু'দিনের মধ্যে দু'-দুটো সেবাব জেট আর একটা হেলিকপ্টাব পড়তে আয়ুব-সবকাব ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। সোজা কথা? এক-একটা সেবারের দাম ২০ লক্ষ ডলার! আর সাধারণ দিশি বন্দুকে যে সেবারজেট ঘায়েল হ'তে পারে সেও অবিশ্বাস্য। নিশ্চয় তারা শত্রুদেশ থেকে অস্ত্রসম্ভার পেয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শত্রুদেশের চর আর সামরিক পরামর্শদাতা। নির্মূল ক'রতে হবে পনের লক্ষ বালুচকে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অষ্টম ডিভিসনের দুই ব্রিগেড সৈন্য পাঠানো হ'লো আমাদের নির্মূল ক'রতে। তাদের হাতে আমেরিকা থেকে পাওয়া স্টেনগান, রাইফেল প্রভৃতি আধুনিক সমরাস্ত্র। সঙ্গে আছে সর্বাধুনিক মার্কিন আরমারড্-কার। নাম 'স্কাউট কার'।

এই গাড়িতে পাহাড়ি পথে চলতে বড়ো স্থবিধে। প্রতিটা গাড়িতে রয়েছে ৩৭ এম. এম. গান এবং একটি ক'রে লাইট মেসিনগান। নিরীহ বালুচদের ওপর সশস্ত্র সৈন্য পরিচালনার ভার নিলেন মেজর জেনারেল টিকা খান। বালুচদের নিধনের এতো আয়োজন ক'রেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না সরকারি কর্তৃপক্ষ। আমাদের আহারও কেড়ে নেওয়া হ'লো। রেশন বন্ধ ক'রে দিল ওরা। না খেতে পেয়ে যদি আমরা নরম হই। নিরস্ত্র এবং ভুখা মানুষদের কব্জা করা যে সহজ।

সতের লক্ষ বালুচকে জব্দ করতে আয়ুব-সরকার যে সমরায়োজন ক'রলেন তা অনেক আরবরাষ্ট্রের সমরশক্তির সমান। আক্রমণ চালালো আকাশপথে, নিচে। সহজেই বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত হ'লো মাটি দিয়ে তৈরী ইটের বাড়িগুলো। গ্রামের পর গ্রাম মানুষ আশ্রয় নিল খোলা আকাশের নিচে, বা পথের ঢালে। প্রতিক্ষণে মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রছি। কয়েক দিন ধরে ভুখা রয়েছে ছেলে-মেয়ে-বুড়োর দল। কখনো-সখনো জুটছে জোয়ারের রুটি। শিশুদেরও খাওয়া চলেছে আধপেটা।

আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত টিকা খানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে এই অবস্থায় কতক্ষণ আর লড়ব! অগণিত বালুচ যুবক মিলিটারির স্টেনগান আর মেসিনগানের গুলিতে প্রাণ দিল। শহীদের রক্তে পবিত্র হ'লো বালুচভূমি। লাল মাটি আরও লাল হ'লো। দিশি বন্দুক দিয়ে ক'দিনই আর ঝোঝা যায়। দিন-কয়েকের মধ্যেই টিকা খানের সৈন্যরা আমাদের কব্জা ক'রে ফেলল। দলে দলে সৈন্য গ্রামের পর গ্রাম ছেয়ে ফেলল। রাইফেলের নল উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনচ ক'রে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সব্বাইকে এনে জড়ো ক'রল এক জায়গায়। মেয়েদের ইজ্জতের কথা ভেবে সৈন্যদের বাধা দিতে গেছে যারা রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে শুইয়ে দিয়েছে তাদের মাটিতে।

ওয়াদ-এ বৃদ্ধ সানাউল্লাহ খান সৈন্যদের বাধা দিতে গিয়েছিল বলে চোখের সামনে তার তের বছরের মেয়ে গুলনারের ওপর পাঁচজন সৈন্য একের পর এক পাশবিক অত্যাচার ক'রেছে। একজন দাঁত দিয়ে কেটে দিয়েছে গালের মাংস। নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে বুক। আর বুকে পিঠে বেঅনেট ধরে বৃদ্ধ সানাউল্লাহ খান মোঙ্গলকে তাই দেখতে বাধ্য ক'রেছে তারা। বাপ হ'য়ে মেয়ের ওপর সেই পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য আর সে দেখতে পারে নি। মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেছে। জ্ঞান হ'য়ে দেখেছে তাঁরই পাশে পড়ে আছে তাঁর প্রাণপত্তুলি গুলনারের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণদেহ!

আমাদেরই গ্রামেব মোহাম্মদ খানের নববিবাহিতা তরুণী বধূ সুফিয়া'র ওপর সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলাৎকার ক'রেছে। স্তন থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে হিংস্র কামাবেগে। এতেই বর্বর সৈনিকদের তৃপ্তি হয় নি, যাবার সময় বেঅনেট দিয়ে পৈশাচিক হাসি হাসতে হাসতে নারীদেহের গুহ্যস্থানে খুঁচিয়ে দিয়ে গেছে—পাশবিক উল্লাসে রক্তাক্ত ক'রেছে সেই দেহ। অভাগী মরে বেঁচেছে।

অজ্ঞাতেই আমার মুখ দিয়ে বেরুল, 'হরিব্‌ল্'। উঃ। এ রকম নির্যাতন যে এ-যুগের কোনো একটি স্বাধীনরাষ্ট্রে হ'তে পারে ভাবতেই পারি না।'

দেখলাম, রাগে উত্তেজনায় আহম্মদজাই-এর চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। দৃঢ় আঙুলের চাপে গুঁড়িয়ে ফেলল হাতের সিগারেটটা। বলল, 'এ আর কী হরিব্‌ল্? আরও কতো যে রোমহর্ষক পৈশাচিক নির্যাতন হ'য়েছে!' বলে চুপ ক'রল। তাকালো বাইরে।

মাথার ওপর ট্রাইডেন্ট-১ ই ঘুরপাক খাচ্ছে ল্যানডিং-এর জন্য। বোধহয় কনট্রোল টাওয়ারের অনুমতি পেয়ে গেছে। নামবে এক্ষুনি। আহম্মদজাই সম্ভবত কিছু বলতে চেষ্টা ক'রল। ট্রাইডেন্টের প্রচণ্ড গর্জনে ভালো শুনতে পেলাম না।

মুহূর্তে বিমানটি চলে গেল রানওয়ের উত্তরসীমার শেষপ্রান্তে। ক্রমশ নিচু হ'তে হ'তে ল্যানড্ ক'রল সেটি। দ্রুত এগিয়ে আসছে টারমিনাল বিল্ডিং-এর দিকে। নিচে সিঁড়ি নিয়ে তৈরী হ'য়েছে বিমান-ঘাঁটির কর্মীরা। চেকিং-এর পর এটাই আবার করাচি পাড়ি দেবে। এ প্লেনেই আহম্মজাই যাবে।

কী বিস্ময়কর উন্নতি! কতো দ্রুত কনভেয়ার আর ডাকোটার যুগ ছেড়ে পাকিস্তান ট্রাইডেন্ট আর বোয়িং-এর যুগে পৌঁছে গেছে। অথচ পাখতুন, বেলুচ, বাংলার অবস্থায় কোনো উন্নতিই হয় নি। বরং স্বাধীনতালাভের পূর্বের অবস্থা থেকে আরও খারাপ হয়েছে, হচ্ছে। দিন দিন কোটি কোটি দেশবাসীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হ'চ্ছে।

আহম্মদজাই আবার সুরু ক'রল, 'গ্রাম ছেঁকে সব যুবকদের এনে হাজির ক'রল। ছেলে বুড়ো মেয়েদের ভিড় থেকে গায়ে-গতরে বাড়ন্ত দেখে কয়েকজন কিশোরকেও রাইফেলের কুঁদোর ঘা মেরে আমাদের সঙ্গে এনে দাঁড় করালো। বুড়োদেরও অধিকাংশ বাদ গেল না। ভেড়ার পালের মতো গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি খোলা প্রান্তরে। মাথার ওপর সূর্যটা আগুন ছড়াচ্ছে। আমাদের একজন পানি চাইতে পেল রাইফেলের কুঁদোর ঘা।

সানঝেরখেলকে যখন নিয়ে এলো, পরীবানুও উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসছিল পিছু পিছু। একজন মিলিটারি অফিসার তার চুলের গোছা মুঠিতে ধরে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়ে এলো বাড়ির দরজায়। অফিসারটি ফিরে এলে জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে একমুখ থু থু ছিটিয়ে দিল সানঝেরখেল তার গায়ে। পরমুহূর্তে রাইফেলের ঘায়ে মুখ থুবরে পড়ল সে মাটিতে। মিলিটারি অফিসারটি থু থু মুছে বুটসুদ্ধ পা দিয়ে সানঝেরখেলের মাথাটা পিষে দিল ভয়ঙ্কর আক্রোশে। চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সানঝেরখেলকে দাঁড় করালো আমাদের সঙ্গে—ফাইলে।

তারপর নিয়ে চলল 'কুইলি ক্যাম্পে'। দীর্ঘ ফাইল। হেঁটে চলেছি উত্তপ্ত পাহাড়ি পথে। সূর্যের প্রচণ্ডতাপে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ঝলসে গেছে। পানি পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই বলার উপায় নেই।

'কুইলি'-তে হাজার হাজার ছেলে বুড়ো যুবককে গোরু-বাছুরের মতো গাদাগাদি ক'রে অভুক্ত রেখে দিল। বেছে বেছে শ' শ' যুবককে সেখান থেকে নিয়ে গেল মিলিটারি কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে।

কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য কতগুলো ঘর তৈরী করা হ'য়েছিল। সেই অমানুষিক নির্যাতনের কথা শুনলে তোমরা শিউরে উঠবে, শিউরে উঠবে সারা বিশ্বের মানুষ। সে নৃশংস নির্যাতন আলজেরিয়ার ঘটনাকেও বুঝি হার মানায়।

আহম্মদজাই একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'আমাদের সঙ্গে শত্রুদেশের কারো সঙ্গে যোগসাজসের স্বীকৃতি সরূপ মিথ্যা স্টেটমেন্ট আদায়ের জন্য দিনের পর দিন আমাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে সেখানে। হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় চীৎকারটুকু পর্যন্ত করবার উপায় নেই। মুখে কাপড় ঠাসা।

একদিন একজন মিলিটারি অফিসার এসে আমার সামনেই সানঝেরখেলের গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, 'বল্, তোরা কোথা থেকে অস্ত্র পেয়েছিস?'

সানঝেরখেলের জবাব, 'কোনোখান্ থেকে অস্ত্র পাই নি। নিরস্ত্র বলেই তোমরা আমাদের কাবু ক'রতে পেরেছ। কতো আর অত্যাচার ক'রবে আমাদের ওপর। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না।'

সানঝেরখেলের হাত-পা বাঁধা ছিল, বসে ছিল সে। একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে অফিসারটি বুটের লাথিতে তাকে শুইয়ে

দিল মাটিতে। তারপর বলল, 'দেখি সায়েস্তা হ'স কি না!' একজন সৈনিককে ডেকে নির্দেশ দিল, 'একে হট ওয়াটারে চাপাও।'

আমার সামনে দিয়ে হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে অদূরের 'টর্চার রুম'-এর দিকে নিয়ে গেল তাকে। আমাকে যেখানে রাখা হ'য়েছিল সেখান থেকে সানঝেরখেলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সানঝেরখেলকে পা ওপরে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলানো হ'লো। একটু বাদেই একটা বড়ো বালতি ক'রে গরমজল নিয়ে এলো দু'জন সৈনিক। বালতির ভিতর লাঠি ঢুকিয়ে দু'জনে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসেছে বালতিটা। ধোঁয়া উঠছে বালতি থেকে। সানঝেরখেলের মাথার ঠিক নিচেই বালতিটা রাখল। ইঞ্চি চার-পাঁচ নিচেই রয়েছে বালতিটা। সেই অফিসারটি ক্রূরস্বরে আবারও বলল, 'এখনো বল্, তোরা কোন্ দেশ থেকে অস্ত্র পেয়েছিস্—আফগানিস্তান? ভারত?'

সানঝেরখেল চুপ ক'রে রইল। অফিসারটি ক্ষিপ্ত হ'য়ে এক মগ গরম জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল তার মুখে। একটা বিকট আর্ত চীৎকার দিয়ে উঠল সানঝেরখেল অসহ্য যন্ত্রণায়। সারা মুখ তার ঝলসে গেছে।

'এখনো বলবি না!' অফিসারটির দাঁতে দাঁত-চাপা ক্রুদ্ধস্বর শোনা গেল।

উত্তরে সানঝেরখেলের মুখ থেকে কোনো মতে বেরুল 'কোথাও থেকে নয়।'

'তবে রে। মজা দেখাচ্ছি, ছাখ।' বলে অফিসারটি একটি সৈন্যকে কী নির্দেশ দিল। সৈন্যটি ওপরে উঠে পায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ছেড়ে দিল অনেকখানি। প্রচণ্ড তপ্ত জলে সানঝেরখেলের মাথা ডুবে গেল। একটা বিকট আর্তচীৎকার শুধু কানে এলো। উঃ, কী বীভৎস দৃশ্য! মুখটা দগদগে ঘায়ের মতো ঝলসে গেল। চোখের মণি দুটো গলে বেরিয়ে এসেছে। জ্ঞান হারালাম আমি।

পরদিন আর সানঝেরখেলকে দেখতে পেলাম না। দেখতে পাব না জানি। তার মৃতদেহটা কোথাও টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছে

হয়তো। সানঝেরখেলের মতো কতো দেশপ্রেমিক যুবক যে এমনি প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কতো সুফিয়া, গুলনার যে ইজ্জত হারিয়েছে তারও সংখ্যা-পরিসংখ্যা নেই। সানঝেরখেলের জায়গাটা আজ ফাঁকা। কালও ছিল সে। আজ নেই। পরীবানু কি জানে সে-কথা! ওদের বিয়ে আর হ'লো না। এ জীবনে ওরা আর ঘর বাঁধতে পারল না। এমনি কত পরীবানুর ঘরবাঁধার স্বপ্ন যে ভেঙেছে জালিম আয়ুব তোমরা তার কতোটুকুই-বা জানো!'

একি অতীতকালের কোনো বর্বরদের কথা শুনছি। বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্রে এরকম ঘটনাও ঘটতে পারে!

'রোজ রোজ যে নির্যাতনের আরো কত নৃশংস উপায় বের ক'রত! বেয়নেট দিয়ে উপরে নিয়েছে কারু চোখ, খুবলে নিয়েছে কারু শরীরের মাংস। দিনের পর দিন সেই সব হতভাগাদের আর্ত চীৎকারে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পটা থর থরিয়ে কেঁপে উঠত। রাতের নৈঃশব্দ সেই চীৎকারে খান্ খান হ'য়ে যেত। সানউল্লাহ খান মোঙ্গল নামে একজন যুবকের অণ্ডকোষ দুই রাইফেলের মাঝে চেপে পিষে দিল একদিন। পরে শুনেছি, গাঁয়ে ফিরে সে বেচারি আত্মহত্যা ক'রেছে। এ ছাড়া তার যে আর কোনো উপায়ই ছিল না। সানঝেরখেল-পরীবানুর মতো ওরও বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছিল। ভাবী পত্নী রওশনের কাছে সে কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে। কী বলবে তাঁকে? তাই আত্মহত্যা ক'রে সেই দুঃসহ লজ্জা আর গ্লানির হাত থেকে মুক্তি নিয়েছে সে। নির্যাতন আমার ওপরেও হ'য়েছে। তবে সেই সব হতভাগ্যদের তুলনায় তা কিছুই না। বিদেশীদের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগে সাতজনের দিয়েছে ফাঁসি, সাতাশজনের দিয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর অগণিত লোককে দিয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী জেল। তাছাড়া বহুলোকের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত ক'রেছে সরকার।

একটা অসহ্য আক্রোশে ফুঁসছে আহম্মদজাই।

এমন সময় মাইকের ঘোষণা শোনা গেল : এ্যাটেনশন প্লিজ। প্যাসেনজারস বাউণ্ড ফর করাচি আর রিকোয়েসটেড টু বোর্ড অন।

আহম্মদজাই ধীরে ধীরে উঠল। 'চলি বন্ধু, তোমার কথা, কায়সার সাহেবের কথা, তোমাদের বাংলাদেশের কথা', একটু ম্লান হেসে আবার বলল 'তোমাদের ইলিশমাছের কথাও ভুলব না। রিয়্যালি এ ভেরি টেস্টফুল ফিশ।'

বললাম, 'আহম্মদজাই, তোমাদের ব্যথায় আমরা ব্যথিত। আমাদের সংগ্রাম শুধু পূর্ববাঙলার জন্যে নয়। আমাদের সংগ্রাম সমস্ত শোষক আর কায়েমীশাসকের বিরুদ্ধে। তোমাদের সংগ্রামকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আমাদের একজন তরুণ কবির কয়েকটা লাইন তোমায় শোনাই :

তোমার কণ্ঠে আমি
শোষকের মৃত্যু সনদ
ভিয়েতনাম, এঙ্গোলায়
এডেনে, বেলুচে
পাখতুনে
কিংবা বাংলায়·
কসম
শান্তির
কসম
স্বাধীকার স্বাধীনতা
কসম
সায়ত্বশাসন।

ইংরেজিতে কবিতাটির অনুবাদ ক'রে শোনালাম সঙ্গে সঙ্গে। শুনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। দু'চোখে তার দীপ্তি। বলল, 'তোমাদের কাছ থেকে আগামী দিনের সংগ্রামের নতুন ক'রে প্রেরণা নিয়ে গেলাম। চলি বন্ধু।'

প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আহম্মদজাই একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর দোতলা থেকে হাত নেড়ে আমিও বিদায় জানালাম।

সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হ'লো। সগর্জনে প্রপেলার ঘুরতে স্থরু ক'বল।

শেষ বিকেলের ম্লান লালচে আলো এসে পড়েছে রানওয়েতে। পূর্ববাঙলার শুভেচ্ছা নিয়ে এক বালুচ ভাই উড়ে চলল আঠারশ মাইল দূরে। বেলুচ আর বাংলা—কতো দূরে দুই দেশ, তবু দু'জনের কতো মিল। আমরা স্বাধিকার চাই। স্বাধিকার চাই ভাষার, স্বাধিকাব চাই সংস্কৃতির।

অফিস ডিউটি পড়েছে। দশটা বেজে গেছে। শীতকালে দশটাই অনেক রাত বলে মনে হয়। দশটার মধ্যেই রাস্তাঘাট নীরব হ'য়ে পড়ে। রিপোর্টাররা সকলেই চলে গেছে। কেবল আতাউস সামাদ একমনে একটা জরুরি রিপোর্ট টাইপ ক'রে চলেছে। আমিও এবার উঠব। যাবার আগে একবার মেডিকেল কলেজ আর মিটফোর্ড হাসপাতালে ফোন করলাম। মিটফোর্ড-এ এই মাত্র একটা এ্যাকসিডেন্ট কেস এসেছে। রাস্তার ধারে গাছের গায় একটা ট্যাক্সি জোরে এসে ধাক্কা মেরেছে। ড্রাইভারের পেটে স্টীয়ারিং ঢুকে গেছে অনেকটা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হ'য়েছে। সুতরাপুর থানা থেকে নিউজটা কনফারম্ ক'রে এবং বিস্তারিত জেনে নিয়ে টাইপরাইটার নিয়ে বসলাম।

টেলিপ্রিণ্টারগুলো নীরব। দূর থেকে ভেসে আসছে লাইনো মেসিনে কম্পোজ করার শব্দ। সেই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আমার টাইপরাইটারের আওয়াজ। সামাদের রিপোর্ট টাইপ করা হ'য়ে গেছে। টাইপড্ সীটগুলো গুছিয়ে নিউজ ডেস্কে ওয়াহেদুল হক সাহেবকে দিল। ওয়াহেদুল হক সাহেবের পরনে বরাবরের মতোই পাজামা-পাঞ্জাবি। গায়ে শাল। ওয়াহেদুল হক সাহেব শুধু দক্ষ সাংবাদিকই নন, সংগীতেও তাঁর অগাধ জ্ঞান। ঢাকার বিখ্যাত সংগীতসংস্থা 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি।

নিউজ এডিটর মুসাভাই নিউজ ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আজকের তোলা ফটোগ্রাফগুলো দেখছেন। কালোভাই মানে, মোজাম্মেল-সাহেব রেখে গেছেন। মুসাভাইয়ের পরনে নেভাল ব্লু স্যুট। বলিষ্ঠ চেহারা। বড়ো এবং বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ। মুসাভাইয়ের মতো অতো ভালো লে-আউট সেন্স ঢাকায় আর কারু নেই। কালোভাই একদিন বলছিলেন, 'ফটোগ্রাফীতে এই যে আমার এতো

নাম এ মুসাভাইয়ের জন্যই। মুসাভাই যদি আমার ভালো কাজের কদর না ক'রত, এ্যাপ্রুভ না ক'রত, ভালো ভালো আইডিয়া না দিত, তাহ'লে আমাকে কেউ চিনত না।'

আমার রিপোর্টটা সবে শেষ ক'রে এনেছি। এমন সময় এ পি পি-এর টেলিপ্রিন্টারটা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ শব্দ তুলে খবর পাঠাতে লাগল। মুসাভাই চোখ কুঁচকে একবার ওদিকে তাকালেন। টেলিপ্রিন্টারটা একটু থামতেই পিয়ন গিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে এলো রিপোর্টটা। মুসাভাই হাতে নিয়েই চমকে উঠলেন। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো গুরুতর খবর। কারণ খবর পড়ে পড়ে সাংবাদিকরা ধাতস্থ। মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ খবরেও তাঁরা চমকান না। দ্রুত প'ড়ে ফেললেন তিনি সিটটা, তারপর ওয়াহেদুল হক সাহেবকে দিয়ে বললেন, ফার্স্ট ব্যানারে দিন। চার কলাম।' তারপর সামাদকে বললেন, 'মুজিব সাহেবের একটা লাইফ স্কেচ ক'রে দাও। ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারের বাড়িতে বা ওদের প্রেস এ্যাটাচিকে ফোন কর, যদি আরো কিছু জানতে পারো।' তারপর প্রেস ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'মুজিব সাহেবের ফটো যাবে। রিসেন্ট ফটোগ্রাফ। এরপর চেয়ার টেনে নিয়ে প্রথম পাতার লে-আউট প্লেন করতে বসলেন। সামনে লে-আউট সীট।

নিউজ ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে নিউজটা দেখলাম। ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেকরেটারি পরেশনাথ ওঝাকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। মিস্টার ওঝার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে কিছু পাকিস্তানীর সঙ্গে লিপ্ত রয়েছেন।

পাকিস্তান থেকে ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীদের বিতাড়ন, ভারত থেকে পাকিস্তানী হাইকমিশনের কর্মচারিদের নানা অভি-যোগে বিতাড়নের ঘটনা কোনো নতুন খবর নয়। কিন্তু আজকের খবরটির গুরুত্ব অন্য কারণে। ওঝার যোগসাজস নাকি

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান নৌবাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি এবং কয়েকজন সি. এস. পি. অফিসার সঙ্গে। অবশ্য মুজিবর রহমান যে ওই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সেটা সরকারি-ভাবে ঘোষিত হয় ১৮ জানুয়ারি। ওই অভিযোগে এ পর্যন্ত সবসুদ্ধ ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। ওঁদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মাণিক চৌধুরি অস্ত্রশস্ত্র লাভের জন্য সম্প্রতি নাকি আগরতলা গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তিনি আলোচনা ক'রে এসেছেন।

মুজিবর রহমান অনেক দিন থেকেই জেলে আছেন। এবার তার ওপর দেশ-রক্ষা আইন আরোপ করা হ'লো। '৬৭-এর ৯ ডিসেম্বর থেকে একে একে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সুরু হয়। দেশরক্ষা আইনে আটক করা হ'চ্ছে বটে, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগটি কী তখনো বোঝা যায় নি। বোঝা গেল আজ। পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্ত্বশাসন বানচাল ক'রবার, পূর্বপাকিস্তানী নেতাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রবার এটা একটা নয়া চাল। মুজিবর রহমান দেশদ্রোহী। আর দেশ-প্রেমিক হ'লেন কিনা গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা এবং আইয়ুব খান। আয়ুব বোধ হয় লাহোর-প্রস্তাব-এর কথা ভুলে গেছেন। সেখানে পূর্ববাঙলার লোক, বালুচ আর পাখতুনদের আশ্বাস দেওয়া হ'য়েছিল যে, পাকিস্তান হবে 'Independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.' বিভিন্নপ্রদেশের লোকেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অবাধ অধিকার থাকবে। থাকবে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা।

দেশ স্বাধীন হ'লো। তরুণদের মনে দেশ গড়ার স্বপ্ন—সোনার দেশ। এখানে থাকবে না অভাব। শিশুরা পাবে শিক্ষার সুযোগ। নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির দৃঢ় বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠবে নতুন যুগের নতুন কালের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাহিত্য।

জিন্নাহ্-লিয়াকতআলীব স্থান তখন সারা দেশের মানুষের মণিকোঠায়। তাঁরা তরুণদের আদর্শ, আগামী দিনের যাত্রাপথের দিশারী।

ঢাকায় জিন্নাহ্ আসছেন বক্তৃতা দিতে। পাকিস্তান হবার পর এই তাঁব প্রথম ঢাকায় আসা। ঢাকায় বড়ো ময়দান বলতে তখন এক বেসকোর্সের ময়দান। সেখানে তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। শুধু ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নয়, পূর্বপাকিস্তানের দূর দূব অঞ্চল থেকে হাজারে হাজাবে মানুষ আসছে কায়েদ-ই-আজমকে দেখতে, তাঁর বক্তৃতা শুনতে। জনসমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে রেসকোর্স ময়দানে। কণ্ঠে ধ্বনি : পাকিস্তান—জিন্দাবাদ, নাবায়ণ তগদ্বির—আল্লা [illegible] আকবব, কায়েদ-ই-আজম—জিন্দাবাদ।

বেসকোর্স ময়দান সেদিন হ'য়ে উঠল জনসমুদ্র। কায়েদ-ই-আজম এসে উঠলেন মঞ্চে। ময়দানের উত্তব প্রান্তের উঁচু জায়গাটায়। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনসমুদ্র। বার বার 'কায়েদ-ই-আজম—জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল সাগরের প্রচণ্ড গর্জনের মতো।

তখন বিকেল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে সবে হেলতে সুরু ক'রেছে। মার্চ মাসের রোদ। ম্লান আলো এসে পড়েছে গায়ে। বসন্তের হাওয়া দিতে সুরু ক'রেছে সবে। দূরে গাছেব পাতাগুলো কাঁপছে থির থির।

অসংখ্য মাইকে মাঠময় ছড়িয়ে পড়ল কায়েদ-ই-আজমের কথা। উর্দুতে বলছেন তিনি। মাঝে মাঝে বলছেন উর্দু আর ইংরেজির মিশেল দিয়ে। হোক উর্দু। যা বুঝতে পারছে তাতেই জনতা করতালিতে করতালিতে বার বার তাদেব নেতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মুহুর্মুহুঃ করতালিতে আকাশটা খান খান হয়ে যাচ্ছিল। পাখিরা ভয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে।

হঠাৎ জনতা স্তব্ধ হ'লো। সাগর-তরঙ্গ স্থির হ'য়ে পড়ল কোন্ জাদু বলে! কী হ'লো! কায়েদ-ই-আজম তো বলেই চলেছেন।

অথচ কোথায় সেই একটু আগের মুহূর্তের উল্লাস-ধ্বনি, কোথায় সেই করতালি, কোথায় সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস। সকলেই যে নীরব, মুখ থম-থমে।

কায়েদ-ই-আজম বলে চলেছেন, 'Urdu and urdu only shall be the state language of Pakistan.' উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। একি কথা! এরকম তো কথা ছিল না। কায়েদ-ই-আজম কি লাহোর লেজুলেসনের কথা ভুলে গেছেন? আমাদের বাপ দাদা যে-ভাষায় কথা বলেছে, আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা আর বলতে পারব না! কেন? কেন? কেন? জনতার মনে তখন প্রশ্নের আলোড়ন চলছে। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হউক আমাদের আপত্তি নেই, সেই সঙ্গে বাংলাও নয় কেন? পাঞ্জাবি, পশ্তু, সিন্ধিই-বা নয় কেন? আর রাষ্ট্রভাষা যদি হ'তেই হয় তবে বাংলার দাবি তো সকলের আগে। সারা পাকিস্তানে হাজারে মাত্র ২৫ জন লোকের মাতৃভাষা উর্দু, সেখানে বাংলা ৪১২ জনের মাতৃভাষা। পশ্তু ৫০ জনের। উর্দুর দাবি তো অনেক পরে। সেখানে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে—কায়েদ-ই-আজম এ কী কথা বলছেন? কোথায় গেল সেই ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি?

বিক্ষুব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে শুনছে তাঁর বক্তৃতা। না কায়েদ-ই-আজম লাহোর রেজুলেসনের কথা ভোলেন নি। সরল ক'রে তিনি ব্যাখ্যা ক'রলেন লাহোর রেজুলেশনের। বললেন, 'পাকিস্তান হবে একটি 'Independent state', 'states' নয়। লাহোর রেজুলেসনের 'states' শব্দের শেষের 's' টি টাইপের ভুল। হ'য়ে গেল সব সমস্যার সমাধান। মাত্র একটি 's' বাদ দেওয়ার ফলে পাকিস্তান হ'য়ে গেল এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি দেশ।

এমন সরল ব্যাখ্যাও সেদিন জনতা মেনে নিতে পারে নি। প্রতিবাদ ক'রে নি বটে, কিন্তু মনে মনে তাদের অগণিত জিজ্ঞাসা

আলোড়ন তুলেছে। কই এতদিন তো একথা শুনি নি। এই ভুলটা কি এতদিনেও নেতাদের চোখে পড়ে নি, পড়ল কি না আজই।

কায়েমীশাসকের নগ্নতার এই পরিচয় পেয়ে জনতা স্তম্ভিত। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে ধুলিসাৎ হ'লো। সভা ভেঙে গেল। ফিরে চলেছে জনতা। কিন্তু আসার সময়কার সেই উল্লাসধ্বনি কই? বিষাদমগ্ন জনতার মিছিল চলেছে দিকে দিকে।

সেইদিন রাত্রেই ছাত্রনেতাদের সভা বসল। শেখ মুজিবর রহমান ও নাইমউদ্দিনের নেতৃত্বে সবে গড়ে উঠেছে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ; শামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে পূর্বপাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ। কায়েদ-ই-আজমের কথা নিয়ে সভায় আলোচনা চলল। মুজিবর রহমান উত্তেজিত সব থেকে বেশি। এ হ'তে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতেই হ'বে। সভায় ঠিক হ'লো, কাল কার্জনহলের সভায় এর প্রতিবাদ জানানো হবে।

ঢাকার সুধী সমাবেশ হ'য়েছে কার্জনহলে। শেরোয়ানি আচকান আর জিন্নাহ্-টুপির ছড়াছড়ি। কায়েদ-ই-আজম এবারে বলছেন ইংরেজিতে। শ্রোতারা নীরবে শুনে যাচ্ছে জিন্নাহ্‌র বক্তৃতা। বেসকোর্স ময়দানের কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রলেন জিন্নাহ্, 'Urdu and urdu only shall be the state language of Pakistan' তখুনি শ্রোতাদের মাঝখান থেকে গম্ভীর এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কে বলে উঠল, 'না।' কায়েদ-ই-আজম স্তম্ভিত হ'য়ে বক্তৃতা থামিয়ে খুঁজছেন, কে এই দুঃসাহসী? সারা হ'ল থম্ থম্ ক'রছে। কার্জনহলের দেওয়ালে দেওয়ালে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি চলল, না—না—না। গভর্নর জেনারেলের মুখের ওপর এমন কথা বলার সাহস কা'র? লৌহমানব বলে যাঁর খ্যাতি, যাঁর ব্যক্তিত্ব শিক্ষিত-সমাজের আলোচনার বিষয়, যাঁর অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে পর্যন্ত নত হ'তে হ'য়েছে, সেই জিন্নাহ্‌র মুখের উপর কথা বলার এই দুঃসাহস

কা'র ? জিন্নাহ্‌কে দিগুণ চমকিত ক'রে এবার অনেক কণ্ঠের আওয়াজ উঠল : না—না—না। এই আওয়াজ সেদিনকার কয়েকটি যুবকের নয়। এই আওয়াজ সারা বাংলার যুবসমাজের। এই আওয়াজ অন্যায়ের প্রতিবাদ। ক্রুদ্ধ কায়েদ-ই-আজম সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯৫২ সালের একুশে ফেবরুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের সূচনা হ'লো সেদিন—সেই ১১ মার্চ।

কার্জনহলের 'না' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা পূর্ববাঙলার গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো ছাত্ররা রাস্তায়। পুলিশের মুখোমুখি।

সেই দুর্ধর্ষ যুবশক্তিকে রোধ ক'রে কা'র সাধ্য ? তাদের মনে তখন অপমানের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ।

'ওরা আমার মুখের কথা
কাইরা নিতে চায়।
তারা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়॥

কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়॥

সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান।'

এই জীবন-পণ প্রতিজ্ঞার কাছে লাঠি, বন্দুক, টিয়ারগ্যাস তো তুচ্ছ। সাধের জান দেওয়ার জন্য হাজার হাজার ছেলে

বেরিয়ে এলো রাস্তায়, সরব মিছিলে। স্লোগানে স্লোগনে সচকিত হ'লো জনতা।

আবার স্লোগান। ব্রিটিশকে তাড়াতে কতো স্লোগান দিয়েছি। ভেবে ছিলাম, আর স্লোগানের দরকার হবে না। দরকার হবে না বিক্ষোভ-মিছিলের। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার এক বছর যেতে-না-যেতেই আবার স্লোগান। জনতা দেখল, ছাত্রদের প্ল্যাকার্ডে লেখা—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুখে সেই একই আওয়াজ।

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল ঢাকা শহর। একনাগাড়ে চার দিন ধরে চলল বিক্ষোভ মিছিল। দাবি ওই একটি—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন পরিষদ-সদস্য খয়রাত হোসেন এবং ঢাকার মিসেস আনোয়ারা খাতুন। হ্যাঁ, বগুড়ার মোহাম্মদআলী, কুমিল্লার তফাজ্জল আলী, কুষ্টিয়ার ডাক্তার আবদুল মোত্তালিব মালিকও সেই সময় ছাত্রদের হ'য়ে কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা যে তাঁদের গদি আদায়ের একটা চাল মাত্র বোঝা গেল ক'দিন বাদেই। তফাজ্জল আলী আর আবদুল মোত্তালিব হ'লেন মন্ত্রী আর মোহম্মদ আলী চলে গেলেন বার্মায় সেখানকার রাষ্ট্র-দূতের পদটি হাতিয়ে। ছাত্রদের দাবি সেদিন মেনে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল সরকার। সামান্য বন্দুক আর টিয়ার-গ্যাসে যে তাদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না বুঝতে পেরেছিল লীগ-সরকার। ১৫ মার্চ নাজিমউদ্দিন নিজে উদ্যোগী হ'য়ে ছাত্র-প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হ'লেন। নাজিমউদ্দিন-সরকার অঙ্গীকার ক'রল : বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা করা হবে এবং তা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তার সবকার কেন্দ্রের নিকট সুপারিশ ক'রবেন।

ছাত্ররা সেদিন আশ্বস্ত হ'য়েছিল। তাদের প্রথম জয়ে উল্লসিতও হ'য়েছিল। যাক্, অল্পতেই দাবি আদায় হ'য়েছে। কিন্তু নাজিমউদ্দীন এবং কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ কর্তারা বোধ হয় মনে মনে

-হেসেছিলেন সে-সময়। এখন তো শান্ত হও বাপধনরা। পরে দেখা যাবে। বলে কি না বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে হবে। হুঁ:! মাঠে ঘাটের ভাষাকে কি আর রাষ্ট্রভাষা করা চলে। রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু—বাদশাদের ভাষা। রাষ্ট্রভাষা হবে নবাববাড়ির ভাষা। বাংলা? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা....

মুসলিম লীগ নেতাদের নির্লজ্জরূপটি প্রকাশ পেল বছর দুই বাদেই। প্রতিশ্রুতি খেলাপ ক'রলেন তাঁরা। যেমন ক'রে ক'রেছেন লাহোর-প্রস্তাবের খেলাপ। এ যেন মধ্যপ্রাচ্যের নৃপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ-সরকারের চুক্তি। লঙ্ঘন করার জন্যই চুক্তি সম্পাদন।

নবাবজাদা লিয়াকত আলীর মন্ত্রিসভার শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটী সুপারিশ ক'রলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা। কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ নেতারা বললেন, নাজিমউদ্দিনকে ভয় দেখিয়ে ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হ'য়েছিল। ভারতীয় এবং কম্যুনিস্ট এজেন্টদের সঙ্গে যোগসাজসে কিছু লোক নিয়ে যে আন্দোলন করা হ'য়েছে তা কোনো জাতীয় আন্দোলন নয়, তার কোনো মূল্যও নেই। সেই সময় আন্দোলনের তোড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বানচাল হবার উপক্রম হ'য়েছিল, তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেই চুক্তিতে সেদিন সই ক'রেছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। আমরা সেই চুক্তি এখন মেনে নিতে পারি না।

১৯৫০ সালে বেরুল শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নিধারক কমিটীর রিপোর্ট।

বেঈমান! সারা পূর্ববাঙলার ছাত্র-সমাজের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। ১১ মার্চের আন্দোলন বৃথা যায় নি। ছাত্রনেতারা জমায়েত হ'লো ইউনিভারসিটিতে, মধুর ক্যান্টিনে। কর্মসূচী তৈরী হ'লো। চলল আন্দোলন, মিছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে আবার পড়ল পোস্টার, কার্টুন।

এবার আর ছাত্ররা একা নয়, তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন শিক্ষকরাও। দাঁড়ালেন সাংবাদিক আর শিক্ষিত সমাজ। শুধু তাই নয়, নিরক্ষর চাষী-মজুররাও গর্জে উঠল এই অন্যায়ের প্রতিবাদে।

ঢাকা জেলাবোর্ড-হলে ডাকা হ'লো সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলন 'Grand national Convention.' সভায় সভাপতি ছিলেন প্রথমে আতাউর রহমান, পরে কমরুদ্দীন আহমদ। তিল ধারনের স্থান নেই হলে। বাইরেও শ'-শ' প্রতিনিধির চলছে জটলা। সম্মেলনে শেষে বুকভরা জ্বালা নিয়ে ফিরল প্রতিনিধিরা। সে জ্বালা মাতৃভাষার এবং মায়ের অপমানের।

পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হ'লো—উর্দুর পাশে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরুল। ধ্বনি উঠল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুসলিমলীগ সরকার নিপাত যাক্।

ওদিকে কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ নেতাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই সুরু হ'য়ে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মুসলিম-লীগ নেতারা প্রমাদ গুনলেন। লিয়াকত-রিপোর্ট নাকচ হ'লো। কিন্তু এক জিন্নাহ্-লিয়াকত আলী-নাজিমউদ্দীন যায়, আর এক জিন্নাহ্-লিয়াকত আলী-নাজিমউদ্দীন আসে। কায়েমী শাসকেরা যে রক্তবীজের ঝাড়। তাঁদের বিনাশ নেই।

লিয়াকত আলীর পর এলেন ফজলুল রহমান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান। তাঁর মাথা থেকে আর-এক শয়তানি প্যাঁচ বেরুল, বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। এতদিন কেন্দ্রের চেষ্টা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে দেবেন না। কিন্তু এবারে যে গোটা ভাষাটাই সমূলে বিনাশ করার চক্রান্ত। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হ'বে না।

ফজলুল রহমান বোঝালেন, এতে আঞ্চলিক বিরোধ দূর হবে। ভাষা তো ঠিকই থাকছে, শুধু হরফের পরিবর্তন হ'লো। বাংলা হরফ তো হিন্দুদের। ইসলামী হরফ আরবী। আরবী হরফেই আমাদের লেখা উচিত।

ফজলুল রহমানের জলের মতো সোজা যুক্তির তাৎপর্য বুঝতে সেদিন কারুই বাকি রইল না। এ যে মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করা।

আবার চলল আন্দোলন, মিছিল, বিক্ষোভ, স্লোগান।

আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে আন্দোলন তখনও স্তিমিত হয় নি, নাজিমউদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হ'য়েই আবার দৃঢ়স্বরে ঘোষণা ক'রলেন, উর্দু ই হবে পাকিস্তানের এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে ওই কথা বললেন। নাজিমউদ্দীন। আবার স্বমূর্তিতে দেখা দিলেন। দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি।

কিন্তু বাংলার ছাত্রদের নাজিমউদ্দীনের তখনো চিনতে বাকি ছিল। তারা যে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা জানতে বাকি ছিল মুসলিমলীগ নেতাদের।

এতদিন যে আন্দোলন হ'য়েছে তা তো আগ্নেয়গিরির গুম্ গুম্ ধ্বনি। উত্তপ্ত লাভা উদ্‌গীরণ তখনো সুরু হয় নি। বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বার বার সে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে মুসলিমলীগ নেতারা। অসহ্য এই শয়তানি। ছাত্র-সমাজ রোষে ক্ষিপ্ত হ'লো। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'লো আগুনের হল্‌কা।

'বাঘের হাতের মতো সনখ শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের ওপর।'

সুরু হ'লো মহা সংগ্রামের প্রস্তুতি।

২৭ জানুয়ারি ডাকসুর নেতারা জমায়েত হ'লো মধুর ক্যান্টিনে—ঐতিহাসিক মধুর ক্যান্টিনে। পূর্ববাঙলার বহু ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলনের জন্মের নীরব সাক্ষী এই ক্যান্টিন। এখানকার লোহার চেয়ার-টেবিলগুলো বহু শহীদ আর দেশপ্রেমিকের স্পর্শে ধন্য। এই ক্যান্টিনই জন্ম দিয়েছে গাজিউল হক, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহ্‌মদের মতো বাঙলা মায়ের কতো দামাল ছেলে মেয়ের, মা বলতে যাঁদের প্রাণ আনচান ক'রে ওঠে; মায়ের অপমানে যাঁদের রক্তে জাগে সর্বনাশের মাতন; চোখ থেকে বেরুয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কতো পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই ক্যান্টিন। ক্যান্টিনের মালিক মধু সব দলের ছেলেমেয়ের কাছেই 'মধুদা'। ইউনিভারসিটিতে দল ক'রতে গেলে, সভা ক'রতে গেলে খরচ-খরচা কিছু আছেই। গরিবের ছেলে মুজিবর রহমান। কাপের পর কাপ চায়ের জোগান দিয়ে গেছেন তাঁকে মধুদা। মধুদা জানেন তার পয়সা মার যাবে না! দেশের জন্য হাসতে হাসতে যাঁরা প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে তাঁদের বিশ্বাস ক'রবেন না তো ক'রবেন কাকে, ছাত্ররা কোনোদিন তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করে নি। মুজিবর রহমান মন্ত্রী হওয়ার পর গাড়ি নিয়ে একদিন সোজা চলে এসেছেন মধুদার ক্যান্টিনে। কয়েক বছর আগেকার কয়েক শ' টাকা পাওনা ছিল মধুদার মুজিবর রহমানের কাছে। মুজিবর মধুদার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন পাই পয়সা অবধি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরও মধুর ক্যান্টিনে সপ্তাহে অন্ততঃ একবারটি না গেলে অনেকেরই সোয়াস্তি নেই। অনেকদিন বাদে প্রাক্তন ছাত্র কেউ গেলে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানান মধুদা, 'আরে, আতোয়ার সাহেব যে! কেমন আছেন। আসুন, আসুন।' পুরনো নেতা কেউ এলে নতুন ছাত্ররাও সহর্ষে চীৎকার ক'রে ওঠে: আরে, শাহাবুদ্দিনভাই যে! এ-ই চা দে।

সেদিন বায়ান্ন সালের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনেরও জন্ম হ'লো এই ক্যান্টিনে। সভা সুরু হ'লো গাজিউল হকের বক্তৃতা দিয়ে।

বুকভরা জ্বালা নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় গাজিউল হক বলে চলল 'ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নাজিমউদ্দীন কাল বলেছেন, উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বেঈমান! বেঈমানের দল বার বার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, চুক্তি করেছে—বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বার বার সে-চুক্তি ভেঙেছে। আজ ওদের কথার জবাব দেবার সময় এসেছে।

'ওরা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাপ-দাদার মুখের বুলি কেড়ে নিতে চায়। এদেশের মাঝি আর মনের আনন্দে ভাটিয়ালি গান গাইতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মাইকেল-সুকান্ত আমাদের কাছে হয়ে যাবে ইতিহাসের বস্তু, মায়ের কাছে চিঠি লিখব—উর্দু তে ঠিকানা লিখতে হবে। উর্দু না জানার অপরাধে সরকারি চাকরি-বাকরি থেকে বঞ্চিত থাকবে বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েরা। পশ্চিমপাকিস্তান থেকে এসে উর্দু ভাষীরা ছেয়ে ফেলবে বাঙলাদেশ। আমাদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আমাদেরই খবরদারি ক'রবে তারা। সোনার বাংলাকে দেউলে ক'রবে, শুষে নেবে সমস্ত সম্পদ। বাঙালীকে ভিখিরীর জাত বানিয়ে ওরা আমাদের তাদের তাঁবে বানাবে। কেন না ওরা জানে, কায়েমীশাসন বজায় রাখতে হ'লে বাঙালীকে দমন না ক'রলে চলবে না। বাঙলাদেশ কখনো অন্যায় অবিচার সহ্য ক'রে না। তাই বাঙালীকে আগে শায়েস্তা ক'রো। একটা জাতিকে ধ্বংস করার প্রধান উপায় হ'লো তার ভাষা কেড়ে নেওয়া। ভাষা কেড়ে নিয়ে ওরা আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে চায়। বজ্রকণ্ঠে আজ তার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। পূর্ববাঙলার সাড়ে চারকোটি লোক আজ ছাত্রসমাজের দিকে উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে। মায়ের সম্মান রাখতে এগিয়ে আসুক ছাত্রসমাজ। ঝাঁপিয়ে পড়ুক মহাসংগ্রামে। লীগ-সরকার দেখুক, বাংলার ছাত্রজনতা আর সাড়ে

চার কোটি বাঙালীর অমিত শক্তি। আমরা যদি সকলের মিলিত আওয়াজ তুলি—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকার নিপাত যাক—তাহ'লে শুধু সেই প্রচণ্ড গর্জনের তোড়েই লীগ-সরকার ভেসে যাবে।

একদমে এতগুলি কথা বলে গাজিউল এবার একটু থামল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। চুল উস্কুখুস্কু।

উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে অন্যান্যদের চোখগুলোও। এখনই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শয়তানদের ছিন্নভিন্ন ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে। বাইরে আলো প'ড়ে গেছে। শীতের বেলা। কতক্ষণই-বা তার আয়ু।

গাজিউল এবার-গলার স্বর নামিয়ে একই সুরে বলে চলে: আমাদের কর্মসূচী তৈরী ক'রতে হবে। শুধু আমাদের আন্দোলনে হবে না। সকল দলের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে এ আন্দোলন জোরদার হ'য়ে উঠবে না। সব দলের সম্মেলন ডাকা প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম কমিটীকে আবার জাগিয়ে তোলা দরকার। প্রত্যেক হল থেকে, প্রত্যেক কলেজ থেকে প্রতিনিধি নিতে হবে। আমরা ওলি আহাদভাই, তোয়াহাভাই, মাহবুব-ভাই—এঁদের কাছে যাব, বলব সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটী গঠন করার কথা।'

সকলেই গাজিউল হকের কথায় সায় দিল। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো নাজিমউদ্দীনের কথার প্রতিবাদে ৩০ তারিখে স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালন করা হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে জানুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ক'রল। প্রাইমারি স্কুলের কচি কচি শিশুরা পর্যন্ত সেদিন আওয়াজ্ তুলল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়তে হবে। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ধর্মঘট ক'রে ছাত্ররা এসে জমায়েত হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলল। মাথার

ওপরে সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে। স্কুলের কচি কচি ছেলেদের মুখগুলো রোদের তাপে লাল হ'য়ে উঠেছে। মেয়েরাও আজ চুপ ক'রে ঘরে বসে নেই। ওরাও সাড়া দিয়েছে সে-ডাকে। ছেলেদের পাশে পাশে এগিয়ে চলার সঙ্কল্প আজ ওদের মনে। আলুথালু চুল। চোখে মুখে তাদের জ্বলন্ত উনোনের গনগনে আঁচ, শপথের দৃঢ়তা। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে সে আঁচে হাওয়া দিল। সে হাওয়ায় হৃদয়ে তুফান উঠল। এক সর্বনাশা আক্রোশে মহাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক এলো। বাংলার দামাল ছেলেমেয়েদের সে যে কী আগুন ছড়ানো বক্তৃতা! শরীরের রোম শিউরে উঠছে। কানের পর্দায় একের পর এক আঘাত করছে কথার পর কথা: ভাইসব আজ আমাদের শপথ নেবার দিন। আমরা জান দেবো তো মান দেবো না। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই...ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকারকে দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের শক্তি। ওরা জানে না যে আমরা হাসিমুখে রক্ত দিতে পারি। লীগ-সরকারের টিয়ারগ্যাস আর রাইফেলের ক্ষমতা নেই আমাদের আন্দোলন দমিয়ে দেয়...বাংলা হিন্দুর ভাষা নয়, মুসলমানের ভাষা নয়, বাংলা বাঙালীর ভাষা।... নাজিমউদ্দিন-লিয়াকত আলী নিপাত যাক।

কখনো 'শেম্ শেম্' ধ্বনি আবার কখনো সহর্ষ করতালিতে মুখরিত হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ।

একসময় সভা শেষ হ'লো। ছেলে-মেয়েরা হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা নিয়ে থমথমে মুখে ঘরে ফিরল। সর্বনাশা ঝড়ের আশঙ্কায় সেদিন অনেক মায়ের প্রাণ দুলে উঠেছিল।

বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হ'লো। হলে মাছি গলবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। বাইরেও অগণিত শ্রোতা দাঁড়িয়ে। যুবনেতাদের জ্বালাময়ী কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে মাইকে। পথ-চলতি মানুষেরাও কাজকর্ম ভুলে শুনছে সেকথা। কথা তো নয় যেন আগুনের ফুলকি।

একসময় মাইকে ভেসে এলো : 'আমাদের সংগ্রাম ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকারের বিরুদ্ধে। আমাদের দাবী শুধু বাংলাভাষার জন্য নয়। আমাদের দাবি সকল ভাষার জন্য। আমরা চাই বেলুচ, সিন্ধী, উর্দু পাঞ্জাবী, বাংলা—সব ভাষাই সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করুক। একটি জাতির বিকাশের প্রথম সর্ত হ'লো ভাষার স্বাধীনতা। লীগ-নেতারা বলেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা। এতগুলো ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে না। তার জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা আছে উর্দুর।

'ভাইসব, এটা লীগ-সরকারের একটা ওজর মাত্র। রাশিয়ার মতো দেশে যদি ষোলটি ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে, দলিলপত্র এবং সার্কুলার ষোলটি ভাষায় ছাপা হতে পারে সেখানে পাকিস্তানে মাত্র ছয়টি ভাষায় কেন রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারবে না! অতগুলো ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলছে বলে সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এমন কথাও তো শুনি নি। তবে আমাদের দেশেই-বা মাত্র ছয়টি সরকারি ভাষায় কাজ চলতে পারবে না কেন?

'আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তার মানে এই নয় যে, আমরা শুধু উর্দু আর বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাই বাংলার সঙ্গে অন্য ভাষাও সমান মর্যাদা লাভ করুক।'

শ্রোতাদের মুহূর্মুহূ করতালিতে অভিনন্দিত হ'লেন বক্তাবা।

সেই সম্মেলনেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রব্বানী, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম-পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হ'লো। আহ্বায়ক হ'লেন গোলাম মাহবুব। কমিটীতে আবুল হাসেম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহম্মদ, ওলী আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, খালেক নওয়াজ খান, সামসুল হক প্রমুখ নেতাদের নেওয়া হ'লো।

আটচল্লিশ সালের ভাষা-আন্দোলনের প্রধান-নেতা মুজিবর

রহমান তখন জেলে। '৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে তাঁকে জেলে আটকে রেখেছেন লীগ-সরকার। 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছে ছোঁড়াটা। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিশে মিশে গোল্লায় গেছে। একপাল ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রছে।' সেই সঙ্গে, একটু তাচ্ছিল্যের 'হুঁ' ক'রে জেলে পুরেছেন মুজিবর রহমানকে। ভেবেছেন, দেখি, এবার আন্দোলন ক'রে কে? ভুল করেছেন লীগ-সরকার। বাঙলাদেশে হাজার হাজার মজিবুর রহমান র'য়েছেন যাঁরা হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতে পারেন দেশের কাজে। লীগ-সরকার ভুলে গেছেন যে, বাঙলার ছেলেরা সূর্যসেন-ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের উত্তরসূরী। মুজিবর রহমানকে আটক রেখেও তাই আন্দোলন দমানো গেল না। চাপা দেওয়া গেল না অসন্তোষের আগুন।

চার দিনের চেষ্টায় তৈরী হ'লো বিরাট এক সংগ্রামী ছাত্রজনতা।

পরের দিন কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটীর বৈঠক বসল।

সভায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' না 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' —এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল।

আসলে 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটাই স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার ফল। সাধারণের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে জাহির করবার জন্য শাসক-গোষ্ঠী ভাষার বেড়াজাল সৃষ্টি করেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দিয়ে অন্যদের দূরে সরিয়ে রাখেন। নবাবী আমলে বাঙলাদেশের রাজভাষা ছিল ফার্সী। রাজভাষা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যই, সাধারণকে অশিক্ষিত রেখে তাদের ওপর নিজেদের আধিপত্য কায়েমী করে রাখা। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীও তাই চায়। লীগ-শাসনকর্তারা উর্দুভাষী। তারা চায় সামান্য কয়েকজনের ভাষা সাতকোটি জনতার ওপর চাপিয়ে দিতে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার লোকেদের শোষণ ক'রে নিজেদের পেট মোটা করার এবং

শাসন-ক্ষমতা কায়েমী ক'রবার জন্যই মুসলিমলীগ-সরকার এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

একজন বললেন, 'অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু আর বাংলা—এই আমাদের দাবি। আসলে তা নয়। আমরা চাই প্রত্যেক ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করুক। অন্য ভাষার ওপর বাংলা ও উর্দু চাপিয়ে দিলে তাও হবে স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র বিরোধী। অনেকে বলেন, পূর্ববঙ্গে উর্দু এবং পশ্চিমপাকিস্তানে বাংলা আবশ্যিক পাঠ্য করা হউক। এটাও অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি।

'জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সে দাবি তুলি নি, বা তুলব না। কারণ আমাদের সংগ্রাম সে নীতির ওপর ভিত্তিশীল নয়, আমাদে সংগ্রাম চলবে লাহোর-রেজুলেসনের নীতি অনুসারে। আমরা চাই পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার।

আর-একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান এবং বালুচরা যখন নিজেদের ভাষার দাবি তুলছে না তখন আমরা কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাই? ওঁরা দাবি তুললে আমরা সমর্থন জানাবো।'

যুবলীগ নেতা ওলি আহাদ জবাব দিলেন, 'আমাদের নেতৃবৃন্দ যখন ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশও তখন বলেছিল, ওটা জনসাধারণে দাবি নয়। ও তো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দাবি। জনসাধারণ চাইলে আমরা বিষয়টা বিবেচনা করতে পারি। কোনো দেশে কোনো কালে সারা দেশের মানুষ প্রথমেই তাদের দাবি জানাতে ছোটে না। নেতারা জনগণের প্রতিনিধি। নেতাদের দাবিই জনসাধারণেব দাবি। ব্রিটিশদেরও তাই আমরা জবাব দিয়েছিলাম, আমরা সারা দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত ক'রেছি। জনতার কল্যাণের জন্যই পূর্ণস্বাধীনতা প্রয়োজন বলেই আমরা এই দাবি তুলেছি।

'আমাদের উত্তরও হবে তাই। নিপীড়িত সিন্ধী, পাঞ্জাবী,

পাঠান, বালুচ আজও ভাষার ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য দাবি কী, কী তাদের পাওনা তাই জানে না। তাই চুপ করে আছে তারা। শাসকগোষ্ঠী তাদের মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

'ভাষার অধিকার প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার। কাজেই সে দাবি উঠল কি না সে বিবেচনা অবান্তর। ওরা চাইলে আমরা ওদের সমর্থন করব এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা হ'লো। ওদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের কণ্ঠেই ওরা ওদের দাবি শুনে সচেতন হবে। ওদের অন্ধকারে রেখে দেশের যথার্থ উন্নতি কখনোই হ'তে পারে না। তাই আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

'কিন্তু সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশতু, বেলুচির মতো অনগ্রসর ভাষাকে কি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে? এগুলো আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে থাকাই বোধ হয় ভালো।' বললেন জনৈক সদস্য।

ওলি আহাদ তারই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। তার কথা কেড়ে নিয়ে মোহম্মদ তোয়াহা দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার জন্য দায়ী কে? বালুচ পাঠান সিন্ধী এবং পাঞ্জাবীরা, না দেশের সরকার। অতীতে ব্রিটিশ তাদের ভাষা বিকশিত হ'তে দেয়নি আর এখন দিচ্ছে না মুসলিমলীগ-সরকার। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আজও কি লাখ লাখ সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ নিজেদের বাঁচার অধিকার পাবে না! রাষ্ট্রের কাজে যোগ দিতে পারবে না! সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ লোকই কৃষক। তারা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা বোঝে না। তারা না জানে উর্দু, না বাংলা। তাদের ওপর জোর ক'রে বাংলা বা উর্দু চাপিয়ে দিলে ঘোরতর অন্যায় হবে। প্রত্যেক জাতির বিকাশের অপরিহার্য সর্ত হ'লো তার ভাষার স্বাধিকার। ওইসব ভাষা অনগ্রসর

বলেই তাদের ভাষা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে বেশি যাতে লাখ লাখ জনতার সামনে আলোর দুয়ার খুলে যায়। অন্যদের পাশে তারাও দেশের কাজে এগিয়ে আসতে পারে। তাহ'লেই তো উন্নত হবে, শক্তিশালী হবে দেশ। সকল অঞ্চলের শক্তির উপরই যে দেশের শক্তি নির্ভরশীল। তাই আমাদের দাবি হওয়া উচিত, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

নীতিগত ভাবে ওই ধ্বনি তোলারই সিদ্ধান্ত হ'লো। পোস্টার প্ল্যাকার্ডে ওই কথাই লেখা হ'লো। কিন্তু আন্দোলন যখন দুর্বার হ'য়ে উঠল, তখন সকলের অজান্তে কখন যে 'অন্যতম' শব্দটি খসে পড়ল কেউ জানে না। হয়তো স্লোগান দেবার অসুবিধার জন্যেই তা বাদ পড়েছিল। যাক সে কথা। সভায় ঠিক হ'লো, ৪ ফেবরুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকা হবে। শোভাযাত্রা আর সভা-অনুষ্ঠান ক'রে আমাদের দাবি জানাতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ ফেবরুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট পালন ক'রল। 'ভাষার উপর হামলা চলবে না! ফ্যাসিস্ট নাজিম নিপাত যাও। নাজিম চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। সভা শোভাযাত্রায় যোগ দিন। বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ।'—এইসব স্লোগান দিতে দিতে ছাত্ররা দুপুরের গলানো পিচের রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে গেল। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নেমে এসেছে রাস্তায়। পুলিশ সেদিন নীরবে দেখে গেল সব। কিছুই বলল না।

বিকেলে সংগ্রাম-কমিটীর তরফ থেকে জনসভা ডাকা হ'য়েছিল। সভায় মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশেম ও অন্যান্যরা তীব্রভাষায় লীগ-সরকারের নিন্দা ক'রলেন। বাংলাভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো সভায়। ঠিক হ'লো একুশে ফেবরুয়ারি ভাষা-দিবস হিসেবে পালন করা হবে। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রদেশব্যাপী ডাক দেওয়া হবে সর্বাত্মক হরতালের।

ছাত্রসংগ্রাম-পরিষদ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১১ ও ১৩ ফেবরুয়ারি পতাকাদিবস ঘোষণা ক'রল। কৌটো নিয়ে বের হ'লো হাজার হাজার ছেলে মেয়ে। পথেঘাটে ট্রেনে বাসে যাত্রীদের বুকে তারা পড়িয়ে দিল 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-লেখা কাগজের ব্যাজ। জনসাধারণ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিল। ব্যাজ পড়বার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ছাত্রদের কৌটোয় পয়সা ফেলে তারা ধন্য হতে চায়। জানাতে চায়, এ সংগ্রামের পিছনে আছে সাড়ে চার কোটি জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন। মাভৈঃ! এগিয়ে চলো।

চোখে হঠাৎ আলোর ঝাপ্টা খেয়ে সংবিত ফিরে এলো। মোটরের হেডলাইটের আলো। সরে দাঁড়ালাম। ক্যাডিলাকটা মুহূর্তে বাঁক ঘুরে কুয়াসার ভিতর হারিয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে কখন যে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি জানি না। টুয়েন বি সার্কুলার রোড্ ছেড়ে সবে বড়ো রাস্তায় পড়েছি। পিছনে আদমজী কোর্ট। কুয়াসায় আবছায়া দেখাচ্ছে। একটু এগোলেই ডি আই টি বিল্ডিং। তার নিচেটায়ই এখন ঢাকা টেলিভিসন স্টেশন। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শালটা খুলে ভালো ক'রে জড়িয়ে নিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগল শরীরে।

স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে আউটার স্টেডিয়ামের ময়দানের ওপর দিয়ে কোণাকোণি পাড়ি দিলাম। সর্ট কার্ট। জিন্নাহ্ এভিনিউয়ের বড়ো বড়ো দোকানগুলোতে নিওনসন বাতিগুলো জ্বলছে। দোকান-পাট বন্ধ হ'য়ে গেছে। রাস্তাও নির্জন হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে ছুটে চলেছে মোটর; কখনো-বা সওয়ারি নিয়ে কোনো সাইকেল রিক্সা।

কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের নানান ছবি তখন আমার মনের পর্দায় এসে পড়ছে। পড়ছে, সরছে আবার পড়ছে। ভাষা আন্দোলনের নানান ঘটনা ভাবতে ভালো লাগছে। ঘাসের ওপর দিয়ে পথ চলতে চলতে আবার ভাবনার পাথারে ডুব দিলাম। ফিরে গেলাম অতীতে।

আতোয়ার, শাহাবউদ্দীন আর আমি রাতের পর রাত জেগে পোস্টার লিখেছি। পোস্টার লেখায় আতোয়ারের হাত খুব ভালো। ভালো কার্টুনও আঁকতে পারে ও। পোস্টার লিখছি শাহাবউদ্দীনদের কাঠের দোতলার পিছন দিকের বারান্দায়। ওদের বাড়িটা একটা মাঠের ওপর। বাড়ির চারদিকে নানা গাছগাছালি। কেউ এলে আগে থাকতেই দেখা যাবে। 'আই-বি'র লোক সারা শহর ছেয়ে ফেলেছে। শাহাবউদ্দীন বয়ান লিখে লিখে দিচ্ছে। হেরিকেনের টিমটিমে আলোয় তুলির টানে টানে একটার পর একটা পোস্টার লিখে চলেছে আতোয়ার :

-মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা।

একুশে ফেবরুয়ারি পালন করুন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—আওয়াজ তুলুন।

নাজিম-নুরুল চুক্তি রাখ, নইলে সখের গদী ছাড়।

একুশে ফেবরুয়ারির ডাক দিন : সাড়া দিন।

বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ।

সাফু চা নিয়ে এসে ডাক দেয় : ভাইজান চা নাও। শাহাব-উদ্দীনের বোন সাফু। ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। টানা টানা বড়ো বড়ো দুটি চোখ নিয়ে ও-ও আমাদের মাঝে বসে বসে রাত জাগে। পোস্টার পড়ে। চা বানায়। ওর দুচোখে যেন কীসের দীপ্তি ঝরে পড়ে।

শেষ রাত্রে সাইকেলে চড়ে আঠার বালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। নিঃশব্দে দেওয়ালের পর দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে ভোর-ভোর ঘরে ফিরে ঘুম দিই।

এতদিন ভাষা-আন্দোলনের বড়ো সহায় ছিল পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা। ১৩ ফেবরুয়ারি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ ক'রে দিল লীগ-সরকার। সরকার সম্পাদক আবদুস সালাম সাহেবকে

গ্রেপ্তার ক'রলেন। অবজারভার বন্ধ হওয়াতে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গণ-আন্দোলনের খবরা-খবর পৌছানোর বেশ অসুবিধা হ'লো। তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র রইল সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। কিন্তু একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আর কতো ক'রবে? তবে সুবিধে ছিল এই যে, তার আগেই সারা দেশের লোকের কাছে একুশে ফেবরুয়ারির ডাক পৌছে গেছে। শহরে, বন্দরে, গ্রামে, একুশের প্রস্তুতি চলছে। সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে সবাই। ছাত্রদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে' চাষী, মজদুর আর সাধারণ মানুষ। আওয়াজ তুলছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে। মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না—চলবে না।

দেখতে দেখতে একুশে ফেবরুয়ারি এগিয়ে এলো। সারা শহর পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাব। দেওয়ালে দেওয়ালে নাজিম-লিয়াকতের কার্টুন। ছেলেরা তাড়া ক'রছে নাজিমউদ্দীন উর্ধশ্বাসে ছুটছে, টুপি খসে পড়েছে মাথা থেকে। আবার এক জায়গায় দেখলাম বলদের ছবি। মাথাটা নাজিমউদ্দীনের। এমনি কতো সব কার্টুন।

২১ ফেবরুয়ারি আবার প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট অধিবেশন। শহর, গ্রাম, গঞ্জ থেকে 'আই-বি অফিস' খবর যা পাঠাল তাতে মুসলিমলীগ নেতাদের আহার নিদ্রা ঘুচে গেলো। লিয়াকত আলী ঘন ঘন ফোন করেন স্বরাষ্ট্র সেকরেটারি আর চীফ সেকরেটারিকে। খবর নেন শহরের।

২০ ফেবরুয়ারি।

অস্থিরভাবে নিজের ঘরে কার্পেটের ওপর উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি ক'রছেন লিয়াকত আলী। একটু আগে নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে কথা হয়েছে ট্রাঙ্ককলে। যে ক'রেই হোক কালকের হরতাল পণ্ড ক'রতেই হবে। কিছুতেই আন্দোলন ক'রতে দেওয়া হবে না। মনস্থির ক'রে ফেললেন। ফোন তুলে ইংরেজিতে চীফ সেকরেটারিকে বললেন,

১৪৪ ধারা জারি করুন। আর্মি তৈরী থাকতে বলুন। পুলিশী শক্তি জোরদার করুন।

চীফ সেক্রেটারি দু'মুহূর্ত কী ভাবলেন। তারপর ঢাকার জেলা-মেজিস্ট্রেটকে ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দিলেন। দ্রুত একটার পর একটা ফোন ক'রে চললেন তিনি। ডাকলেন পুলিশ কমিশনারকে। ক্লোজ ডোর মীটিং-এ বসলেন সরকারি প্রশাসন-বিভাগের চাঁইরা।

পুলিশের গাড়ি ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। মাইকে ঘোষণা ক'রছে: এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ঢাকার শহর এবং শহরতলি অঞ্চলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বলে আজ হইতে একমাসের জন্য একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হইল। জনসাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে, এই আদেশ বলে চার জনের বেশি একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঢাকা বেতার থেকেও একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারির কথা ঘোষণা করা হ'লো।

ঘোষণা শুনে সারা শহরটা থম্ থমে হ'য়ে উঠল। রিকসাওলা থেকে দোকানদার পর্যন্ত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দ্রুত ঘরে ফিরে চলল।

দোকান-পাট সকাল সকাল বন্ধ হ'য়ে গেল। আটটার মধ্যে ঢাকা শহরে গভীর নীরবতা নেমে এলো।

ফোনে যোগাযোগ ক'রে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সর্বদলীয় সংগ্রাম-কমিটীর সভা বসল। এ অবস্থায় কী করা উচিত? কর্তব্য নির্ধারণ নিয়ে সদস্যের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দিল। রাজনৈতিক দলের নেতারা জানালেন, এ অবস্থায় আমাদের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়। চুয়াল্লিশধারা ভঙ্গ ক'রতে গেলে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লীগ-সরকার সেই অজুহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচন বন্ধ ক'রে দিতে পারেন।

নির্বাচন বন্ধ হবার ভয়ে ভাষা-আন্দোলন স্থগিত থাকবে! সাড়ে চার কোটি মানুষের প্রাণের দাবি থেকে গদির মোহ বড়ো

হ'লো। অবাক হ'লেন ওলি আহাদ। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়ে ছিলেন তুনিয়ার সকলে মৌলানা ভাসানী বা ওলি আহাদ নন যে গদির মোহ থাকবে না। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যখন বিপুল ভোটে জয়ী হ'লো ফজলুল হক হ'লেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রধান। মন্ত্রিসভা গঠনের সময় শ'খানেক পরিষদ-সদস্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন-রাত হক্ সাহেবের কাছে হাঁটাহাঁটি সুরু ক'রে দিলেন। হক সাহেব এতে খুব অসন্তুষ্ট হ'লেন। এরা কি দেশের কাজ ক'রতে এসেছে না মন্ত্রীত্বলাভই একমাত্র মোক্ষ? কিন্তু শীগ্‌গীরই হক সাহেব এমন লোকেরও সাক্ষাৎ পেলেন যিনি তাঁকে মন্ত্রী না করার জন্য হক সাহেবের কাছে ধর্না দিলেন।

হক সাহেব ঠিক ক'রেছিলেন ওলি আহাদকে মন্ত্রিসভায় নেবেন। খবর পেয়েই ওলি আহাদ ছুটে এলেন। বললেন, 'আমি কি অপরাধ ক'রেছি হুজুর যে সাধারণ মানুষকে সেবা করা থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রতে চলেছেন, দয়া করে আমাকে মন্ত্রী ক'রবেন না। আমাকে জনসাধারণের কাছ থেকে নির্বাসিত ক'রবেন না।' আনন্দে হক সাহেবের চোখ তুটি জলে ভরে উঠল। বললেন, 'ওলি আহাদের মতো ছেলেও তাহ'লে এ-দেশে আছে যারা মন্ত্রীত্ব দিতে চাইলেও নিতে চায় না! আমি যেন নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি।'

সেই ওলি আহাদ কী ক'রে মেনে নেবে ওই যুক্তি? তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'নির্বাচন পণ্ড এবং সাধারণ একশ' চুয়াল্লিশ ধারার ভয়েই যদি আমরা আমাদের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ি তা'হলে কোনোদিনই আমাদের দাবি আদায় হবে না। লীগ-সরকারের বেঅনেট আর টিয়ারগ্যাসকে ভয় ক'রলে আন্দোলনে নামা বৃথা। আমরা তো আগেই জানি লীগ-সরকার আমাদের ওপর সব রকম দমন নীতিই চালাবে। বিনা সংঘর্ষে আমাদের দাবি তারা মেনে নেবে যদি কেউ মনে ক'রে থাকি তা'হলে মূর্খের স্বর্গে বাস ক'রছি।

'১৪৪ ধারা কাল অমান্য ক'রতেই হবে। তা অমান্য না করার অর্থ হবে, সরকারি দমন-নীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা এবং জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।'

এমন সময় সলিমুল্লাহ হলে মীটিং সেরে এসে দু'জন ছাত্র-প্রতিনিধি জানাল, তারা কাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি দমন-নীতির কাছে কিছুতেই তারা মাথা নোয়াবে না।

কিন্তু সর্বদলীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা অমান্য না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো এবং আরও বলা হ'লো এই সিদ্ধান্ত অমান্য ক'রে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রলে এই কর্মপরিষদ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে ধরে নেওয়া হবে।

ওদিকে ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। গভীর রাত পর্যন্ত হলগুলোতে আলোচনার পর আলোচনা চলল। রক্ত দেওয়ার জন্য ছাত্ররা উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। কখন ভোর হয়। কখন একুশে ফেবরুয়ারির সূর্য ওঠে সেই প্রতীক্ষা ক'রছে তারা।

এখনও ভালো ক'রে ফর্সা হয় নি। আতোয়ার এসে ডেকে তুলল। চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিভিন্ন স্কুল কলেজের নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিলাম: ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হবে।

আজকের সূর্যটাকে বড়ো নতুন লাগছে। এমন দিন বুঝি হয় না। কুয়াসার পাতলা আবরণ ভেদ করে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে কালো পিচের রাস্তায়। ফুলার রোড ধরে এগিয়ে ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ পেরিয়ে মেডিকেল কলেজ ছেড়ে সোজা ঢুকলাম ইউনিভার্সিটিতে। মধুর ক্যান্টিনে ঢুকে মাখন-টোস্ট আর চা দিয়ে 'নাস্তা' সারলাম। ছাত্রনেতাদের অনেকেই তখন এসে গেছে। ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের জি. এস-এর সঙ্গে অনুচ্চস্বরে তন্ময় হ'য়ে আলাপ ক'রছে গাজিউল

হক। মুখ থম্ থম্ ক'রছে। আতোয়ার এক সময় উঠে গিয়ে গাজিউলের চেয়ার ভর দিয়ে মাথা নামিয়ে কী যেন বলল। গাজিউল মাথা ফিরিয়ে কিছু নির্দেশ দিল। ফিরে এসে বলল : চল্, জগন্নাথ কলেজে যেতে হবে একবার। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় যানবাহন খুব কম। যে-সব দোকান খুলেছে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়ে অনুরোধ জানাতেই বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন চলাচলও কমে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভ্যানের পর ভ্যান পুলিশ এসে জমায়েত হ'তে লাগল। মাথায় হেলমেট। কোমরে টিয়ারগ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো বা বেঅনেট লাগানো রাইফেল। সূর্যের আলোয় বেঅনেটগুলি চক চক ক'রছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটা ব্যারিকেড ক'রে দাঁড়িয়েছে তারা। বেলা দশটা থেকেই একে একে ছাত্ররা জমায়েত হ'তে শুরু ক'রলে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। মেয়েরাও আসছে। দৃঢ় পদক্ষেপে পুলিশের ব্যূহ ভেদ ক'রে চলে আসছে তারা। ভয়-ডর আজ কোথায় উবে গেছে জানি না। রক্তে জেগেছে সর্বনাশা মাতন।

বারোটায় সভা সুরু হ'লো গাজিউলের সভাপতিত্বে। বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ গিসগিস ক'রছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীতে। সারা শহরের সমস্ত স্কুলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভেঙে পড়েছে আজ এখানে। মহাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটীর আহবায়ক আবতুল মতিন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ-সরকার আমাদের দাবি বান-চাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি ক'রেছে। কিন্তু কাপুরুষের মতো আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। নুরুল আমিনের জেলে কতো জায়গা আছে আমরা দেখতে চাই। দেশ আমাদের ডাক দিয়েছে। মায়ের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। মরণে

আমাদের ভয় কী? রক্ত ছাড়া কবে কোন্ আন্দোলন হ'য়েছে। বাঙলার সাড়ে চার কোটি লোক আমাদের দিকে উন্মুখ হ'য়ে তাকিয়ে আছে। আম্মা সজল চোখে তাঁর অপমানের প্রতিকার ক'রতে ডাক দিয়েছে।

'বলুন, আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ ক'রবেন না ঘরে ফিরে যাবেন?'

সহস্রকণ্ঠে চীৎকার ওঠে: 'আমরা একশ চুয়াল্লিশ ধারা মানি না—মানব না।' উত্তেজনায়, রোদের তাপে রক্ত ফেটে পড়তে চায় তাদেব চোখেমুখে।

সেই প্রচণ্ড গর্জনে বাইরে দাঁড়ানো পুলিশদের মনেও বুঝি শিহরণ জাগে।

এমন সময় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ থেকে শামস্থল হক এলেন। ছাত্র-দেব বোঝাতে চেষ্টা ক'রলেন কেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়।

'কাপুরুষদের কথা শুনতে চাই না। বসে পড়ুন।' হাজার কণ্ঠের চীৎকার ওঠে। কেউ কেউ টিপ্পনী কাটে: 'ঘরে গিয়ে চুবি প'রে বসে থাকুন।' শামস্থল হক অগত্যা বসে পড়লেন।

এই সময় ছাত্রনেতা আবদুস সাত্তার একটা প্রস্তাব দিল। বলল, 'দশজন দশজন ক'রে বেরুলে একদিকে আইনও অমান্য করা হবে অন্য দিকে ব্যাপক গোলযোগও এড়ানো যাবে।'

এ প্রস্তাব মেনে নিতে আপত্তি নেই। সকলেই এতে সায় দিল।

দশজন দশজন ক'রে একটা দল তৈবী হ'তে লাগল। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। নাজিম-নুরুল নিপাত যাক। চুয়াল্লিশ ধারা মানি না—মানব না। চলো চলো এ্যাসেম্বলি চলো।' ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পুলিশবাহিনী সচকিত হ'য়ে ওঠে। হুইসল বাজে। মাইকে জনৈক পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ ভেসে এলো: 'আপনারা বেরুবেন না। বেরুলেই গ্রেপ্তার ক'রব।

কিন্তু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনির গর্জনে সে কথা ডুবে গেল।

এগিয়ে গেলো প্রথম 'দশজনী মিছিলটি'। গেটের বাইরে আসতেই এক ঝাঁক পুলিশ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের ওপর। টেনে হিঁচড়ে তুলল ট্রাকে। ট্রাকের ওপরে দাঁড়িয়েও ওরা আওয়াজ তোলে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে-ধ্বনিতে শিরায় শিরায় তপ্ত তরল স্রোত বয়ে গেল সকলের দেহে।

এবারে দ্বিতীয় দলটি এগিয়ে গেল। এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, ভেটেনারী স্কুল, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট আর কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্ররা যোগ দিয়েছে এবার। গ্রেপ্তার হ'লো তারাও। আবার দশজন বেরুলো। পুরোভাগে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্ররা। মুহুর্মুহু আওয়াজ উঠছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। গ্রেপ্তার হবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কার আগে কে যাবে। বেরুচ্ছে আর গ্রেপ্তার হ'চ্ছে। প্রত্যেকেরই মুখে একই প্রশ্ন, দেখি, জেলে কতো জায়গা আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র থেকে সুরু ক'রে ক্লাস ফোর-এর ছাত্রটি পর্যন্ত নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গেল পুলিশ কর্ডনের দিকে। পা একটুও টলল না। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি কেউ বাদ গেল না।

মেয়েদের একটা দল এগিয়ে চলল। কোমরে আঁচল গুঁজে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে তাঁরা। মুখে স্লোগান: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সে কী দৃশ্য! উত্তেজনায় মাথাটা দপ্‌দপ্‌ ক'রছে। মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে গেল আরও। পুলিশের ট্রাকে আর জায়গা নেই।

এবারে শাহাবউদ্দীনের নেতৃত্বে আর একটা 'দশজনী মিছিল' এগিয়ে গেল। হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় একজন পুলিশ-অফিসার বুটের লাথিতে ফেলে দিল একটি স্কুলের ছেলেকে। ছেলেটি ধূলি ছেড়ে উঠে পুলিশ-অফিসারটির মুখে থু থু ছিঁটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো। লাঠি

পড়তে লাগল এলোপাথারি। ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ে। হৈ-হৈ চীৎকার ওঠে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল ছুটে যায় ওদের দিকে। মুহূর্তে টিয়ারগ্যাসের একটা শেল এসে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। সবাই দৌড়চ্ছে পুকুরে। রুমাল আর ওড়না ভিজিয়ে চোখে দিচ্ছে। এক হাতে চোখে রুমাল চেপে, অন্য হাতে এলোপাথারি ঢিল ছুড়ছি। হাত-কয়েক দূরে আতোয়ারকে দেখলাম। পুলিশও অনবরত একটার পর একটা টিয়ারগ্যাস শেল ছুড়ে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আমগাছটায় সবে গুটি ধরেছে। তাজা তাজা গুটিগুলো টিয়ারগ্যাসে কালো হ'য়ে গেল। কাঁদুনে গ্যাসের অসহ্য জ্বালায় ক্রমশ পিছু হটছি আমরা। অনেকে রেলিং ডিঙিয়ে মেডিকেল কলেজে গিয়ে পড়লাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ আক্রমণ চালাবে ভাবে নি কেউ। সূর্য তখন মাথার ওপর উঠে গেছে। গন্‌গন্ ক'রে জ্বলছে। আগুনের মতো তাত ছড়িয়ে পড়ছে নিচে। গরম হয়ে উঠছে সব। মাঠ, রাস্তা, মানুষ।

শেষ বারের মতো ফুঁসে উঠল সকলে : মার শালাদের। ছুটল ঢিল। কিন্তু কতোক্ষণ আর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল মেডিকেল কলেজে।

রাস্তায় দাঁড়ানো চাপরাশী, রিকসাওলা এবং সাধারণ মানুষ কতোক্ষণ আর মুখ বুজে সইবে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর পুলিশী জুলুম। ঢিল ছুড়তে সুরু ক'রল তারাও। একদল পুলিশ তাদের পিছু তাড়া করল। নিরস্ত্র জনতা আর সশস্ত্র পুলিশে চলল সংঘর্ষ।

পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রবাসেও টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে। রোগীদের কথাও ওরা একবার ভাবে নি। রোগীরা কাশছে আর কম্বলে জড়িয়ে নিচ্ছে চোখ।

ডাক্তার আর নার্সরা ওষুধ, সিরিঞ্জ, ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে করিডর দিয়ে দৌড়ুচ্ছেন এক হাতে নাক-মুখ চেপে।

ইমারজেন্সিতে ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা বয়সের ছাত্রছাত্রী গ্যাসের আক্রমণে কাতরাচ্ছে। পেট চাপরাচ্ছে।

এক জায়গায় দু'জন মেডিকেলের থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী ড্রপারে ক'রে চোখে ঢেলে দিচ্ছে লিকুইড প্যারাফিন। চোখ রগড়ে নিয়ে ছাত্ররা আবার এগিয়ে যাচ্ছে রণাঙ্গনে।

পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়তে চেষ্টা ক'রছে। মরিয়া হ'য়ে সবাই বাধা দিলাম। সার্ট ভিজে গেছে ঘামে। হাতে ফোস্কা পড়েছে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে।

পুলিশ সমানে টিয়ারগ্যাস ছুড়ে চলেছে। ধোঁয়াটে হয়ে গেছে মেডিকেল কলেজের বাতাস।

সমুদ্রতরঙ্গের মতো ফেনায়িত হ'য়ে উঠেছে ছাত্রদের বিক্ষোভ। দুটো পর্যন্ত একটানা সংঘর্ষ চলল।

তিনটায় পরিষদের অধিবেশন। ঠিক হ'লো দশজন দশজন ক'রে পরিষদ ভবনে যাব। এম-এল-এদের কাছে জানানো হবে আমাদের দাবি—প্রাণের দাবি।

ঘণ্টা খানেক বিরাম।

ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের সবুজ ঘাসের ওপর। শিমুলগাছটা থেকে অনেক শিমুল ঝরে পড়েছে ঘাসের ওপর। সবুজ ঘাস লালে লাল।

আতোয়ারও আকাশের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর। পাশেই আলো বসে। ওর ফর্সা মুখটা থেকে যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। খোঁপা ভেঙে পিঠের ওপর নেমে এসেছে দীঘল চুল।

অনেকক্ষণ বাদে আতোয়ার হঠাৎ নীরবতা ভাঙল। বলল, 'আলো, তুমি বাড়ি চলে যাও। এবার আরও বড়ো রকমের গণ্ডগোল হবে। গুলিও চলতে পারে।'

'তবে তুমি যাচ্ছ না কেন?' আলোর বড়ো বড়ো চোখে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

'আমি!' বিস্মিত আতোয়ার বলে, 'কুত্তাদের ভয়ে পিছু হটার চেয়ে প্রাণ দেওয়াও ভালো।'

'বেশ, আমিও তবে তোমার পাশে থাকবো।' আলোর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'একটা কথা ভুলে যাও না কেন যে তোমরা মেয়ে। তোমাদের....'

আতোয়ারের কথা শেষ না ক'রতে না দিয়েই ফুঁসে ওঠে আলো: 'মেয়ে বলে মাতৃভাষার দাবি জানানোর অধিকারও নেই নাকি। নাকি ওটা তোমাদের একচেটিয়া অধিকার।' একটু থেমে আবার বলে, 'তোমার সঙ্গে রাখতে না চাও রাখবে না। আমি একাই পুলিশ-কর্ডন ভাঙব।' আলোর কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে আতোয়ার আমার দিকে তাকাল।

মৃদু হাসলাম। সে হাসির অর্থ, উপায় নেই! কলমি নছি ছোড়ে গা।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেডের নিচে ছাত্ররা আবার জমায়েত হ'তে সুরু ক'রেছে।

তিনটে বাজে প্রায়। অধিবেশন বসার সময় হ'য়ে এসেছে। কয়েকজন সরকারি দলের এম. এল. এ. কে নিয়ে একটা জীপ ছুটে গেল। ছাত্ররা ধ্বনি তুলল: রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

শিমুলগাছটা থেকে টুপ্—টুপ্ দুটো লাল ফুল ঝরে পড়ল।

স্লোগান শুনে ক্লান্ত পুলিশরা মাটি থেকে আবার উঠে দাঁড়াল। পোশাক ঠিকঠাক করে, বেল্টটা কষে নিল। বারোটা থেকে একনাগাড়ে লাঠি চালিয়ে চালিয়ে আর টিয়ার গ্যাস ছুড়ে ছুড়ে ওরাও বড়ো ক্লান্ত। তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ গেটেও ছাত্ররা জমায়েত হয়েছে এবার। আওয়াজ উঠছে, রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

তড়াক্ ক'রে সব ক্লান্তি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল আতোয়ার। ওর ঘামে সপ্‌সপে জামাটা শুকিয়ে গেছে প্রায়। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। ছাত্রদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনি: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—চলো চলো এ্যাসেমব্‌লি চলো।

একজন পুলিশ-অফিসার চীৎকার ক'রে বললেন, দু'জন প্রতিনিধি গিয়ে আপনাদের বক্তব্য এ্যাসেম্‌বলিতে বলে আসুন।

ছাত্ররা থমকে দাঁড়াল। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, তারপর ফিস ফিস গুঞ্জন উঠল।

আতোয়ার চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'ভাইসব, আন্দোলন বানচাল করার এটা একটা চাল। ওরা আমাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখে নিজেরা তৈরী হ'য়ে নিতে চায়। প্রতারকদের কথায় ভুলবেন না। আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই···'

সঙ্গে সঙ্গে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটল অদূরে। ধোঁয়ায় সব কিছু অস্পষ্ট। ছুটো-ছুটি পড়ে গেল। চোখে রুমাল চেপেও আওয়াজ তুললাম, পুলিশী জুলুম চলবে না—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মুহূর্তে সেই কথা ছাপিয়ে ব্যজ পড়ার মতো একটা গর্জন উঠল। এ কি। এ তো টিয়ারগ্যাস শেল ফাটার শব্দ নয়। কিসের আওয়াজ তবে! কে যেন চীৎকার ক'রে বলল: বেঈমানের দল গুলি চালিয়েছে, সাবধান। রাশি রাশি ইটের খোয়া এনে ছুড়ছি পুলিশদের দিকে। পুলিশরা এবার ঢুকে পড়ছে হোস্টেলে।

আতোয়ারকে দেখছি না। আলোর হাত টেনে বললাম, 'শীগগীর এসো।' আলো আর আমি ছাত্রবাসের দোতলায় গিয়ে উঠলাম। আলোর কোচর-ভরা খোয়া।

ওপরে উঠে ঢিল ছুড়ছি। টিয়ারগ্যাস শেল ফাটল আবার। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। চোখ জ্বালা ক'রছে। আবার আওয়াজ উঠল, গুড়ুম্···

গুলি চালাবার আগে 'লাল ফ্লাগ' দেখানোর কথা। কই সেই

সিগন্যাল! ওরা আমাদের সতর্ক হ'তে দিতে চায় না। মারতে চায়। মেরে আমাদের কণ্ঠ রোধ ক'রতে চায়। কতো মারবে ওরা? সাড়ে চার কৌটি মানুষকে কি মারতে পারবে ওরা? অত বুলেট কি আছে লীগ-সরকারের?

নিচে দেখি, আতোয়ার আর অন্য একটি ছেলে একটি অল্প বয়স্ক ছেলেকে ধরাধরি ক'রে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ইমার্জেন্সি রুমের দিকে। বোধহয় সিক্স সেভেনের ছাত্র হবে। মায়া মাখানো কচি মুখটি তার যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। গায়ের সার্ট রক্তে ভিজে সপ্‌সপে হ'য়েও রক্ত পড়ছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়, মাটিতে।

ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ে পড়ে কাঁকর-বিছানো পথের ওপর দীর্ঘ মালা গাথা হ'য়ে চলেছে। আতোয়ারের পাঞ্জাবি আর পাজামার সামান্য অংশই সাদা আছে। লাল হ'য়ে গেছে শহীদের তাজা রক্তে।

আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

আমি আর আলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ইমারজেন্সি-রুমে পৌঁছে গেলাম। যাদের শরীর ছড়ে গেছে বা কেটে গেছে, এবং যারা চোখে প্যারাফিন লাগাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল সকলের কণ্ঠে চীৎকার ওঠে: 'এ কি! গুলি ছুড়েছে!' মিনতি ভরা গলায় নার্স আর ডাক্তারেরা বলে, 'আমাদের দেখতে হবে না, একে দেখুন।'

বলতে হয় না। তার আগেই নার্স আর ডাক্তাররা ছুটে এসেছে। নার্সদের কাছে মৃত্যু জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে! সর্বদাই দেখছে কতো কতো লোকের মৃত্যু। মৃত্যু দেখে ওঁরা বিচলিত হন না। কিন্তু জব্বারের রক্তাক্ত দেহ দেখে স্থির থাকতে পারছে না তাঁরাও। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল একজন নার্স। জানি না কান্নার আবেগে অথবা আক্রোশে।

জব্বারের দেহ ততক্ষণে নিথর হ'য়ে গেছে।

পরক্ষণেই আরও কয়েকটি ছেলে নিয়ে এলো গুলিবিদ্ধ আর-

একটি ছেলের দেহ। তাজা রক্ত গলগল ক'রে পড়ছে মাথার খুলি থেকে। সে দেহেও প্রাণ নেই। নাম জানা গেল, রফিক।

ইমারজেন্সি-রুমে আতোয়ারকে দেখতে পেলাম না। এ দৃশ্য দেখা যায় না। জানি না গলানো লোহা কতো উত্তপ্ত! মনে হচ্ছিল তেমনি তপ্ত রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে শিরায় শিরায়। আলোর দু'চোখে দেখলাম আগুন ঠিকরে পড়ছে।

বাইরে আসতেই চোখ জ্বালা ক'রে উঠল। ছাত্রাবাসের ভিতরের কলে ভিজিয়ে নিলাম রুমাল। আলো শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে নিচ্ছে। গলগল ক'রে পড়ে চলেছে জল। কলের কাছে ভিড় জমে উঠেছে!

গেটের দিকে পা বাড়ালাম।

গুড়ুম-দড়াম্-ফুস্স গুড়ুম-দড়াম্-ফুস্স—গুলি আর টিয়ারগ্যাস শেল ফাটার আওয়াজ মিলেমিশে একাকার। ধোঁয়ায় কাছের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। চোখ জ্বালা ক'রছে। জলে ভেজানো রুমালটাও শুকিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে শুধু বলছি, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এক সময় আলোকে বললাম, 'থাকা যাবে না, অন্য দিকে চলো। কিন্তু আতোয়ারটা যে কোথায় গেলো!'

দেখলাম, আতোয়ারের জন্য আলোও খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছে। যে রকম খেয়ালি আর একরোখা ছেলে! কী যে ক'রে ঠিক নেই। জানি হৈ-হট্টগোল আর গুলি-টিয়ারগ্যাসের আওয়াজ ছাড়িয়ে আমাদের ডাক আতোয়ারের কানে পৌঁছবে না। তবু চীৎকার করে ডাকলাম, 'আ-তো-য়া-র...।' পুলিশের টিয়ারগ্যাস শেলের বিস্ফোরণ কিংবা গুলির শব্দ তার জবাব দিল। আতোয়ারের সাড়া নেই।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছি। হঠাৎ অদূরে দেখলাম মাটিতে কে একজন পড়ে রয়েছে দুহাতে পা চেপে ধরে। বোধ হয় পায়ে গুলি লেগেছে।

ঘাড় নিচু ক'রে ছুটে গেলাম। আমার পিছু পিছু আলো। কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম, একি, এ যে আঁতোয়ার!

আলো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আতোয়ারের ওপর। কান্নার বেগ চাপতে চাপতে বলল, 'একি, কখন লাগল?'

অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে কোনোমতে আতোয়ার বলল, 'খানিক আগে। একটা দুটো নয়, অনেক—অনেক গুলি ছুড়েছে খুনেরা।'

আতোয়ারের পা থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা গাঢ় লাল রক্ত।

আলো তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল ফালা দিয়ে চিরে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। পলকে ভিজে গেল কাপড়ের পট্টি।

দু'জনে ধরাধরি ক'রে নিয়ে চললাম ওকে। ইমারজেনসি-রুমের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে আলোর দিকে বড়ো বড়ো চোখ ক'রে চেয়ে আছে আতোয়ার। কান্না লুকোতে আলো চোখ ফেরাল।

দু'পা যেতেই আর একটি ছেলে এসে ধরল। আলোকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'আপনি ছাড়ুন, আমরা নিয়ে যাচ্ছি।'

আলো নিঃশব্দে হাতটা সরিয়ে নিয়ে পাশে পাশে চলল। আতোয়ারের হাতটা ঝুলে পড়েছিল। নিজের হাতে তুলে নিল আলো। দ্রুত পায় ইমারজেন্সি-রুমে এলাম। দেখলাম, গুলি লেগেছে আরো অনেকের। ডাক্তার, নার্স আর মেডিকেল স্টুডেণ্টরা মেসিনের মতো কাজ ক'রে চলেছে। অবিচলিত অথচ দৃঢ় হস্তে অপারেশন ক'রে গুলি বের ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে একের পর এক।

একের পর এক আসছে গুলিবিদ্ধ দেহ। লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটেছে কারু। অতিরিক্ত টিয়ারগ্যাসের যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে ক'রতে আসছে কেউ। হু হু ক'রে আহতদের সংখ্যা বেড়ে চলে। বেড নেই আর। মেঝেতে কম্বল পেতে দিয়ে শয্যার ব্যবস্থা করা হলো শেষে।

দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল গুলির খবর। রিকসাঅলা আর পথচারিদের মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। রাস্তায় রাস্তায় চলছে জটলা। মানুষ ভুলে গেছে একশ' চুয়াল্লিশ ধারার কথা। কিংবা মনে থাকলেও সাধারণ মানুষ আজ ছাত্রদের মতো লীগ-সরকারের আইন ভঙ্গ ক'রবার জন্য ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছে।

যেতে যেতে কোনো পথচারি জটলার মাঝে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে, কোথায় গুলি ছুড়েছে ? কয়জন মারা গেছে ?

কে কার উত্তর দেয়। কেউ বলে দশজন, কেউ বলে পাঁচ জন, কেউ-বা বলে সতের জন মারা গেছে। একজন তো বলে, আমার সামনেই তো পাঁচ জনকে নিয়ে যেতে দেখেছি হাসপাতালে। উঃ সে কী রক্ত !

আর-একজন বলে ওঠে, আহা রে, কচি কচি ছেলেদের এমনি মারে ! কশাই কশাই ! ওরা কশাই।'

একজন রিকসাঅলা আর-একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে, একঠো রিক্‌সাঅলা ভি বলে মরিস্ গুলিমে ?

কিছুক্ষণ থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাবলাম, আজ বোধ হয় পুলিশ আর গুলি ছুড়বে না। কিন্তু ভুল ভাঙল পর মুহূর্তে, গুড়ুম—গুড়ুম্ আওয়াজ শুনে। বারান্দায় ছুটে এলাম। ভয়ে আর্ত চীৎকার ক'রতে ক'রতে পাখিরা বাসা ছেড়ে নীল আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের শেডের নিচে দাঁড়ানো একটি ছেলেকে গুলি ক'রেছে উরুতে। মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চকচকে বারান্দা।

কয়েকজন ছেলে ধরাধরি ক'রে দ্রুত সরিয়ে নিল তাঁকে।

এবার তো কোনো প্ররোচনা ছিল না ! কোথায়ও সামান্য শ্লোগানটুকু পর্যন্ত নেই ! ওরা খুনে। খুনের নেশায় মেতে উঠেছে।

ধরাধরি ক'রে ইমার্জেন্সি-রুমে নিয়ে এলো তাঁকে। আঘাত গুরুতর। রফিক আর জাব্বার ছাড়া আর এত গুরুতর আঘাত কারো লাগে নি। গলগল ক'রে রক্ত পড়ছে। মেঝে ভেসে যাচ্ছে। মুমূর্ষ অবস্থা। যন্ত্রনায় মুখ বিকৃত হ'য়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

ফিস ফিস ক'রে কাছের ছেলেটাকে বলল, 'আমাদের বাড়িতে একটু খবর পাঠাবেন? বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন....পল্টন লাইন।' একটু দম নিয়ে বলল, 'একটু পানি।'

একজন মেডিকেলের ছাত্রী ছুটে গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। খাইয়ে দিল সযত্নে।

জল খেয়ে একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'আম্মাকে এখুনি চলে আসতে বলবেন—বলবেন, বরকত আপনাকে শেষবারের মতো দেখতে চায়।'

তারপর মরণের ঘোরে বলে চলল, 'কখন মরণ আসে.... রূপসী বাংলা যেন বুকের ওপর....শুয়ে থাকি....

খাপছাড়া কথাও হ'তে পারে। তবে আমার মনে হ'লো বরকত জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে আওড়াচ্ছে। বোধ হয় এই জায়গাটা :

কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো ;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখেমুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

নার্সরা এসে দ্রুত তাঁকে অপারেশন রুমে নিয়ে গেল। দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে।

এম. এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র বরকত। বুড়ো বিধবা মায়ের বড়ো আদরের ধন। তাঁকে ঘিরে কতো তাঁর আশা। ছেলে পাশ

ক'রবে, ভালো চাকুরি ক'রবে, টুকটুকে বউ আসবে, তিনি নিজে পছন্দ ক'রে বউ আনবেন ঘরে। বরকত বড়ো ভালো ছেলে। মা অন্ত প্রাণ। মায়ের কথা ছাড়া কিছু করে না। তিনি জানেন, তাঁর পছন্দ-করা বউ বরকতের অপছন্দ হবে না। কতো রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে প্রহরের পর প্রহর স্বপ্নসুখে বিভোর হ'য়ে থেকেছেন বরকত-জননী।

বিধবা মায়ের বুকফাটা চীৎকারে হাসপাতালটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি তাঁর বরকতের রক্তমাখা নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর। শেষ দেখাও হ'লো না।

মেডিকেল কলেজের একজন অল্প বয়স্কা ছাত্রী বরকতের মায়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আম্মা, তোমার এক ছেলে গেছে আমরা তোমার কতো ছেলে-মেয়ে রয়েছি। তুমি তো আমাদের সকলের আম্মা। আমাদের দিকে তাকাও। তোমার বরকতকে আমাদের মধ্যে খুঁজে পাবে।'

বরকত-জননী ধীরে ধীরে মাথা তোলেন। মেয়েটির দিকে তাকান। চোখ ফেরান ঘরের সকলের দিকে। শত শত ছেলে-মেয়ের দুগাল বেয়ে গড়াচ্ছে অশ্রুধারা। ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে মাটিতে। কিন্তু সে জল-ভরা চোখেও যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দেখে বৃদ্ধা বরকত-জননীর ন্যুব্জ দেহটা সোজা হ'য়ে ওঠে। চোখে জ্বলে ওঠে মশালের আগুন।

খবরটা শুনে তড়িতাহত হবার মতো সকলে প্রথমটায় স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তারপর ফেটে পড়ে সাগরের মতো গর্জন ক'রে। সরকারি কর্মচারি, রিকসাঅলা, পথচারি, শ্রমিক, দোকানদার সকলেরই কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। জালিম মুসলিমলীগ সরকার নিপাত যাক্।

পরিষদকক্ষেও পৌঁছোয় সে খবর। মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম পরিষদকক্ষে ঝড়ের বেগে ঢুকে

খবর দিলেন, পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে। বিরোধীদলের সদস্তরা ফেটে পড়ে উত্তেজনা আর ক্রোধে। এই হত্যাকাণ্ডের জবাব চান মুরুল আমিনের কাছে। মুলতবী প্রস্তাবের দাবি ওঠে।

মুরুল আমিল তো প্রথমে স্বীকারই ক'রতে চাইলেন না যে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছে। বললেন, 'ইটস্ এ ফ্যানটাসটিক স্টোরি।' বিরোধীদের চাপে কথাটা শেষে স্বীকার ক'রে নিলেও নির্লজ্জের মতো আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বললেন, 'পুলিশ ঠিকই ক'রেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা দমানোর জন্যই তো পুলিশ। এর পিছনে কমুনিস্টদের উস্কানি আছে। আমরা তাদের নির্মূল ক'রবই।'

টেবিল চাপড়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল বিরোধীদলের সদস্যরা। সরকার পক্ষের অনেক সদস্যও মুরুল আমিনের এই নির্লজ্জ উক্তির নিন্দা ক'রলেন। সরকারি দলের সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও খয়রাত হোসেনের মুলতবী প্রস্তাব সমর্থন ক'রলেন। তীব্রভাষায় নিন্দা ক'রলেন পুলিশের গুলি চালনার। ছাত্রদের ওপরে পুলিশী নির্যাতনের এবং মুখ্যমন্ত্রী মুরুল আমিনের নির্লজ্জ উক্তির প্রতিবাদে মুসলিমলীগ পার্টি থেকে সেই মুহূর্তে পদত্যাগ ক'রলেন তাঁরা। পরিষদকক্ষে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে মুসলিমলীগের মৌলানা তর্কবাগীশ বললেন, 'আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদত বরণ ক'রছেন, আমরা তখন আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব এ বরদাশত্ করা যায় না। চলুন, মেডিকেল কলেজে চলুন। মেডিকেল কলেজ আজ সাড়ে চার কোটি জনতার তীর্থস্থান। শহীদের রক্তে পবিত্র হ'য়েছে সেখানকার মাটি।' তারপর তর্কবাগীশ এবং শামসুদ্দিন সাহেব খয়রাত হোসেনের সঙ্গে পরিষদকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। শামসুদ্দিন সাহেব পরে পরিষদের সদস্যপদেও ইস্তফা দেন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তখন অভূতপূর্ব দৃশ্য! রোড-স্ট্রীট-লেন-বাইলেন থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতার স্রোত এসে মিশছে

জনসমুদ্রে। মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। হাজারে হাজারে লোক এসে ঢুকছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে, বারান্দায়, বাইরে! শহীদের তাজা তাজা রক্তে স্নাত মাটি ঘাস ধুলি দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কতো জনা। চোখে বেদনা আর শ্রদ্ধা। কয়েকজন রক্তমাখা ধুলি তুলে কপালে ছোঁয়াল।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। যে দিকে তাকানো যায় দেখা যায়, আবছায়া অন্ধকারে কালো কালো মাথা, অগণিত। কাতারে কাতারে আরও লোক আসছে শেষ বারের মতো বরকত রফিক আর জাব্বারকে এক পলক দেখে নিতে, দেখে নিতে সেই সব বীর সন্তানদের যারা আহত হ'য়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে, মেঝেতে। সারা ঢাকা নারায়ণগঞ্জের লোক ভেঙ্গে পড়েছে আজ মেডিকেল কলেজে।

আলো আতোয়ারের কাছেই বসে রয়েছে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত অনেকে ওকে আতোয়ারের খবর জিজ্ঞেস ক'রছে। মৃদুস্বরে তাঁদের সঙ্গে কথার জবাব দিয়ে চলেছে সে। আতোয়ারের আঘাত খুব গুরুতর নয়, তাড়াতাড়ি সেরে যাবে মনে হ'চ্ছে।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভবনে তোলা হ'য়েছে শহীদের রক্তে ছোপানো পতাকা। হোস্টেলের মাইকগুলো থেকে ভেসে আসছে খবরের পর খবর, বক্তৃতা। আগামীকালের কর্মসূচী আহত আর শহীদের নাম-ঠিকানা ঘোষণা চলেছে বার বার, মাঝে মাঝে দিচ্ছে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ:

'পুলিশ আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছে, নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে রফিক জাব্বার আর বরকতকে। লাঠি আর বেঅনেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রেছে শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রছাত্রীকে। কুকুরের মতো রাস্তায় ফেলে পুলিশ পিটিয়েছে শত শত ছাত্রকে। আমাদের অপরাধ, বলতে গেছিলাম আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না।

'কিন্তু ওরা জানে না গুলি আর টিয়ারগ্যাসে আমাদের দমাতে পারবে না। কতো রক্ত নেবে ওরা। বাংলার ছেলেমেয়েরা রক্ত

দিতে ভয় পায় না। আমাদের আন্দোলন চলবে—এগিয়ে আমরা চলবই। লিয়াকত-নাজিমকে আমরা বাঙলা-ছাড়া ক'রবই। আমরা জানি, আপনারা, দেশের সাড়ে চার কোটি লোক আমাদের পিছনে আছেন। আমরা সবাই মিলে যদি আওয়াজ তুলি, কারো সাধ্য নেই সে দাবি নস্যাৎ ক'রে দেয়। সকলে আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল অযুত জনতা। গর্জে উঠল : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আজ তাদের মন থেকে সব ভয়-ত্রাস চলে গেছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সংগ্রামেব দৃঢ় শপথ।

সর্বদলীয় সংগ্রাম-পবিষদের সদস্যরা আব মিলিত হ'তে পারে নি। ছাত্র সংগ্রাম-পবিষদেব সদস্যদের কেউ গ্রেপ্তার হ'য়েছে, কেউ-বা আহত, অন্যেরা পলাতক। পুলিশ হন্যে হ'য়ে ফিরছে তাদের পিছনে। কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে জানি না। কিন্তু সংগ্রাম বন্ধ হ'তে পারে না। মেডিকেল-কলেজ আর ইনজিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা সংগ্রামেব নেতৃত্ব কাঁধে নিল। সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে মেডিকেল কলেজেব ছাত্রবা হোস্টেলে হোস্টেলে কনট্রোল-রুম স্থাপন ক'রল। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ইডেন হোস্টেল, প্রভৃতিতেও কনট্রোল-রুম স্থাপিত হ'লো। আন্দোলন পরিচালনা আর পুলিশী হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কবা হ'লো রাতাবাতি।

একুশের বক্তে স্নান ক'রে বাইশের সূর্য উঠল। রোজকার মতো তার সেই হাসি ছড়ানো মুখ আর নেই। সূর্যকে আজ বড়ো করুণ, বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ইনজিনীযাবিং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—যতদূব দেখা যায় কালো পিচেব রাস্তাটায় ছড়িয়ে রয়েছে ইটের টুকরো। গাছে গাছে পড়েছে সূর্যের লাল আলো। পলাশগাছের মাথাটা আজ কতো লাল!

আজকের দিনটা যেন বোজকার মতো নয়। রাস্তাঘাট ফাঁকা, বড়ো নির্জন। রোজকার মতো সাইকেল-রিকসার ক্রিং ক্রিং শব্দ নেই। বাসের ঝা-ঝা আওয়াজটাও আজ অনুপস্থিত।

ভোরের নীরবতা খান্ খান্ হয়ে প্রথম ভেঙে গেল ছাত্রবাসগুলোর মাইকের আওয়াজে। ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠের গান ভেসে এলো। রবীন্দ্রনাথের গান :

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে ॥······

লীগ-নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টির সুরু থেকেই হিন্দু-বিদ্বেষী প্রচারে উঠেপড়ে লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ সুকান্ত শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু। তাঁদের লেখা ইসলাম-বিরোধী। ওসব পড়া গুণাহ্ ব কাজ। প্রথম দিকে তাদের প্রচারে কিছুটা কাজও হ'য়েছিল। অনেকে ভাবত, সত্যিই তো আমরা স্বাধীন হ'য়েছি। আমরা হিন্দুদের লেখা পড়ব কেন? আমরা আমাদেব সাহিত্য তৈরী ক'রব। লিখব আমাদের কথা। কিন্তু পূর্ববাঙলার ছাত্রসমাজ এই অপপ্রচারে ভোলে নি। তাদের ওই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের জবাব দিয়েছিল '৪৮ সালের ১১ মার্চের আন্দোলনেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ সুকান্ত একান্তই বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। তাঁরা হিন্দু নন, মুসলমান নন, খ্রীস্টান নন, তাঁরা বাঙালী। তাদেব রচনা সকল বাঙালীরই যৌথ সম্পদ। তাইতো আজ ছাত্ররা এগিয়ে চলার মন্ত্র নিচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, উজ্জীবিত হ'য়ে উঠছে এক আশ্চর্য শক্তির স্ফুরণে।

মেডিকেল কলেজ-ছাত্রাবাসের মাইকে একজন তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বলে চলেছে :

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কাবো শেখীবা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন লগনের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?

না, না, না খুনরাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেবরুয়ারি, একুশে ফেবরুয়ারি।

... ...

ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণাপদাঘাত এই বাঙলার বুকে
ওবা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্নবস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেবরুয়ারি একুশে ফেবরুয়ারি॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেবরুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বাল্‌বো ফেবরুয়ারি
একুশে ফেবরুয়ারি একুশে ফেবরুয়ারি।'

নিস্তেজ শিরাগুলি আবার সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। গায়ের রোম শিউরে উঠছে। প্রথম ফাল্গুনের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। তার মৃদু উতল হাওয়ায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের মাথায় রক্ত-পতাকাটা উড়ছে। মাইক থেকে জ্বালা-ধরানো কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আবৃত্তি গান আর বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ঘোষণা—সেদিনকার কর্মসূচীর ঘোষণা।

প্রভাতী খবরের কাগজ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গঞ্জে। প্রথম পাতায় আট কলম জুড়ে খবরের হেড লাইন: নিরস্ত্র ছাত্রজনতার উপর পুলিশের গুলি। ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত, ১৮০ জন গ্রেপ্তার। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।

তারই নিচে লিখেছে : আজ শহীদের লাশ দাফন। মেডিকেল কলেজে গায়েবী জানাজা।

তারপর পাতার পর পাতা জুড়ে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ। শহীদদের সম্পার্কে বিশেষ রচনা। টিয়ারগ্যাস আর লাঠি চার্জের ফটো। ফটো শহীদদের। তার চার পাশে কালো মোটা রেখা।

কাগজ পড়ে স্তম্ভিত, শোকাভিভূত সারা দেশের মানুষ। কারো চোখে দেখা দেয় জল। কারো চোখে ক্রোধ, ঘৃণা। বুকে জ্বালা, চোখে আগুন নিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে চলেছে মেডিকেল কলেজের দিকে। খালি পা। বুকে কালোব্যাজ। মেয়েরা পড়েছে কালোপাড় শাড়ি। বুকে লাগিয়েছে কালোব্যাজ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এমন কি দূর দূর অঞ্চল থেকে জনতার স্রোত এসে মিলছে মেডিকেল কলেজের সামনে। মজুর, কেরানী, রিকসাঅলা, ছাত্র, শিক্ষক সাংবাদিক, সাহিত্যিক কেউ বাদ নেই--সবাই এসেছে।

আতোয়ারের জ্ঞান ফিরেছে ভোরের দিকে। আলো বলছিল, আমাদের সংগ্রাম সার্থক। দেশের লোক আজ সাড়া দিয়েছে আমাদের ডাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে গায়েবী জানাজায়। শোভাযাত্রা বেরুবে পরে। মানুষেব কাতাব যে কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ দেখা যায় না।

শুনতে শুনতে আতোয়ারের চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। মাইকে চলছে কোরান তেলোয়াত।

হঠাৎ আতোয়ার বলল, 'কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে যে! তোমরা যাচ্ছ না কেন?'

আলোই ইতস্ততঃ ক'রে জবাব দিল, 'তোমাকে ফেলে........'

কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই ক্ষুব্ধ স্বরে আতোয়ার বলে ওঠে, 'আজকের জানাজায় আর মিছিলে শরিক হ'তে না পারার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের না হয়। ইচ্ছে ক'রছে ছুটে চলে যাই সেখানে। লক্ষ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে রফিক-জাব্বার-বরকতকে সালাম জানাই।

আমার জন্য তোমরা এখানে বসে থাকলে অপরাধের গ্লানি আমার পর্বতপ্রমাণ হ'য়ে উঠবে। তোমরা যাও।'

ব্যাজ অবশ্য আলোর ছিল। কিন্তু আমার হাত থেকে একটা ব্যাজ নিয়ে আতোয়ার নিজের হাতে পরিয়ে দিল আলোর হাতে। আলোর চোখ বেয়ে দুফোঁটা জল পড়ল। সেই জল বেদনাব, না সুখের, জানি না।

লাখো জনতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরাও। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। ঢাকায় এমন বিশাল জনসমুদ্র আগে আর কেউ দেখে নি।

গায়েবীর জানাজার সময় হ'লো। হঠাৎ জানা গেল শহীদদের লাশ নেই। লীগ-সরকার লাশ দেবে না। রাতারাতি কোথায তারা লাশ সরিয়ে ফেলেছে। জনতাব সামনে ওরা লাশ বের করতে ভয় পায়। ওরা জানে শহীদেব প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে জন্ম নেবে লাখ লাখ রফিক-জাব্বাব-বরকত।

জনতা ক্ষুব্ধ। ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠছে জন-সমুদ্রে। শহীদের লাশ দাফনের সুযোগ পাবে না তাঁর আত্মীয়স্বজন আব দেশবাসী—এ হ'তেই পারে না।

কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও লাশ পাওয়া গেল না।

লক্ষ জনতা কি তাহ'লে ফিরে যাবে?

না, লাশ ছাড়াই গায়েবী জানাজা হবে?

ইমাম সাহেব দু'হাত তুলে মোনাজাত ক'রলেন, আল্লাহ্, জালিমের গুলিতে কচি কচি ছেলেরা মারা গেছে। ওদের খুনে রাঙা হয়েছে ধুলো আব ঘাস। তুমি তো জানো আল্লাহ্, ওরা নিরপরাধ। ওরা শুধু বলেছিল, ভাষা—বাপ-দাদার মুখের ভাষা ওরা কেড়ে নিতে দেবে না। কিন্তু গুলি ক'রে জালিমরা খালি ক'রে দিল কতো মায়ের বুক। তুমি ওদের ক্ষমা ক'রো না। তোমার রোষেব আগুনে জালিমদের নিশ্চিহ্ন করো দুনিয়ার বুক থেকে।'

তারপর উপস্থিত জনতার কাছে ভাষণ দেবার জন্যে উঠলেন যুবলীগ নেতা গুলি আহাদ। অবিন্যস্ত চুল, চোখে আগুনের ঝিলিক। গুলি আহাদ বলে চললেন: বাংলাভাষার কণ্ঠরোধ ক'রে পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি বাঙালীকে পঙ্গু ক'রে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে অনেকদিন থেকে। আমরা সে চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রবই। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। পুলিশের গুলি আর টিয়ারগ্যাসকে বাঙলার ছেলেরা ভয় পায় না। রফিক-জাব্বার-বরকতের রক্ততিলক নিয়ে আজ আপনারা শপথ নিন—শয়তানদের চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ ক'রবই—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতেই হবে—না হ'লে রফিক জাব্বার বরকতের আত্মা শান্তি পাবে না। সাড়ে চার কোটি বাঙালীর বজ্র নির্ঘোষ দাবির আওয়াজে মুসলীমলীগের কায়েমীশাসন টলে উঠবে নিশ্চিত।'

একটু থেমে জনতার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। এতক্ষণ মাইকে যেন তিনি আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এবারে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এখন আমাদের শোক মিছিল বেরুবে। এখান থেকে বেরিয়ে নবাবপুর রোড হ'য়ে চকবাজার দিয়ে ফিরে আসব এখানে। শাসকরা আমাদের শক্তির পরিচয় নিক।'

মিছিল বেরুবে, এমন সময় প্রজেশ এসে খবর দিল বিরাট এক বিক্ষুব্ধ জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সদরঘাটে মর্নিং নিউজ পত্রিকার বহ্নি-উৎসব ক'রেছে। আজকের মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রথম পাতার খবর পড়ে জনতা ক্ষেপে গেছে। মর্নিং নিউজ দেখার সময় এখনো আমি পাই নি। প্রজেশ বলল, ওই পত্রিকায় আজ হেড লাইন দিয়েছে: "Dhoties roaming Dacca street. Police forced to resort firing on unrully mob. Government brought the situation under control. হিন্দুস্থানের দালালরা ঢাকার রাস্তাঘাট ছেয়ে ফেলেছে এবং পুলিশ

বাধ্য হ'য়েই ছুষ্কৃতিকারীদের ওপর গুলি ছুড়েছে। সরকার দক্ষতার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্বে এনেছেন।

কিন্তু সরকারের চালে এবার ভুল হ'য়েছে। হিন্দুরা ভারতের দালাল, কমিউনিস্ট—তারা পাকিস্তানের শত্রু। তারাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার জন্য এই রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলেছে—এই ধুয়ায় এবারে কাজ হ'লো না। বাংলা হিন্দু মুসলমান দু'জনেরই ভাষা। দু'জনেই লড়ছে মাতৃভাষার দাবি আদায়ের জন্য। এখানে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান নয়। সকলেই বাঙালী। এই বিভ্রান্তিকারক সংবাদে সাধারণ লোক ওদের অফিসে আগুন লাগিয়েছে, পত্রিকা পুড়িয়েছে। সকলের মুখে একই কথা, ইংরেজের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি এখানে চলবে না।

প্রজেশ বাংলা বাজারে ওর মেস থেকে আসছিল। পথে দেখে এসেছে এসব।

চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ ক'রে লাখো জনতার মিছিল বেরুল পথে। নবাবপুর রোডে গিয়ে পড়েছে মিছিলের প্রথম অংশ, পিছনের অংশ তখনো হাইকোর্টের কাছে। দোকান-পাট যানবাহন, কারখানা সব বন্ধ। এগিয়ে চলেছে মৌন মিছিল। সূর্য তখন প্রায় মাথার উপরে উঠে গেছে। দুপাশে হেলমেটধারী পুলিশের সার। শোকের ছায়া তাদেরও চোখে। হাতের অস্ত্র শিথিল হ'য়ে এসেছে। কিন্তু তারা তো হুকুমের গোলাম। একজন পুলিশ অফিসার ওয়্যারলেসে সম্ভবত হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এনে অর্ডার দিল: চার্জ। থমকে দাঁড়িয়েছে পুলিশবাহিনী। এই নীরব শান্তিপূর্ণ মিছিলে কী ক'রে লাঠি চার্জ করবে তারা! কী করে এতখানি অমানুষ হবে তারা! অফিসারটির চীৎকার আবার ভেসে এলো: চার্জ।

পরমুহূর্তে মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ-বাহিনী। লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটল অনেকের, যে যেদিকে পারল ছুটল, আশ্রয়

নিল কার্জনহলে—হাইকোর্টে। আক্রমণ চালিয়েছে মিছিলের মাঝের অংশে। আগের বা পিছনের লোকেরা জানে না সে খবর। শোনা গেল শেরে বাঙলা ফজলুল হক সাহেবও আহত হ'য়েছেন পুলিশের লাঠিতে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই গুলির শব্দে সকলে চমকিত হ'লো। হাইকোর্টের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ল ক্লাসের একটি ছাত্র—নাম শফিকুর রহমান। কালো পিচের রাস্তা শফিকুরের তাজা রক্তে লাল হ'য়ে গেল। সেখানটায় ওপরের গাছটা থেকে রাশি রাশি রাঙা পলাশ ঝরে ছড়িয়ে ছিল। শফিকুরের রক্তে সেগুলো আরও রাঙা হ'লো।

লোকের মুখে মুখে মিছিলের পুরোভাগে বিদ্যুত গতিতে সে খবর গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু ফেরার উপায় নাই। নবাবপুর রোড মানুষে মানুষে ছয়লাব। রাস্তার ধারের দালানের ছাদ থেকেও অগণিত মানুষ দেখছে সেই শোভাযাত্রা। দুপাশের বহু লেন-বাইলেন থেকে আরও মানুষ এসে যোগ দিয়েছে সেই মিছিলে। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রছে তাদের অসহ্য রাগে। ঘৃণায় মুখ আরক্ত, কুঞ্চিত। কিন্তু মিছিল থামে না, এগিয়ে চলে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে মিলল এসে মেডিকেল কলেজে। এসে শুনল, শফিকুর আর নেই।

আরও কতো শফিকুর যে সেদিন প্রাণ দিয়েছিল জানি না। পুলিশের ভ্যান মুহূর্তের মধ্যে লাশ সরিয়ে ফেলেছিল। পরের দিন খবরের কাগজে দেখা গেল, ৫ জন নিহত এবং ১২৫ জন আহত হ'য়েছে। গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে ৩০ জনকে। 'সংবাদ' অফিসেব সামনেও পুলিশ ওই দিন জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল।

বিক্ষুব্ধ জনতা ফেটে পড়ল কাঁটাতারে ঘেরা এ্যাসেমব্লির সামনে।

বেলা তখন তিনটে। পরিষদের অধিবেশন বসেছে। বিরোধীদল থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিল। সরকারি দলের কিছু সদস্যও সমর্থন জানালেন সে-প্রস্তাবের।

এদিকে চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহম্মদ আর নুরুল আমিনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। নুরুল আমিনের আদেশ আজিজ আহম্মদ মানছেন না। কাল রাতেও ফোনে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হ'য়েছে দু'জনের। আজিজ আহম্মদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন খাজা সলিম প্রমুখরা। নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ: তাঁর কোনো শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা নেই। নুরুল আমিনের কোণঠাসা অবস্থা। বেগতিক দেখে তিনিও বিরোধীদলের প্রস্তাবে সায় দিলেন। লীগ-সরকার বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা ক'রতে রাজী হ'লো এবং তা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করতেও বাধ্য হ'লো।

ভাষা-আন্দোলনের দু'টি রক্তাক্ত দিন চলে গেল। আন্দোলন এখনো শেষ হয় নি, রক্তঝরার আরও দিন আসছে। কেন্দ্রীয়-সরকার তাদের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এ-আন্দোলন চলবেই। বেঈমানদের মিথ্যা স্তোকে ছাত্রসমাজ আর ভুলতে নারাজ। গোলাম মোহাম্মদ অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে সুলেরীকে পাঠালেন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে। কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই। বাঙলার সাড়ে চার কোটি জনতা এ-দাবি ছাড়তে পারে না -এ যে তাদের প্রাণের দাবি—রাজনৈতিক দর-কষাকষি নয়।

গত দুই দিন ধরে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলো পর্যন্ত গায়েব ক'রেছে ওরা। আত্মীয়-স্বজন এবং দেশবাসীকে শেষ বারের মতোও সে-লাশ দেখতে দেওয়া হয় নি। ২৩ ফেবরুয়ারির 'দৈনিক মিল্লাদ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখল: ইসলামী বিধান অনুসারে লাশ খুবই পবিত্র। অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে সে লাশ দাফন করা বিধেয়। কিন্তু গত দুই দিনে পুলিশের গুলিতে শাহদাত প্রাপ্ত লাশগুলি তাদের অভিভাবকের হাতে দেওয়া হয় নি। জানি না, শরিয়ত মোতাবেক তাদের শেষকৃত্য হ'য়েছে কি না। এ যে কতো বড়ো মর্মান্তিক, অনৈসলামিক এবং গুনাহ্‌র বিষয় তা বলে

[illegible] যায় না। সরকার ঢাকডোল পিটিয়ে প্রচার ক'রছেন পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র। এই কি ইসলামিক রাষ্ট্রের পরিচয়?

জনসাধারণ এ-ঘটনায় আরও ক্ষুব্ধ হ'লো। ধর্মভীতু মানুষরা যারা এতদিন নীরব ছিলেন এই কথা পড়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন।

মেডিকেল কলেজ ছাত্রবাসের গেটের কাছের মাটি আর ঘাসের মতো পবিত্র আর কিছু পূর্ববাঙলায় নেই। বরকতের রক্তে পুণ্য হয়েছে সে মাটি। জাব্বার-রফিকের তাজা রক্তের তিলক পড়েছে সেখানকার ধূলিতে। শহীদ-মিনার গড়ার এই তো যথার্থ স্থান।

সকাল থেকেই ইট বালি চুন সুরকি নিয়ে এলো ছাত্ররা। কোনো রাজমিস্ত্রি নেই। নিজেরাই কুর্নি নিয়ে বসে গেছে। মহা যত্নে, প্রতিটি ইট শ্রদ্ধা আব তপ্ত অশ্রুতে ভিজিয়ে গেঁথে তুলল শহীদ-মিনার।

মিলিটারি ভ্যান টহল দিচ্ছে শহরময়। কিন্তু মানুষের মনে ভয় নেই। বহু ছাত্রছাত্রী, শিল্পী, সাহিত্যিক আর সাংবাদিক হাজির হ'লো শহীদ-মিনারের সামনে। কে উদ্বোধন ক'রবেন এই মিনারের? এই পুণ্যমন্দিরের আবরণ উন্মোচন করার মতো পুণ্যবান মহাজন কে আছেন? রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে অনেকের নাম উঠল। কিন্তু ঠিক মনঃপূত হ'চ্ছে না। হঠাৎ একজন ছাত্র প্রস্তাব ক'রল, শফিকুরের বাবাই এই আবরণ উন্মোচনের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। সত্যিই তো। তার চেয়ে পুণ্যবান আজ আর কে আছেন? শফিকুরের মতো সন্তানের যিনি জনক তাঁর মতো পুণ্যাত্মা আর কয়জন আছেন? আজকের মহৎ অনুষ্ঠানের যোগ্যতম ব্যক্তি তো তিনিই।

ছাত্রদের নিজহাতে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন ক'রতে গিয়ে শফিকুরের পিতা বললেন, 'আমার শফিক আজ নেই। বাংলা ভাষার জন্য সে শহীদ হ'য়েছে। শফিকুরের আত্মা,

বরকত, রফিক, জাব্বারের মতো আরো অনেকের আত্মা তৃপ্ত হবে সেদিনই যেদিন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে। ওরা আজ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে, চেয়ে আছে বাংলার সাড়ে চার কোটি জনতার দিকে। ওই দেখ, দু'চোখে তাদের আকুল প্রতীক্ষা।' তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো। একটু থেমে আবার বললেন, 'হে খোদা, এই সব কচি কচি ছেলেদের বুকের রক্ত যারা ঝরিয়েছে, সেই সব জালিমদের তুমি ক্ষমা ক'রো না।' বলতে বলতে ঝরঝর ক'রে কাঁদতে কাঁদতে মিনারের উপর দু'হাত ভরে ছড়িয়ে দিলেন একরাশ ফুল। সাদাফুল।

আমার আর আলোর হাতে আছে ফুলেব তোড়া। আতোয়ার আসতে পারে নি। আলোর হাত দিয়ে পাঠিয়েছে তার শ্রদ্ধার্ঘ। প্রজেশ নিয়ে এসেছে একটি মালা।

একে একে এগিয়ে গিয়ে ছাত্ররা শহীদ-মিনারে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফুল—রাশি রাশি ফুল। প্রত্যেকের বুকে কালোব্যাজ।

আলো এগিয়ে গিয়ে আগে আতোয়ারের দেওয়া ফুলের তোড়াটি সযত্নে স্থাপন ক'রল মিনারের গায়। তারপর নিজের হাতের গোলাপ ছড়িয়ে দিল। আমিও ছড়িয়ে দিলাম হাতের এ কুগোলাপগুলি। এতক্ষণে যেন সত্যিকারের পূজা সারা হ'লো। মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। আনন্দে ভিতর থেকে কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হোস্টেলের কাঁকর ছড়ানো পথের উপর দিয়ে তিনজনে নীরবে হেঁটে চললাম। খালি পা। পায়ের চাপে ঘি-রঙের নুড়িগুলি সরে সরে যাচ্ছে। শব্দ উঠছে দেখে আরও সাবধানে পা ফেলছি। শব্দ যেন না ওঠে। কোনো শব্দ আজকের দিনে বড়ো বেমানান।

হঠাৎ অনেককে ছুটোছুটি ক'রতে দেখলাম। কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম একদল মিলিটারি ঢুকে পড়েছে মেডিকেল কলেজের ভিতরে। ছুটলাম।

ছাত্রাবাস তছনচ ক'রে মুহূর্তে মাইকটা কেড়ে নিল ওরা। রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে কতো ছেলে। অনেককে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হলের মাইকও নিয়ে গেছে : অত্যাচার ক'রেছে ওখানেও।

রাস্তায় দোকান-পাট সেদিনও খোলে নি। গাড়ি ঘোড়া নেই বললেই চলে। কেউ ডাক দেয় নি। মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবেই হরতাল ক'রে চলেছে।

বিকেলে সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের ছাত্ররা আবার মধুর ক্যান্টিনে মিলল। সভায় ঠিক হ'লো—আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ-দিবস পালন করা হবে।—নিরস্ত্র জনতার উপর লীগ-সরকারের জুলুমের প্রতিবাদে।

রাতারাতি মিলিটারির সংখ্যা বেড়ে কয়েক গুণ হ'লো। গদি আঁকড়ে থাকার জন্য নুরুল আমিন হন্যে হ'য়ে উঠেছে। কেন্দ্র শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতার অপবাদ দিচ্ছে। পদস্থ সরকারি কর্মচারিরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন আন্দোলন দমাতে—গোলাম মোহাম্মদ আর নাজিমউদ্দীনকে খুশি ক'রতে। গভীর রাতে অতর্কিতে হানা দিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ। গ্রেপ্তার ক'রল আবুল হাশেম, খয়রাত হোসেন, মওলানা তর্কবাগীশ, অধ্যাপক মুজাফফর আহম্মদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন সেন প্রমুখকে। তাঁদের অপরাধ? তাঁরা ছাত্রদের দাবি সমর্থন ক'রেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতে বলেছেন। মওলানা ভাসানীকে গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে আনা হ'লো।

কলকারখানা, অফিস-আদালত, যান-বাহন সব বন্ধ। পরিস্থিতি এমন হ'য়ে উঠল যে শেষে অনন্যোপায় হ'য়ে গভর্নরকে ২৪ ফেবরুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ক'রে দিতে হ'লো।

পরিষদ ভেঙে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই সরকার আবার নবোদ্যমে হামলা চালাল। ছাত্রাবাসগুলোতে ঢুকে পড়ল শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য। হাতে স্টেনগান আর রাইফেল। ঘরে ঘরে ঢুকে ঢুকে হামলা চালাল। বিছানাপত্তর ছত্রখান ক'রে ছাত্রদের কুকুরের মতো পিটাতে লাগল। আত্মরক্ষার জন্য যে-যেখানে পারল ছুটল। আর্তচীৎকারে ভরে উঠল ছাত্রাবাসগুলো। মিলিটারির হাতে মেয়েরাও লাঞ্ছিত হ'লো। সলিমুল্লাহ্ হলে অত্যাচার হ'লো সব থেকে বেশি। মিলিটারিরা হলের ভিতর ঢুকে পড়তেই ছাত্র আর হোস্টেলের কর্মচারিরা ছুটল পশ্চিম দিকের গেটের কাছে। হঠাৎ সেদিকের দরজা ভেঙে ঢুকল আর-এক দল মিলিটারি। বহু ছাত্র-ছাত্রী আর হলের কর্মচারিকে ধরে নিয়ে গেল ওরা। পরে জেনেছিলাম ৮০ জন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সলিমুল্লাহ্ হলে যে সেকরেটারিয়েট বসেছিল সেখানকার কাগজপত্র নিয়ে নিল ওরা, আসবাবপত্র ভেঙে-চুরে ফেলল।

ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে মেডিকেল কলেজে ঢুকে পড়লাম। এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হ'চ্ছে হাসপাতালের ওয়ার্ড। পিছনে অনেকটা দূরে দেখলাম দশ-বারোজন মিলিটারি ছুটে আসছে—হিংস্র হ'য়ে উঠেছে ওরা। ছাত্রাবাসের গেটের কাছে ঢুকে পড়েছে। থমকে দাঁড়ালাম। রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে ভেঙে তছনচ ক'রে ফেলছে শহীদ-মিনার। আমরা নিজের হাতে কাল গড়ে তুলেছিলাম যে শহীদ-মিনার মাটিতে ছিটকে ছিটকে পড়ছে তার প্রতিটি ইট। শহীদ-মিনারের ওপর প্রতিটি রাইফেলের ঘা এসে পাঁজরে লাগছে। ভিতরটা যেন রক্তাক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ফুলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ পরে যা লিখেছিলেন সেই মুহূর্তে মন যেন সেই কথাটিই বলতে চাইছিল :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাঁদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

ওরা এবারে ছাত্রাবাসের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ছুটলাম।

পরের দিন সংবাদপত্রের খবর: বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। হলগুলো থেকে ছাত্রদের জোর ক'রে বের ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে। ৫ মার্চ শহীদ-দিবস—সর্বদলীয় সংগ্রাম-পরিষদের ডাক। সংগ্রাম-পরিষদ ৭৫ ঘণ্টার চরম পত্র দিয়েছে সরকারকে—তার মধ্যে দাবি মেনে না নিলে প্রশাসন বিকল ক'রে দেওয়া হবে।

গত দুই-তিন দিনে ৩৯ জন শহীদ হ'য়েছেন বলে সংগ্রাম-পরিষদ থেকে দাবি করা হ'লো। ৯-দফার ভিত্তিতে তদন্ত-কমিশন গঠনের দাবিও জানিয়েছেন নেতারা।

প্রভাতী খবরের কাগজে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের 'চরমপত্র' দেখে লীগ-সরকার ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হিংস্র হ'য়ে উঠল। সংগ্রাম-পরিষদের প্রধান নয় জন নেতার উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হ'লো। খবরটা আগেই জেনে গেছিল ওলি আহাদ ভাই। তোয়াহাভাইকে একজন পুলিশ কর্মচারি এসে জানিয়েছিল। নেতারা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' চলে গেলেন।

মিলিটারি বাড়ি-বাড়ি তল্লাস ক'রে রোজ শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র আর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার স্নুরু ক'রল। বাড়ির মেয়েরাও লাঞ্ছিত হ'লো।

৫ মার্চ 'শহীদ-দিবস' পালিত হ'লো বটে কিন্তু আগের মতো সাড়া মিলল না এবারে। আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা ওলি আহাদ ও মোহম্মদ তোয়াহা ২৭ তারিখে গ্রেপ্তার হ'লেন। অতর্কিতে হানা দিয়ে ঢাকাব একটা পুরানো বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হ'লো আরও ৬ জনকে। একই সঙ্গে ছিলেন ওঁরা। ছাত্রা-বাসগুলোও খালি। মিলিটারির কড়া প্রহরায় ঢাকায় ছাত্ররাও আর একত্রিত হ'তে পারছে না। তাই ঢাকা শহরের আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল।

এই কয় দিন আন্দোলনটা সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা শহরে। এবাব সেই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লাগল গ্রামে—গঞ্জে। জেলা শহরগুলো ততদিনে তেতে উঠেছে। সারা প্রদেশ জুড়ে চলেছে আন্দোলন, বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা। সে আন্দোলন রোধে কার সাধ্য। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—এই দাবি যে প্রতিটি বাঙালীর রক্তে প্রবাহিত হ'চ্ছে। অবোধ শিশুবা পর্যন্ত খেলতে গিয়ে স্লোগান তুলছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

সাড়ে চার কোটি জনতার মহা গর্জনে ধ্বসে গেল মুসলিমলীগ সরকারের সাধের প্রাসাদের ভিৎ। '৫৪ সালের নির্বাচনে তাদের চিহ্নটুকু পর্যন্ত রইল না। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ পেয়েছে মাত্র ৯টি আসন। বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত নুরুল আমিন নিজের জেলায় নিজেরই এলাকায় খালেক নওয়াজ নামে একজন সাধারণ ছাত্র-নেতার কাছে হেরে গেলেন শোচনীয় ভাবে।

কলিংবেল বাজানোর দু'-এক সেকেনডের মধ্যেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক ভদ্রমহিলা। পরনে তাঁর হালকা রঙের সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি। শরতের মতো শান্তশ্রী এবং স্নিগ্ধতা তাঁর মুখে মাখানো। বড়ো বড়ো চোখ দুটি যেন অতল কালো দীঘি। আমাদের দিকে তাঁর জিজ্ঞাসু চোখ দুটি তুলে ধরতেই বললাম, 'পেপার থেকে এসেছি। মিসেস আহম্মদের সঙ্গে একটু দেখা ক'রতে চাই।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আসুন, ভিতরে এসে বসুন।'

আমি আর ভুলু একটা বড়ো সোফাতে বসলাম। ভদ্রমহিলা অদূরের একটা সোফাতে বসতে বসতে বললেন, 'আমিই মিসেস আহম্মদ, বলুন কী ক'রতে পারি আপনাদের জন্যে?'

বললাম, 'আপনার স্বামী কামালসাহেব সম্পর্কে কিছু খবর জানতে এসেছি। শুনেছি, হাজতে আপনার স্বামীর ওপর নৃশংস অত্যাচার করা হ'য়েছে, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছেন। সে সম্পর্কেই কিছু জানতে চাইছি।'

'এক মিনিট, আসছি।' বলে মিসেস আহম্মদ ভিতর-বাড়িতে চলে গেলেন।

পর্দা ঠেলে মিসেস আহম্মদ অন্দরে অন্তর্হিত হ'তেই সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আসবাব বেশি নেই। কিন্তু সামান্য আসবাবেই ঘরটা রমণীয় হ'য়ে উঠেছে। দেওয়ালে বাঁশের টবে ঝুলছে লিলিফুল। রবীন্দ্রনাথের ফটোও রয়েছে দেখে অবাকই লাগল। নেভির লোকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ! ঘরটা বেশ পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। বুঝলাম সব কিছুতেই গৃহ-কর্ত্রীর সযত্ন স্পর্শ রয়েছে।

ভুলু ক্যামেরায় ফিল্মটা ভরে নিচ্ছে। একটি ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে সোফার গা ঘেঁষে নীরবে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখে ত

দেখছে। ছেলেটির চোখ দুটো ভারি সুন্দর! কখন যে ঘরে ঢুকেছে দেখতে পাই নি। কিন্তু মুখটা বড়ো বিমর্ষ। শিশুসুলভ চাঞ্চল্য নেই ওই মুখে। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কী নাম তোমার?'

মিষ্টি ক'রে উত্তর দিল, 'নয়ন।'

'বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো! আব্বার নাম কী?'

নীরবে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, ভুলুর দিকে ঘোরালো একবাব চোখ দুটো। তারপর আলতো ক'রে বলল, 'জনাব কামাল উদ্দীন আহম্মদ।'

'কী পড়ো?'

'বাড়িতে পড়ি।'

'অ।-চ্ছা, তুমি তাহ'লে বাড়িতে পড়ো।' হেসে উঠলাম আমি।

এমন সময় পর্দা ঠেলে কামালসাহেবের স্ত্রী ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা চিঠি। সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'দেখুন, আপনাদের কাছে কিছু বললে তো কোনো ক্ষতি হবে না?'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ভদ্রমহিলা নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। তারপব ধীরে ধীরে বলতে সুরু ক'রলেন, 'ডিসেম্বরের ৯ তারিখে পুলিশ আর আই-বির লোক হঠাৎ বাড়ি এসে ওঁকে ধরে নিয়ে যায়। বিভ্রান্ত হ'য়ে আমার ভাইয়ের কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, আমার ভাই সুলতানউদ্দীনকেও পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। কারণ তখনও জানতে পারি নি, জানলাম পরে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ওঁকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। প্রথমে সিদ্ধেশ্বরী গোয়েন্দা-অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেছে। সেখান থেকে যে কোথায় সরিয়ে ফেলেছিল কয়েকদিন অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-স্থানের হদিশ পাই নি, পুলিশ আর আই-বির লোকেরা মুখে তালা এঁটে ছিল।'

এমন সময় ট্রেতে ক'রে একটি চাকর দুকাপ ধূমায়িত কফি আর

কিছু বিস্কুট নিয়ে এলো ছুটো প্লেটে। পিছনে পিছনে এলো বারো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে। পরনে একটা সুন্দর ছাপা শাড়ি। আন্দাজ ক'রলাম, কামালউদ্দীন সাহেবের মেয়ে। মায়ের মুখের ছাঁদ আছে অনেকটা। ধীর পায়ে মায়ের কাছটিতে গিয়ে সে বসল। সেনটার টেবিলটায় কাপ-প্লেট নামিয়ে রেখে ট্রে নিয়ে চলে গেল চাকরটি। মিসেস আহম্মদ আমাদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'নিন।' তারপর ফিরে গেলেন আগের প্রসঙ্গে। 'অনেক চেষ্টায় শেষে খোঁজ পেলাম! মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে রাখা হয়েছে ওঁকে। বহু ধরাধরি ক'রে দেখা ক'রবার অনুমতি মিলল। কিন্তু সেই দেখা না পাওয়াই ছিল বোধ হয় ভালো। কয়েকটা দিনের মধ্যে এ কী চেহারা হ'য়েছে! বলিষ্ঠ ঋজু চেহারার মানুষটিকে চেনাই যায় না। সারা শরীরে কালশিরে। চোখে কালি। চুল রুক্ষ। শরীরের জায়গায় জায়গায় দগদগে ঘায়ের দাগ। ওঁর অবস্থা দেখে কথা বলব কি, থরথর ক'রে কাঁপছিল আমার ঠোঁট। চোখ ফেটে জল আসছিল। ও এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'খুকী, তুমি যদি এ-সময় ভেঙে পড়ো তাহলে বাচ্চারা কী করবে? তোমাকে শক্ত হ'তে হবে। খোদার কাছে মোনাজাত কর যেন তাড়াতাড়ি মুক্তি পাই।' বলে গোপনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন এই চিঠিটা। তার পর ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'আমাদের ফার্মের ব্যারিস্টার সাহেবকে দেখিও।'

মিসেস আহম্মদ একটু থামলেন। এমন সময় ফ্রক-পরা বছর আট-নয়েকের একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে এসে মিসেস আহম্মদের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিসেস আহম্মদ ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছোট মেয়ে কণা।' তারপর শাড়ি-পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমার বড়ো মা-মণি রত্না। খুব ভালো রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারে। পড়াশুনায়ও খুব ভালো। নাইন-এ পড়ে। আমাদের তিন মেয়ে, দুই ছেলে। বড়ো ছেলে আর মেজ মেয়ে ওদের খালার বাড়ি গেছে।'

কামালউদ্দীন সাহেবের ছেলে-মেয়েরা সবাই দেখতে বেশ সুন্দর। মায়ের মতো চোখ, লাবণ্য-মাখা মুখ। কিন্তু সেই মুখে আনন্দ নেই। এক পোঁচ বিমর্ষ মাখানো। ওদের আব্বাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। শুনেছে, যাবজ্জীবন জেলও হ'তে পারে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিসেস আহম্মদের একটা ফটো নিল ভুলু।

মিসেস আহম্মদ আবার বললেন, 'হাজতে বসেও ওর মুখে খালি ছেলেমেয়েদের কথা। বার বার ক'রে ওদের কথা জিজ্ঞেস ক'রলেন, যত্ন নিতে বললেন, লেখাপড়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বললেন, ছেলেমেয়েদের মুখেও দিনরাত আব্বা ছাড়া আর কথা নেই। কী যে করি!'

মিসেস আহম্মদ আবার বললেন, 'ওর ওপর যে কী নৃশংস অত্যাচার করা হ'য়েছে, তার কিছুটা এই চিঠিটা থেকেই জানতে পারবেন। সে-সব কথা আমি মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারছি না, চিঠিটা পড়লেই সব জানতে পারবেন।' তারপর চিঠিটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'উঃ, কী অসহ্য অত্যাচার! আমরা কি কোনো সভ্য জগতে বাস ক'রছি! এই কি দেশ স্বাধীন হ'য়েছে! এই স্বাধীনতা কে চেয়েছিল?' বলতে বলতে তার চোখ দুটো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল।

হাতে নিয়ে দেখলাম চিঠিটা ইংরেজীতে লেখা। তাতে মূল ঘটনাগুলো সংক্ষেপে লেখা। ফাঁকটুকু সহজেই সঙ্গে সঙ্গে ভরাট ক'রে নিয়ে পড়তে সুরু ক'রলাম: "বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে প্রথমে আমাকে সিদ্ধেশ্বরীতে সিটি এস-বি অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে 'আই-বি'র ডি-এস. পি. এম, ইয়াসিন এবং ইন্সপেক্টর কে, আহম্মদ প্রায় সারারাত ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে, আমি নাকি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে পূর্বপাকিস্তানকে পাশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত আছি। জোর ক'রে আমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা ক'রল। ইন্সপেক্টর কে, আহম্মদ আমায় বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্ব-

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত আছ সকলের নাম লিখে স্টেটমেণ্ট ক'রে দিচ্ছি, সই ক'রে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমি এ-সবের কিছুই জানি না, আপনারা আমায় অযথা হয়রানি ক'রছেন।'

কাজ হাসিল হ'লো না দেখে ক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লো সে। ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দিলো আমায়। পিঠে রুল দিয়ে কয়েকটা ঘা দিল। পরদিন আমাকে মিলিটারির হাতে তুলে দিল। মিলিটারি-ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সুলতান এবং নৌবাহিনীর লেফটেনেন্ট শরীফ দিনের পর দিন আমাকে জেরা ক'রে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা ক'রলে। ওদের ১ ডিগ্রী থেকে ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত নির্যাতন চালালো আমার ওপর।

একদিন তো কানের কাছে এমন প্রচণ্ড চড় কষাল যে, এখনও কানে ভালো শুনতে পাই না। কয়েকটা নখে সুঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে কতবার, রুল দিয়ে মেরে মেরে আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আঙুল-গুলো আর নাড়াতে পারি না। এতেও ওদের নির্যাতন শেষ হ'লো না। আমাকে উলঙ্গ ক'রে গুহ্যদ্বারে ব্যাটন ঢুকিয়ে জোর করিয়ে হাঁটিয়েছে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব! কতো বার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি!

আর একদিন মাটিতে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে উপুর করে ফেলে রুল দিয়ে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দিল বরফের কতোগুলো টুকরো। তারপর চলল জিজ্ঞাসাবাদ: 'বল্, তোদের নেতা কে? মুজিবর রহমান? ইণ্ডিয়ায় কার সঙ্গে যোগসাজস আছে? ঢাকার ইণ্ডিয়ান হাইকমিশন অফিসে কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? কোথায় কোথায় তোদের ঘাঁটি আছে বল্।'

আমি জ্ঞান হারতে হারাতে শুধু বলতে পেরেছি, 'আমি এ-সবের কিছুই জানি না।'

দিনের পর দিন ওরা নিত্য নতুন নির্যাতন চালিয়েছে আমার

ওপর। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছুরি দিয়ে শরীরের স্থানে স্থানে কেচেছে। তারপর কাটা জায়গায় নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার যন্ত্রণাবিকৃত মুখ দেখে ওখানকার মিলিটারি অফিসাররা পৈশাচিক হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে টর্চার-চেম্বার।

• আর-একবার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে শরীর থেকে কাপড় খুলে নিল একজন সেপাই। তারপর আমার পুরুষাঙ্গ ধরে প্রবল ভাবে টানা হেঁচড়া ক'রতে লাগল। অণ্ডকোষ দুটি দুই হাতে রগড়ে পিষে দিতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার ক'রে উঠলাম। মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হ'য়ে গেল। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম, স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়ে রয়েছি। শরীরে কোনো কাপড় নেই। সারা শরীরে তখনো অসহ্য ব্যথায় টনটন ক'রছে।

ওই দিনই কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার আমায় স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। ঢ্যাঙ্গা একজন মিলিটারি অফিসার বললো, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ক'রছিলে। তোমাদের নেতা মুজিবর রহমান। আর আমরা যাদের কথা বলব তারাও তোমার সঙ্গে ছিল—এই স্বীকারোক্তি লিখে দিতে হবে। স্বীকারোক্তি লিখে দিলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। ভেবে দেখ। আর যদি স্টেটমেণ্ট না দাও, তোমার স্ত্রী আর মেয়েদের এনে তোমার সামনে উলঙ্গ ক'রে চাবুক দিয়ে শরীর কেচে কেচে লঙ্কা-নুন ছিটিয়ে দেব। তোমার রূপসী স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে ন্যাংটো ক'রে সাধারণ সৈন্য লেলিয়ে দেব তাকে ধর্ষণ করার জন্যে।'

অফিসারটির কথা শুনে অদূরে দাঁড়ানো সৈন্যটির চোখ দুটি লোভে জুলজুল ক'রে উঠল। জিভটা দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

এত অত্যাচারেও আমাকে দিয়ে যা করাতে পারে নি, এই একটি কথাতেই তা পারল। খুকী, আমার বাচ্চাদের নির্যাতনের

কথা ভেবে শিউরে উঠলাম। ওদের উপর বিন্দুমাত্র নির্যাতন আমি সইতে পারব না। কিছুতেই না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, ওদের কিছু ক'রবেন না, আমি স্টেটমেন্ট দেব। আপনারা যা বলবেন তাই লিখে দেব।'

১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ওরা আমাকে দিয়ে একটি দলিলে সই করিয়ে নিল। কয়েক সীট কাগজে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নিলো। দিনের পর দিন আমানুষিক নির্যাতনে আমার মাথা তখন শূন্য, হতচেতন অবস্থা। কী ক'রল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাধাও দিলাম না। সে শক্তিও ছিল না। তারপর কতকগুলো 'মিষ্টি কালোজাম' ও এক গ্লাস ওষুধ খেতে বলল, ওষুধটার স্বাদ অনেকটা 'রামের' মতো। তারপর আমার হাতে তুলে দিল কাগজ আর কলম। একজন একটা টাইপ-করা কাগজ দেখে দেখে ডিকটেশন দিচ্ছিলেন, আমাকে তা লিখে যেতে বলা হ'লো। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অনেকের, কয়েকজন সি. এস. পি অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীর নাম লিখতে বলল। পঞ্চাশ জনের মতো হবে বোধ হয়। তারপর একটা জবানবন্দী লিখতে বলল। নির্যাতনের ভয়ে তাও লিখে দিলাম।

তারপর থেকে আমার ওপর আর অত্যাচার করে নি। শুনেছি ওরা নাকি আমাকে রাজসাক্ষী ক'রবে। রাজসাক্ষী হ'লে ওরা আমায় ক্ষমা ক'রবে। অনেক কষ্টে কাগজ-কলম জোগাড় ক'রে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে এটি লিখতে হ'য়েছে। আরও অনেক কথা আছে, পরে বলব। ইতি—

কামালউদ্দীন আহম্মদ

লিখেছেন ফোরটিন ডিভিসন হেডকোয়ারটার থেকে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে বার বার শিউরে উঠছিলাম। বেদনায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম কয়েক মূহূর্ত।

মিসেস আহম্মদই নীরবতা ভাঙলেন। বললেন, 'একটু ভালো

ক'রে লিখবেন। যাতে উনি তাড়াতাড়ি মুক্তি পান। আপনারা বললে কিছু হ'তে পারে।' তাঁর কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ে।

আশ্বাস দিলাম, 'নিশ্চয়, এ তো আমাদের কর্তব্য।'

তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

প্রেস-ক্লাবে এসে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। সারাটা পথ কামালউদ্দীন সাহেবের চিঠিটার কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি। খোদ ঢাকা শহরে, সাধারণের চোখের অন্তরালে যে একজন বিশিষ্ট নাগরিকের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার চলতে পারে ভাবতেই পারি না। এ যে প্যাগানযুগের টর্চার চেম্বারের নির্যাতনকেও লজ্জা দেয়।

ভুলু বলল, 'আমি চলি, বিকেলে আবার সূর্য সেনের স্মৃতি-দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান আছে।'

ভুলুর কথায় সংবিত এলো। ওহ্ তাইতো। আজ ১২ জানুয়ারি। ১৯৩৪ সালের এমনি এক দিনে রাত দেড়টা-দুটোর সময় মাস্টারদা ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে ছিলেন জীবনের জয়গান।

চট্টলার বীর সন্তান, বাঙলার গৌরব সূর্য সেন। মহাশক্তিধর ব্রিটিশ-সরকারও যাঁর নামে ছিল আতঙ্কিত। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ফাঁসি হয়। কী ক'রে এতো অল্প বয়সে এতো বড়ো বিপ্লবীদল গড়লেন নয়াপাড়ার সেন-বাড়ির সেই কিশোর ছেলেটি! তাঁর মুখের সামান্য নির্দেশে হাসতে হাসতে জীবন বিলিয়ে দিতে পারত হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে। কী জাদু ছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে, কী সম্মোহন ছিল তাঁর দু'চোখে যেই-আহ্বানে নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত নির্মল লালা, জিতেন দাসগুপ্ত, মধু দত্ত, অর্ধেন্দু দস্তিদার, পুলিন ঘোষের মতো হীরের টুকরো ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন অনাহার অনিদ্রায় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে লড়তে লড়তে বুলেটের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছে জালালাবাদ পাহাড়ের ঢালে।

কোন্ জাহুতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্তের মতো শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে। যেদিন মাস্টারদা প্রীতিলতাকে 'ইউরোপীয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন, প্রীতিলতা নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিল। যাবার আগে মাস্টারদার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলেছিল, 'আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যেন ঠিকমতো কাজ শেষ ক'রতে পারি, কাজ শেষ করে মৃত্যুবরণ ক'রতে পারি।'

পুরুষের বেশে সৈনিকের পোশাকে এগিয়ে গেল প্রীতিলতা। দলনেত্রীর নির্দেশে মহেন্দ্র চৌধুরী আর ছোট্ট ছেলে সুশীল দে টাইম বোমা ছুড়ে দিল 'ক্লাব-ঘরে'। মুহূর্তে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেল। আর্ত চীৎকার উঠল। সাহেবরা দৌড়াদৌড়ি ক'রছে। বিপ্লবীদের মুহুর্মুহু বুলেটে লুটিয়ে পড়ছে তারা মাটিতে। দিনের পর দিন এইসব সাদা চামরার দল চট্টগ্রামের নিরীহ মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ক'রেছে। আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত তাদের ক'রতে হ'লো। কোনো সাধারণ নিরীহ ইংরেজ ভদ্রলোকের ওপরে বিপ্লবীদের আক্রোশ নেই, বিপ্লবীরা তাদের কোনো অনিষ্ট ক'রতেনও না। কিন্তু যারা এ-দেশবাসীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের ক্ষমা নেই। অমোঘ নিয়তির মতো তাদের ওপর মৃত্যুর কঠিন দণ্ড নেমে আসবেই। দোর্দণ্ড ডাগলাস-বার্জকে ইংরেজ-সরকার বিপ্লবীদের বুলেট থেকে রক্ষা ক'রতে পারে নি।

প্রীতিলতার দুঃসাহসী সঙ্গীরা সেই আরব্ধ কাজ শেষে সবাই ফিরে গেল, গেল না শুধু দল-নেত্রী প্রীতিলতা। 'সায়নাইড' খেয়ে পড়ে রইল ইউরোপীয়ান ক্লাবের অদূরে। সূর্য সেনের মানস-কন্যা প্রীতিলতা শেষবারের মতো মাস্টারদাকে প্রণাম জানিয়ে গেল। ভগবানের নামটি পর্যন্ত নিল না। মাস্টারদার চেয়ে বড়ো দেবতার সাক্ষাৎ যে সে আর পায় নি।

মাস্টারদার এমনই সম্মোহন শক্তি ছিল যে, দাগী চোর গগন ঘোষ

পর্যন্ত মাস্টারদার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে নি। নির্যাতন আর লাঞ্ছনা তুচ্ছ ক'রে বুলেটবিদ্ধ বীরেনকে ঠাঁই দিলো নিজের ঘরে। বীরেনকে বাঁচাতে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেছে গগন ঘোষের পরিবারের সকলে। বীরেন বাঁচে নি। কিন্তু গগনের সেবাকার্য কি ভোলা যায়? সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদ দত্ত আরো অনেক দেশ-প্রেমিকের পুণ্য পদরেণুতে পবিত্র হ'য়ে রয়েছে গগনের পর্ণ কুটির।

বাঙলাদেশ যেমন গগন ঘোষের মতো লোককেও জন্ম দিয়েছে তেমনি জন্ম দিয়েছে মীরজাফরের মতো কয়েকটি কুলাঙ্গারের। এ-দেশে যদি না জন্মাত মীরজাফর, না জন্মাত নেত্র সেন তাহ'লে এ-দেশের এমন হাল হয় না।

ধলঘাটের সংঘর্ষের পর 'গৈরলা' বিশ্বাসদের বাড়ি আত্ম-গোপন ক'রে রইলেন সূর্য সেন ও তাঁর দল। জমিদার নেত্র সেন টাকার লোভে পুলিশকে জানালেন সে-কথা। পুলিশ তবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না। চট্টলার এই সিংহকে সামনা সামনি লড়াই ক'রে ধরতে পারবে এমন আস্থা তাদের মনে নেই। তাই পুলিশের পরামর্শ মতো নেত্র সেন খাবাবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে নিস্তেজ ক'রে ফেলল সকলকে। নেত্র সেনের ভাই দাদাকে রাতের অন্ধকারে সিগন্যাল দেখাতে দেখে মাস্টারদাকে জানাল সে-কথা। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশরা ঘেরাও ক'রে ফেলেছে বিশ্বাসদের বাড়ি। মাস্টারদা অমিত বিক্রমে গুলি ছুড়তে লাগলেন পুলিশদের দিকে। সকলেই নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধরা পড়লেন শুধু মাস্টারদা, সেই সঙ্গে ব্রজেন সেন। দিনটা ছিল ১৯৩৩ সালের ২ ফেবরুয়ারি। ইতিহাসে রচিত হ'লো আর-একটি কলঙ্কের দিন। নয়াপাড়ার সূর্য সেনের ফাঁসিতে সারা দেশ সেদিন কেঁদেছিল, আজও কাঁদে। সূর্য সেন সর্ব কালের সর্ব দেশের দেশ-প্রেমিকদের প্রেরণা।

দেশ আজ স্বাধীন। নেতাদের চক্রান্তে এক বাঙলা কেটে

দুখানা করা হ'য়েছে। সূর্য সেন যে সকলের প্রিয় মাস্টারদা। বড়ো ভালোবেসেছিলেন তিনি দেশকে। অগণিত ছেলে-মেয়ে দেশকে ভালোবাসার দীক্ষা যে তাঁরই কাছে পেয়েছে। জানি না, দেশ আজ কী ক'রে ভুলে যাচ্ছে সূর্য সেনকে। সূর্য সেনের মতো ছেলে পেলে পৃথিবীর যে-কোনো দেশ গৌরব বোধ ক'রত—তাঁর জন্মভূমি হ'য়ে উঠত পবিত্র তীর্থভূমি। দুর্ভাগ্য এদেশের, লজ্জা পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙালির যে, আজও আমরা সূর্যসেনের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি ক'রতে পারি নি। এমন কি তাঁর বাস্তুভিটাটা পর্যন্ত সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রতে পারে নি দেশের সরকার? সূর্য সেন হিন্দু তাই কি? কিন্তু সে তো সূর্য সেনের সত্যিকার পরিচয় নয়। সূর্য সেন বাঙালী। সূর্য সেন দেশ-প্রেমিক। কতো মুসলমান মাও যে সূর্য সেন ও তাঁর দলের ছেলেদের দিনের পব দিন সযত্নে কাছে বসিয়ে খাইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বরিশালের মনোরমা বসু কিছুদিন আগে সূর্য সেনের জন্মভূমি নয়াপাড়া গিয়েছিলেন। জীবন-সায়াহ্নে মহান পুরুষ সূর্য সেনের পবিত্র জন্মভূমি দেখে দু'চোখ সার্থক কবার বাসনা অনেক-দিন থেকেই আকুলি বিকুলি ক'রছিল তাঁর মনে। মনোরমা বসু বরিশালে ছেলে বুড়ো সকলের 'মাসিমা'। নিজে তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। ছিলেন কংগ্রেসের নেত্রী। কিন্তু 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' চারণের মুখে ক্ষুদিরামের এই গান শুনে কিশোরী মনোরমার মনে জেগেছিল আশ্চর্য উন্মাদনা। বাঙলাদেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, দেশবাসীর ওপর ইংরেজের অত্যাচারের কথা শুনতে শুনতে তাঁর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠত। সংসারে মন টেকাতে পারলেন না তিনি। স্বামীর হাতে ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। সভা করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হ'লেন। মুক্তির দিন-কয়েক আগে তাঁকে নিয়ে আসা হ'লো বরিশাল জেলে। মুক্তির আগের দিন শুনতে পেলেন, একজন বিপ্লবী যুবকের আজ ফাঁসি হবে,

নাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ফাঁসি হবে ভোর পাঁচটায়। সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলেন তিনি হাজতের গরাদ ধরে। অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে। এমন সময় জেলের রাজবন্দী আর সাধারণ কয়েদীদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে জেলখানাটা কেঁপে উঠল। ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে মনোরঞ্জন এগিয়ে যাচ্ছে সেলের সামনে দিয়ে। সেলের ভিতর থেকে সকলে সেই বীর যুবককে এক পলক দেখার জন্যে মাথা খুঁড়ছে লোহার গারদে। ফাঁসি হবার পূর্ব-মুহূর্তে মনোরঞ্জনের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো : বিদায় দেশের ভাইবোনেরা, বিদায় দেশমাতা। তোমার সন্তানকে বিদায় দাও। বন্দেমাতরম্।

মাসীমা বলেন, আজও কানে বাজে মনোরঞ্জনের সেই কথা। সেই থেকে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম। বাড়ি ফিবে দু-তিনদিন কেবল কেঁদেছি। বার বার হৃদয় মথিত ক'রে গুমরে গুমরে উঠেছে মনোরঞ্জনের শেষ কথা ক'টি।

'মনোরঞ্জনকে দেখেছি, কিন্তু বিপ্লবীদের প্রাণের মাস্টারদাকে দেখি নি। মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়েই আমি তাঁর পুণ্যাত্মার স্পর্শ পাই। আজ তাঁর বাস্তুভিটা যে-মাটি যে-ঘাস তাঁকে বক্ষে ধারণ ক'রে ধন্য হ'য়েছে তা দেখে ধন্য হ'তে চাই।' নয়াপড়া যাবার সময় পথে মাসিমা কথাটা বললেন।

চট্টগ্রাম শহর থেকে নয়াপাড়াব দূরত্ব মাত্র বারো মাইল। ঘুঘু-ডাকা ছায়া-ঢাকা গ্রাম। আমরা যখন গিয়েছিলাম সময়টা ছিল ডিসেম্বরের সকাল। মনোরমা বসুর সঙ্গে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সকাল দশটা। শীতের চমৎকার রোদ ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসে, গাছের পাতায় পাতায়, পুকুরের জলে। ঘাসের বুক থেকে এখনো কুয়াসা মিলিয়ে যায় নি। মনোরমা বসুর সঙ্গে আমরা কয়েকজন সাংবাদিকও গেছি মাস্টারদার পদরেণু-ধন্য সেই তীর্থভূমি দর্শন ক'রতে। বরিশাল জেলা কৃষক-সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফখরুল সাহেবও সঙ্গে র'য়েছেন।

এক সঙ্গে এতগুলো শহুরে লোক এগাঁয়ের বাসিন্দারা বোধ হয় কখনো দেখে নি, বাড়ির বউ-ঝিরাও বেরিয়ে এসেছে আমাদের দেখতে। গাঁয়ের কয়েকজনের কাছে আমাদের অভিলাষ ব্যক্ত ক'রতেই, তারা সমাদর ক'রে মাস্টারদার বাস্তুভিটা দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের।

মন এক অভাবিত আনন্দে ভরে উঠছে। আজ দেখতে পাব মাস্টারদা কোন্ ঘরে থাকতেন, কোন্ ঘরে কর্মীদের সঙ্গে বসে এ্যাকসনের প্ল্যান ক'রতেন, কোন্ জায়গায় বসে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম, তাতে সকলে ক্ষোভে, দুঃখে ম্রিয়মান হ'য়ে গেলাম। বাড়ির ধারেই একটি পুকুর। পুকুরের জলে পানা ভর্তি। শাপলাও রয়েছে অনেক। পুকুরের চার পাড় ঘন-ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য। বাড়িতে ঢুকবার পথটি পর্যন্ত বড়ো বড়ো ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে। মাস্টাবদা, তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা যে-ঘরে থাকতেন সেই-সব ঘরের চিহ্নমাত্র নেই আজ। সারা বাড়িতে ছোট্ট একটা দোচালা ঘর দাঁড়িয়ে শুধু। যে-ঘরে বসে মাস্টারদা কর্মীদের সঙ্গে অ্যাকসনের প্ল্যান ক'বতেন তা আজ গোরুর আস্তানায় পরিণত হ'য়েছে। ভিটাগুলি খালি। ভিটায়, সারাবাড়িতে, বেগুন ধনে লঙ্কার চারাগাছ। একপাশে একটা বড়ো বকুলগাছ।

মাস্টারদার বাস্তুভিটা দেখাশুনা ক'রছে নয়াগ্রামের আব্দুল মজিদ। সূর্যবাবুর ছোটোভাই কমল সেন ওই বিষয়-সম্পত্তি তাঁকে দেখাশুনার ভার দিয়ে গেছেন। কমলবাবু বর্তমানে কলকাতাতেই আছেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে কয়েকজন স্বার্থান্বেষী লোক সূর্যবাবুর সম্পত্তি গ্রাস ক'রবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। একদিন দেখব সেখানে অন্য কারুর ঘর উঠেছে। মাস্টারদার বাস্তুভিটার চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই।

আমাদের সঙ্গে অনেক লোক গিয়ে জমায়েত হ'য়েছে সেই পবিত্র ভূমিতে। প্রায় সকলেই কৃষক। অতিকষ্টে দিন গুজরান করে। নয়াপাড়ার প্রতিটি বাসিন্দা দারিদ্র জর্জরিত হ'য়েও কিন্তু আজও

ভুলতে পারেন নি তাঁদের প্রাণের সূর্যবাবুকে। তাঁদের গ্রামে দেখবার মতো কিছুই নেই, কিন্তু সূর্যবাবুর ভিটা আছে, এর চেয়ে বড়ো গর্বের বিষয় কী আর হ'তে পারে। বৃদ্ধ আলী হোসেন আমাদের কাছে আবেগভরা গলায় বললেন, 'ইচ্ছে করে সূর্যবাবুর স্মৃতির মিনার সোনা দিয়ে মুড়ে দিই। কিন্তু বড়ো গরিব আমরা, ইটের মিনার তোলবার ক্ষমতাটুকুও নেই। এ দুঃখ রাখার ঠাঁই নেই।' বলতে বলতে বৃদ্ধের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো।

বৃদ্ধের কথায় মাসিমা বললেন, 'আপনারা স্মৃতির মিনার গড়তে পারেন নি, কিন্তু হৃদয়েব মিনারে আজও সূর্যবাবুকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এটাই বড়ো সান্ত্বনা। আমি আজ আপনাদের মধ্যে সেই মহানায়ককে দেখতে পাচ্ছি। আপনাদেব ইচ্ছা পূরণ হবেই। সূর্যবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা সারা দেশের লোক ক'রবে। আপনাদের নয়াপাড়া তীর্থভূমি হবে, সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষ দেখতে আসবেন এই নয়াপাড়া।'

মাসিমার কথা শুনে সকলে অভিভূত হ'য়ে গেল। স্কুলের ছাত্র শফিকও এসেছে। মেট্রিক দিয়েছে এবার। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বইটি জোগাড় ক'রে পড়েছে সে। অগ্নিপুরুষ মাস্টারদার কথায় ওরও দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

সূর্যবাবুর স্মৃতিরক্ষার দাবি উঠেছে সাবা দেশে। ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন সূর্য সেনের স্মৃতিরক্ষার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নিয়েছে। আজ সারা পূর্ববাঙলায় মাস্টারদার স্মৃতি-দিবস পালন করা হয়। আমাদের অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত আজ আমরা করছি এটাই সান্ত্বনা। পূর্ববাঙলার জাগ্রত ছাত্র-সমাজও সূর্য সেনের স্মৃতিরক্ষার দাবি জানিয়েছে। নয়াপাড়া একদিন বাঙালীর তীর্থভূমি হবে—তারই পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আজ।

পিছনে কার ডাক শুনে হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়লো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, আনোয়ার। কী বলেছে ভালো শুনতে পাই নি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই আতোয়ার আবার বলল, 'বলছিলাম কা'র ধ্যান করছিস ?'

ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির ঝিলিক তুলে বললাম, 'তোদের মতো ভাবনার সঙ্গিনী আর জুটল কই ? বোস। ভাল কথা, শুনলাম আলো নাকি এ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমিসট্রেস হয়েছে ?'

চেয়ার টেনে বসতে বসতে আতোয়ার বলল, 'হ্যাঁ, দিন-সাতেক আগে একটা চিঠি পেয়েছি ওর, তাইতো লিখেছে।'

'কুমিল্লার সেই আগের স্কুলেই আছে ?'

'হ্যাঁ।'

একটু নীরব থেকে বললাম, 'এবারে বিয়েটা সেরে ফেল। তিনকুলে তো তোর কেউ নেই। আর আলো তো তোর অপেক্ষায় জীবনটাই কাটিয়ে দিতে চলেছে।'

সিগারেটে টান দিতে দিতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল আতোয়ার। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপব ধীরে ধীরে বলল, 'আমার চাল নেই চুলো নেই, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনেব সঙ্গে ওকে আর জড়িয়ে কষ্ট দিতে চাই নে।'

'দ্যাখ, এটা কোনো কাজের কথা নয়। তুই ভালো ক'রেই জানিস আলো তোকে ছাড়া কাউকেই বিয়ে ক'রবে না। স্যাড্! এমন ভালোবাসাও তুই গ্রহণ ক'রতে পারছিস না। জীবনটা কি কৃষক আর শ্রমিকদের নিয়েই কাটিয়ে দিবি।'

আতোয়ার হেসে বলল, 'তাই তো দিতে হবে দেখছি, উপায় কী ? ছোটোবেলায় শুনতাম, স্বাধীন হ'লে দেশে আর কোনো অনটন থাকবে না। ব্রিটিশদের তাড়ালে বাঙলাদেশের শ্রমিক আর কৃষকদের কোনো অভাব থাকবে না। সর্বহারার দল অন্তত কাজ পাবে। দুবেলা দুটো মোটা ভাত, আর বছরে কয়েকটা মোটা কাপড়ের অভাব হবে না দেশবাসীর সেদিন। কিন্তু সে আশা কল্পনাই

থেকে গেছে। আয়ুব পূর্ববাঙলাকে দিন দিন পশ্চিমপাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত ক'রতে চলেছে। দেশের সমস্ত সম্পদ জমছে গিয়ে গোটা-কুড়ি পরিবারের হাতে। ওদের গ্রাস থেকে শ্রমিক আর চাষীদের যতটুকু পারি রক্ষা করাই আমার ব্রত। একদিন ওরাই দেশের চাকা ঘুরিয়ে দেবে। সে আশায়ই রয়েছি।'

'খেয়ে আসিস নি নিশ্চয়ই?'

আতোয়ার নিঃশব্দে হাসল। সে হাসির অর্থ, ওই কাজটি বছরে কয়দিনই-বা ঠিকমতো হয়। আলো প্রতি চিঠিতেই ওই ব্যাপারে সাবধান করে। বলে, আব কিছু না পার অন্তত সময়মতো খাওয়া-দাওয়া ক'রে তো আমায় একটু শান্তি দিতে পারো। আমি তোমার কাছ থেকে কি এইটুকুও আসা ক'রতে পারি না।

'একটু বোস, খাবাবের কথা বলে আসছি। আমিও বাড়ি ফিরব না এখন। মাকে একটা ফোন ক'রে আসছি।' বলে নিচে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আতোয়ারের কথাই ভাবছিলাম। অদ্ভুত ছেলে এই আতোয়ার। পলিটিক্যাল সায়ান্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম এ পাস ক'রেছে। লেকচারাবের ডাক এসেছিল জগন্নাথ কলেজ আর ঢাকা কলেজ থেকে, কিন্তু চাকুরি নেয় নি সে। শ্রমিক-ইউনিয়নের নেতা হ'য়ে বসেছে। জাহাজী ইউনিয়নের সেকরেটারি। তাই নিয়েই দিনরাত মেতে আছে। বেশভূষাও পালটায় নি। আগের মতোই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে ফোন ক'রে ওপরে এলাম আবার।

আতোয়ার কী একটা লিখে চলেছে খস খস ক'রে। কাছে গিয়ে দেখি, জাহাজী ইউনিটের ধর্মঘটের আলটিমেটাম। বসতেই বলল, 'কাল রিপোর্ট ক'রে দিস।'

'একবার তো জাহাজ সব অচল ক'রে দিয়েছিলি। আবার ধর্মঘটে নামছিস?'

'উপায় নেই। এটা দেবার জন্যেই তোর বাসায় গিয়েছিলুম।

মাসিমা বললেন, সকালেই বেরিয়েছিস। অফিসে গিয়ে খবর পেলাম প্রেসক্লাবে আছিস। অত সকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলি ?'

'কামালউদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের বাসায়।'

'কোন্ কামালউদ্দীন ? আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁকে জড়ানো হয়েছে ?'

নীরবে মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম। তারপর বললাম, 'তুই আসার আগে তাঁর কথাই ভাবছিলাম। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁর ওপর যে কী নৃশংস অত্যাচার চালানো হ'য়েছে ভাবা যায় না। এই স্বাধীনতার জন্যই কি সূর্য সেন ক্ষুদিরাম প্রাণ বলি দিয়েছিল ?'

আতোয়ার বললে, 'স্বাধীনতা তো আমরা পাই নি। কায়েমী-শাসক আর শোষকের হাত বদল হ'য়েছে মাত্র। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সত্যিকারের শাসন-ক্ষমতা গণ-প্রতিনিধিদের কাছে একবারও আসে নি। নাজিমউদ্দীন, গোলাম মোহম্মদ, ইস্কান্দার মির্জার দলই তো গদি দখল ক'রে রেখেছে। আয়ুব তো একেবারে অনড় হ'য়ে বুকের উপর চেপে বসেছে। 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' ছাড়া পশ্চিমপাকিস্তানীদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। তুই নিজেই জানিস পূর্ববাঙলার অনেকেই আজ এ-পথে ভাবছে। জানি না, কামালউদ্দীন সাহেব স্বাধীন পূর্ববাঙলার জন্যে চেষ্টা ক'রছিলেন কি না। ক'রলে তো তাকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম জানানো উচিত। আমি তো এর মধ্যে দেশদ্রোহিতা দেখতে পাই না। এও এক স্বাধীনতার লড়াই। কায়েমী-শাসকরা দেশ-প্রেমিকদের কবেই-বা ফুলের মালা দিয়েছে।'

বয় খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতে ভাবছিলাম, আতোয়ারের যুক্তি তো আমারও যুক্তি। নিজেই জানি, পূর্ববাঙলার অনেক জায়গায় আজ 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র জন্য বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছে।

কয়েক মাস আগে অনেকেরই রেডিও সেটে ধরা পড়েছিল একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর :

স্বাধীন পূর্ববাঙলা রেডিও থেকে বলছি।

জাগো, পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ জাগো। হাতিয়াব তুলে নাও। শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় এসেছে। আমরা পাকিস্তানী নই, আমরা বাঙালী। বাঙলা আমাদের দেশ, বাঙলা আমাদের ভাষা। পদ্মা-মেঘনার দেশ পূর্ববাঙলাকে কায়েমীশাসকরা উপনিবেশ-এ পরিণত ক'রেছে। আমাদেরই অর্থে করাচি, লাহোর পিণ্ডিতে গড়ে উঠেছে আকাশচুম্বী ইমারত। গড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো কলকারখানা। করাচি-পিণ্ডির শাসকরা আমাদের ভালো চায় না। ওরা চায় শুধু শোষণ ক'রতে। আমাদেরই পয়সা লুটে নিয়ে ওরা আমাদের ভিখারী ক'রছে। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় মুসলিমলীগের উর্ধ্বতম নেতারা জানতো পূর্ববাঙলা দু'দিন আগে হোক পরে হোক পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে। তাই যতটা পারা যায় পূর্ববাঙলাকে শোষণ ক'রে পশ্চিমপাকিস্তানের উন্নতি ক'রতে হবে। আমরা ওদের আব শোষণ ক'বতে দেবো না। আমরা 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গড়ছি।....'

ট্র্যান্সমিটারটা খুব শক্তিশালী নয়, তাই খুব ক্ষীণ ছিল সেই বেতারবার্তা। হঠাৎ-হঠাৎ অনেকেরই বেতারযন্ত্রে ধরা পড়েছে সে-কথা। পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি জনতার কানে পৌঁছয়-নি তা। তাই গুপ্ত-সমিতি থেকে সাড়া দেশ জুড়ে লিফলেট ছড়ানো হ'য়েছিল প্রচুর।

'স্বাধীন পূর্ববাঙলার' বেতারস্বর শুনে আয়ুবের প্রশাসন যন্ত্রের টনক নড়লো। ক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লো তারা। সারা পূর্বপাকিস্তান আই-বি আর পুলিশের লোক চষে ফেলল বিদ্রোহীদের খোঁজে। গ্রেপ্তার হ'লো অনেকে। (পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেটের জঙ্গল থেকে গুপ্ত ঘাঁটি হানা দিয়ে ট্র্যান্সমিটার উদ্ধার ক'রল পুলিশ।

কিছু পিস্তলও পেয়েছে। খবরের কাগজ থেকে সত্যতা জানতে চাওয়া হ'য়েছিল, পুলিশ এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজী হয় নি।

কয়েক বছর আগে আমিও দু'একটা গোপন মীটিংয়ে যোগ দিয়েছিলাম। গুপ্ত দলে প্রথম আমায় ভিড়িয়েছিল শাহাবউদ্দীন। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরের কোনো একদিন হবে। মধুর ক্যান্টিনে বসেছিল শাহাবউদ্দীন। আমি ঢুকতেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বোস, চা খা।'

চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল এক মনে।

চা খাওয়া শেষ হ'তেই হঠাৎ বলে উঠল, 'চল, রমনাগার্ডেন থেকে ঘুরে আসি। নিরিবিলিতে তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

রমনা গার্ডেনের চন্দ্রাকৃতি লেকের ধারে একটা নির্জন গাছের নিচে বসে শাহাবউদ্দীন প্রথম আমায় শুনিয়েছিল, 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র পরিকল্পনা। শাহাবউদ্দীন জানে, দলে যাই বা না-যাই, অন্তত বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রব না। তাই খুলে বলেছিল সেদিন অনেক কথা।

ওই ঘটনার মাস-দেড়েক বাদে শাহাবউদ্দীন হঠাৎ একদিন এসে বলল, কাল পিকনিকে যাচ্ছি, তোকেও যেতে হবে। তৈরী থাকিস। আতোয়ারও যাবে। কখন কোথায় যেতে হবে রাতে আতোয়ার তোকে জানিয়ে দেবে।'

পরদিন নারায়ণগঞ্জের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নৌকাটি দেখতে পেলাম। নৌকোর ওপর আতোয়ার দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই বলল, 'এসেছিস তাহ'লে?'

নৌকোয় উঠে ছৈয়ের নিচে গিয়ে দেখলাম, আরও অনেকে রয়েছে—হানিফ খান, জাকারিয়া, লায়লা, দীপ্তি, আক্তার, প্রজেশ আরও কয়েকজন। সকলেই পরিচিত, বন্ধুবান্ধব। আরো আশ্চর্য হ'লাম দেখে যে, রান্নাবান্না ক'রেই নেওয়া হ'চ্ছে। এ কেমন-তরো পিকনিক? খাওয়ার আয়োজনও বেশি নয়, বিরিয়ানি আর মাংস।

আতোয়ারের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরতেই চোখ ঠারল সে। সে ইঙ্গিতের অর্থ, রোসো সময়মতো সবই জানতে পারবে।

শাহাবউদ্দীন হন্তদন্ত হ'য়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে নৌকোয় উঠল। আতোয়ারের দিকে চেয়ে বলল, টিকটিকি লেগেছিল পিছনে। অনেক কৌশলে এড়িয়ে এসেছি। ৫নং কেবিন থেকে জুটেছিল। বলল, কী শাহাবউদ্দীন সাহেব, পিকনিকে নাকি যাচ্ছেন শুনলাম? আমাদেব বাদ দিয়েই যাচ্ছেন তাহ'লে?'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলেছে?'

রহস্যভরা হাসি হেসে বলল, 'ও কি আর আমাদের জানতে বাকি থাকে সাহেব? আপনাদেব খবর রাখাই তো আমাদের কাজ।'

আমতা আমতা ক'রে বললাম, 'ও হ্যাঁ, বন্ধুবান্ধবরা মিলে ধরেছিল। কিন্তু সে ডেট তো ক্যানসেল হ'য়ে গেছে, সামনের রববার হবে।'

'ও!' বলে চুপ ক'বে গেলেন আই-বি ভদ্রলোক।

তারপর ঢাকা যাবার নাম করে ঢাকার বাসে উঠে পড়লাম। পঞ্চবটি এসেই ফিরতি বাসে আবার চলে এসেছি। শীগ্‌গীরই নৌকো খোল্।'

লক্ষ্যার বুকে পাল তুলে এগিয়ে চলেছে নৌকো। তবতর জল কেটে চলেছে। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চ। মৃদু ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠছে নৌকোটা। সোনাকান্দা ছাড়িয়ে এক জায়গায় নৌকো বাঁধা হ'লো, ভুলে পাতা আনা হয় নি। প্রজেশ গিয়ে কিছু কলাপাতা নিয়ে এলো। আরও অনেকটা এগিয়ে শেষে নৌকো লাগানো হ'লো মুন্সীগঞ্জের অদূরে, একটা চরে। চর জুড়ে ঢেউ-খেলানো ধানের শিষের সমারোহ। বাতাসে দোল দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেখানে। নৌকোয় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সকলে নেমে গেলাম চরে। একটা স্থান বেছে নিয়ে বসলাম গোল হ'য়ে।

শাহাবউদ্দীন সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে

বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এখানে যাঁরা এসেছে সকলে বিশ্বাসী। আমরা আজ এমন একটা বিষয় আলোচনা ক'রব যা প্রকাশ পেলে কম ক'রেও চোদ্দ বছরের হাজত বাস নির্ঘাৎ। যদি কেউ ভয় পেয়ে থাক, নৌকোয় গিয়ে বসতে পার।'

বাতাসে চুল সরে সরে এসে পড়ছে কপালে। শাহাবউদ্দীন প্রতীক্ষা ক'রল দু'মুহূর্ত, কেউ উঠল না।

শাহাবউদ্দীনের চোখ ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। বলতে সুরু ক'রল, 'পাকিস্তান হওয়ার আগে মুসলিমলীগ নেতারা বলেছিল, প্রত্যেক প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার পূর্ণ মর্যাদা দেবে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর দেখা গেল সব ভাঁওতা। কোথায় সে সব প্রতিশ্রুতি। সেদিন তা ছিল শুধুই কথার কথা। পাকিস্তান সৃষ্টির সুরু থেকেই পূর্বপাকিস্তানীদের ওপর শোষণ চলেছে কেন্দ্রের। পূর্বপাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিমপাকিস্তানে বড়ো বড়ো দালান উঠছে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, আর পূর্ববাঙলা দিন দিন নিঃস্ব, ভিখিরি হ'য়ে পড়ছে। সিন্ধুর নোনা জল দূর করার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হ'তে পারে, আর পূর্ববাঙলার বন্যা-নিয়ন্ত্রণে কয়েকশ' কোটি টাকা খরচা হ'তে পারে না! ওরা পূর্ববাঙলাকে ধীরে ধীরে উপনিবেশ বানিয়ে তুলছে। সম্পদ শোষণ ক'রেও তৃপ্ত নয়। উপরন্তু চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রেও পূর্ববাঙলার লোকদের বঞ্চিত ক'রে চলেছে কেন্দ্র! কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড পোস্টে বাঙালীর সংখ্যা কোনো ক্ষেত্রেই শতকরা ২০ ভাগের বেশি নয়। তৃতীয় শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তানীদের সংখ্যা তো মাত্র ১০ ভাগ। সেণ্ট্রাল সেকরেটারিয়েটে বাঙালী মাত্র শতকরা ৬ জন। সেনাবাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৫ জন। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও পূর্ববাঙলার ছেলেমেয়েদের পিছিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। পশ্চিমপাকিস্তানে যেখানে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬টি মেডিকেল কলেজ পূর্বপাকিস্তানে

সেখানে ২টি বিশ্ববিত্তালয়, এবং ৩টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। অথচ লোকসংখ্যা পূর্বপাকিস্তানে বেশি। কাজেই পূর্ববাঙলাকে বাঁচতে হ'লে আলাদা ভাবেই বাঁচতে হবে।'

জাকারিয়া জিজ্ঞেস ক'রল, 'পূর্ববাঙলা কি একা স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারবে?'

'কেন পারবে না, পূর্ববাঙলার চেয়ে অনেক ছোটো রাষ্ট্র পৃথিবীতে রয়েছে। তাছাড়া কৃষিসম্পদে পূর্ববাঙলা খুবই উন্নত। পশ্চিমপাকিস্তান তো আমাদের খাওয়াচ্ছে না, আমরাই বরং ওদের খাবার জোগাচ্ছি, আর আমাদের পয়সায় আমাদেরই ওপর খবরদারি ক'রছে ওরা, পূর্ববাঙলা তার নিজের সম্পদেই এখনকার চেয়ে ঢের ঢের ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। একটা হিসাব দিচ্ছি। পাট, চা, চামরা তামাক, মাছ ইত্যাদি রপ্তানী ক'রে পূর্ববাঙলা পাকিস্তানেব মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫ ভাগ রোজগার করে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিমপাকিস্তানে আর পুর্বপাকিস্তান পায় মাত্র ২৫ ভাগ। রাজস্বেরও বেশিটাই জোগায় পুর্বপাকিস্তান। বণ্টনের বেলায় সে-ই বৈষম্য। তাছাড়া ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি মারফত যে-টাকা অ'র্জত হয়, তার প্রায় সবটাই পশ্চিমপাকিস্তানে চলে যায়। পাকিস্তানের ১৮টি সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ১৬টিরই হেডকোয়ার্টার পশ্চিমপাকিস্তানে। ৩৩টি বীমা-কোম্পানীর ৩টির হেডকোয়ার্টার মাত্র পূর্বপাকিস্তানে। টাকা এইভাবে পাচার হ'য়ে যায় বলেই তো মুজিবসাহেব তাঁর ছয় দফায় পূর্বপাকিস্তানের জন্য আলাদা মুদ্রা দাবি ক'রেছেন। এইসব টাকা থাকলে পূর্বপাকিস্তানের দুঃখ তো থাকতই না, দিব্যি সুখে বাঁচত পারত পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ।'

প্রজেশ বলল, 'খনিজ-সম্পদ আর সৈন্য-সামন্তে পূর্বপাকিস্তান তো খুবই দুর্বল।'

জবাব দিল আতোয়ার, 'খনিজের মধ্যে সবচেয়ে দরকারি কয়লা।

ভারত থেকে অনায়াসেই আমাদের চাহিদা মেটাতে পারি। চীন থেকে না এনে ভারত থেকে কয়লা আনালে খরচা আমাদের অনেক কম পড়বে। ভারতের কাছে আমরা মাছ আর পাট বেচতে পারব। আর সৈন্যদল পরে আপনিই গড়ে উঠবে। কেন্দ্রের কর্তারা পূর্বপাকিস্তানকে স্বয়ম্ভর ক'রবে না, ওরা আমাদের বিশ্বাস ক'রে না। ১৯৫৬ সালে সামরিক খাতে পূর্বপাকিস্তানে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ শতকরা ২ভাগ মাত্র। '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একটি দাবি ছিল পূর্বপাকিস্তানে নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার ক'রতে হবে। কিন্তু সে দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেয় নি। সৈন্যদল নিজেদের গড়তে হবে। তবে এখনই নয়, আর তার যে খুব একটা প্রয়োজন হবে তা মনে হয় না। অনেকে বলে, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পূর্বপাকিস্তান দুর্বল হ'য়ে পড়বে। ভারত এক থাবায় তখন পূর্ববাঙলা নিয়ে নেবে। প্রথমত, আমার মনে হয় না ভারত তা ক'রবে। তাতে বাধা দেবে পশ্চিমবাঙলা। কারণ সীমানার খুঁটি ছাড়া দুই বাঙলায় তফাৎ কিছুই নেই। দু'জনে এক ভাষায়ই কথা বলে, একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দু'জনের। নিজের জাতির উপর, নিজের ভায়ের উপর পশ্চিমবাঙলা গুলি চালাতে দেবে না নিশ্চিত। তবু স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, ভারত আমাদের আক্রমণ করবে! কিন্তু বর্তমান যুগে হুট্ করে একটি দেশকে কেউ আক্রমণ ক'রে বসতে পারে না। সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্র প্রতিবাদ জানাবে, হানাদারের নিন্দা করবে। ভিয়েৎ-নামের মতো ছোট্ট একটা দেশকেই মহাশক্তিধর আমেরিকা দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেও কাবু করতে পারছে না।'

আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'তোমরা 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা ক'রে কি পশ্চিমবাঙলার সঙ্গে মিশে যেতে চাও?'

শাহাবউদ্দীন দু-এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "না, পূর্ববাঙলা আলাদাই থাকবে। ভবিষ্যত জানে, দুই বাঙলা এক

হবে কি না। কিন্তু আমাদের আপাতত সে-রকম কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে দুই বাঙলায় যাতায়াত, সাংস্কৃতিক যোগাযোগে কোনো বাধা আমরা রাখব না। ইচ্ছে করলে পঁচিশে বৈশাখ সকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কিংবা ১১ জ্যৈষ্ঠ নজরুলের গৃহ ঘুরে আসতে পারবে এখানকার লোক। ওখানকার লোকও যোগ দিতে পারবে একুশে ফেবরুয়ারির অনুষ্ঠানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা তো থাকবেই। আসলে দুই বাঙলায় দুইটি মন্ত্রিসভা ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই থাকবে না।'

আবার বললাম, 'আয়ুবের সেনাবাহিনীব বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব কি সম্ভব ?'

শাহাবউদ্দীন বলল, 'আমরা মিলিটারিতে ক্যু ক'রতে চেষ্টা ক'রব। বাঙালী সৈনিকদের দলে টানতে হবে। পূর্বপাকিস্তানের মিলিটারি ঘাঁটিগুলি হাতে আনতে পারলেই কাজ সহজ হ'য়ে যাবে। পূর্ব-বাঙলা থেকে পশ্চিমপাকিস্তানের দূরত্ব বারোশ' মাইল। ওখান থেকে সৈন্য পাঠাতে পাঠাতে আমাদের হাতে চলে যাবে সব কিছু। 'স্বাধীন পূর্ববাঙলাকে' স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রেব সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে যাতে সঙ্গে সঙ্গে তাদেব বেতারে আমাদের স্বীকৃতি দেয়। ভারতকে অনুরোধ জানাব তার ওপর দিয়ে যেন পশ্চিমপাকিস্তান থেকে পূর্ববাঙলায় সৈন্য পাঠাতে বাধা দেয়, তাহ'লেই হবে। অবশ্য একদিনে এসব হবে না। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতির। আমি নাম বলতে চাই না, তবে দু-একজন নেতাও ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছেন, কাজ সুরু ক'বে দিয়েছেন।

দীপ্তি বলল, 'এতে আমাদের ভূমিকা কী ?'

'আপাতত এই ভাবধারায় জনমত গঠন করা এবং বিপ্লবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করাই হবে আমাদের কাজ। জায়গায় জায়গায় অনেক রাইফেল ক্লাব রয়েছে। সেখানে ভর্তি হ'য়ে রাইফেল চালনা শিখতে হবে, ছাত্রদের ইউনিভারসিটি আর্মি কোর থেকে

সামরিক ট্রেনিং নিতে হবে। এইভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে নিজেদের। যাতে সেই চরম দিনে কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়াতে পারে লড়াইয়ের ময়দানে।

পরিকল্পনায় খুঁত নেই কোনো। কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা খুবই কষ্টসাধ্য। এই মহা পরিকল্পনা রূপায়ণের উপযুক্ত নেতা কোথায়? পূর্ববাঙলায় নেতার আজ বড়ো অভাব। দু-একজন ছাড়া সত্যিকারের নেতা কেউ নেই। আমি বললাম, 'তার চেয়ে স্বায়ত্তশাসন আদায় ক'রতে পারলে কাজটা আরও তাড়াতাড়ি হবে। আমার মতে, সে-চেষ্টায়ই আগে করা উচিত।'

শাহাবউদ্দীন দু-এক মুহূর্ত ভেবে বলল, এ পথে হাইকমাণ্ড যে না ভাবছেন তা নয়। তবু আবার কথাটা তুলব। প্রস্তাবটা ভালোই। আজ এখানেই থাক্। পরবর্তী কার্যসূচী যথাসময়ে জানানো হবে। ইতিমধ্যে সকলে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নাও। মনে রেখো, এপথে প্রতি পদে বিপদ ওঁৎ পেতে রয়েছে।'

ধানক্ষেতের মাঝে বসে থাকতে বড়ো ভালো লাগছিল। নীল আকাশের দিকে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে ক'রছিল। তবু উঠতে হলো। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। এক ঝাঁক গাঙশালিখ উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। সকলে আবার নৌকোয় এসে উঠলাম, মুহূর্ত আগেকার গম্ভীর পরিবেশ হাস্যে লাস্যে ভরিয়ে তুললাম। লায়লা আর দীপ্তির কলকণ্ঠ নদীর ওপর প্রতিধ্বনি তুলে তুলে যাচ্ছিল।

হৈ-হৈ ক'রতে ক'রতে হাড়িকুরি নিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি যেন সত্যি সত্যি পিকনিক ক'রে এলাম।

হঠাৎ মুখ তুলে আতোয়ারকে বললাম, 'আচ্ছা, 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র ব্যাপারে তুই তো পার্বত্যচট্টগ্রাম গিয়েছিলি?'

আতোয়ার একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েই আবার খেতে খেতে বলল, 'হ্যাঁ, 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গড়তে পার্বত্যচট্টগ্রামের

চাকমা, মগী, টিপরা, কুকি, খেয়াংদের সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যায় পূর্বপাকিস্তানে এরাও কম নয়। এদের ক্ষোভ আমাদের থেকেও বেশি। ওদের উন্নতির জন্য পাকিস্তান-সরকার বলতে গেলে কিছুই করে নি। ওরা খুবই সাহসী এবং যোদ্ধার জাত। জানিস, ব্রিটিশ আমলে আরাকান-চীফ রোনো খানের সঙ্গে ব্রিটিশের সৈন্য কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিল না। রোনো খান নিজেই রাজা হ'য়ে বসেছিল। খাজনাপত্তর নিজেই আদায় ক'রত। ব্রিটিশকে দিত না কিছুই। শেষে না পেরে বৃটিশ সরকারকে বাইশ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য পাঠিয়ে তবে রোনো খানকে দমাতে হ'য়েছিল। কুকি-চীফ রোটেন ফিয়াও বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিল। তাকে দমাতেও ইংরেজ সরকারের বেশ বেগ পেতে হ'য়েছিল। এই সব দুর্ধর্ষ আদিবাসীদের সাহায্য পেলে আমাদেব শক্তি কতোটা বেড়ে যাবে ভাবতে পারিস ?

ওখানে দল গঠনের, 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র মতবাদ প্রচারের ভার নিয়েছে দীপক বড়ুয়া। রাঙামাটির ছেলে। শাহাবউদ্দীনের সঙ্গে ঢাকা ইউনিভারসিটিতে পড়তো। ওখানকার আঁটঘাট সে ভালো ক'রেই জানে।

দীপকের সঙ্গে আমি আর শাহাবউদ্দীন একবার গিয়েছিলাম রাঙামাটি ছাড়িয়ে আরও ভিতরে। মানিকচেরি, মঙ, কেসালাং, সুভালং, বহমং, প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে ঘুরে ট্রাইবাল চীফদের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি। যা বলার দীপকই বলত। আমাদের পরিচয় দিত। দেখলাম, দীপককে ওরা খুব খাতির করে। দীপকের বাবা ডাক্তার। ওইসব অঞ্চলে দীপকের বাবার খুব সুনাম। একে ডাক্তারবাবুর ছেলে, তায় দীপক শিক্ষিত এবং ধর্মে বৌদ্ধ। তাই খাতিরটা ভালোই পেত।

কখনো হেঁটে, কখনো পটলের মতো নৌকায় ঘুরে বেড়িয়েছি গ্রামের পর গ্রাম। পার্বত্যচট্টগ্রামের সবটাই প্রায় উপত্যকা।

মিয়ানী, ক্যাসালং, চেঙ্গড়ী সুন্দর সুন্দর ছোটো ছোটো নদী বয়ে চলেছে সেখানে! নৌকোয় যেতে যেতে দু'পাশে দেখেছি কলাগাছ, শন্, অর্কিড আর ভালদার বন। পাহাড়ী বাঁশকে ওখানে 'ভালদা' বলে। দূরে দূরে বসতি। বাঁশের মাচার উপর বেড়ার ঘরগুলো দেখতে ছবির মতো লাগছিল। মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা জুড়ে চাষ-আবাদ চলছে।

এক গ্রামে এসে নৌকা লাগাল দীপক। ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যখন অবাক চোখে মগীচীরা দেখছে আমাদের। দীপকের ডাকে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মগীচীফ। গায়ের রঙ গেরুয়া, পরনে গেরুয়া কাপড়। দীপক আমাদের পরিচয় দিল। দু'চারটির কথাবার্তার পর মগীচীফ নিয়ে গেল আমাদের তার ঘরে। সিঁড়ি বেয়ে বাঁশের মাচার ওপর উঠে গেলাম। ঘরে বেড়ার গায় বাঘের ছাল। ধারালো অস্ত্র ঝুলছে পাশে। বেঁটে বেঁটে মোড়া রয়েছে কতগুলো। বুঝলাম, বসবার ঘর। বাংলাই বলে ওরা। তবে চাঁটগার ভাষা থেকেও কঠিন। আমাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। দীপকের মারফত আমাদের কথা চলতে লাগল। দীপক মাঝে মাঝে শাহাবউদ্দীনের কাছ থেকে জবাব জেনে নিচ্ছিল। স্বাধীন পূর্ববাঙলা হ'লে তাদের কী কী সুবিধা হবে, বোঝাচ্ছিল দীপক। বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কথাবার্তা শেষ হ'লো। মগীচীফ কথা দিল, আমাদের কাজে সে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

কথা বলতে বলতে দুপুর হ'য়ে গেছিল। নৌকোয় ফিরে রান্না ক'রে খেতে হবে আমাদের। কিন্তু চীফ না খাইয়ে ছাড়ল না। শাহাবউদ্দীন একটু ইতস্তত ক'রছিল। দীপক বলল, 'না খেলে দুঃখ পাবে। এমন কি আমাদের কাজের পক্ষেও ক্ষতি হ'তে পারে। এরা খুব অতিথিপরায়ণ।'

শাহাবউদ্দীনকে তবু নিরুত্তর দেখে বলল, 'ভয় নেই, সাপখোপ

একুশে ফেবরুয়ারি। বাঙালীর জাতীয় জীবনের বড়ো পবিত্র দিন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে রক্ত আঁখরে অমর একুশে ফেবরুয়ারি। একুশের আন্দোলন তো শুধু ভাষা-আন্দোলন নয়, আরও বেশি কিছু, আরও তাৎপর্যমণ্ডিত সে দিন— ভারতকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করার স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যারা এনেছিল সর্বনাশা দাঙ্গা, দুইয়ের যুগ যুগ কালের সৌহার্দ্যে ধরিয়েছিল চির, একুশের আন্দোলন তাদেরই বিরুদ্ধে জেহাদ। এ আন্দোলন কায়েমীশাসকদের পূর্ববাঙলাকে শোষণের তীব্র প্রতিবাদ। যে-মরফিয়া পূর্ববাঙলার সাড়ে চার কোটি মানুষকে পূর্ব-পাকিস্তানী বানিয়েছিল—এ আন্দোলন সেই মরফিয়ার ঘোর কাটাবার আন্দোলন। এতদিন পূর্ববাঙলার মানুষের কাছে বাঙলার আপন-জনেরা বড়ো দূরে ছিলেন, এবারে তারা কাছে এলেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-মাইকেল-শরৎচন্দ্র পূর্ববাঙলার মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার আসন পেলো। তাইতো পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ বছরে বছরে একুশের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না। এই দিন তাদের অতীতে ফিরে তাকাবার, ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার শপথ নেবার দিন।

২১ ফেবরুয়ারির এখনো দিন-কয়েক বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে শহীদ-দিবস পালনের প্রস্তুতি পড়ে গেছে। কাগজে কাগজে ছাত্রসংস্থার কর্মসূচী ছাপা হ'চ্ছে। যে-যেখানেই থাকি না ওই দিন একত্র মিলবই। আমি, আতোয়ার, আলো, শাহাবউদ্দীন, প্রজেশ হাজারো মানুষের মৌন মিছিলে শরিক হ'য়ে আজিমপুর গোরস্থানে, কেন্দ্রীয় শহীদ-মিনারে যাবই সেদিন। শহীদের কবরে অঞ্জলি ভরে রক্ত-গোলাপ ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মনটা আমার বড়ো ভার থাকে। এ পর্যন্ত একবারও বঞ্চিত হই নি এই পবিত্র বেদীমূলে অর্ঘ্য দেওয়া থেকে। শাহাবউদ্দীন আজ ঢাকা, কাল ময়মনসিংহ, পরশু চট্টগ্রাম

ক'য়ে বেড়াচ্ছে। আতোয়ারের অবস্থাও তাই। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন ওই দিন আসবেই। একবার শাহাবউদ্দীনের জ্বর ছিল, আসতে পারে নি। সে যে কী ছটফটানি! মর্মান্তিক দুঃখে শাহাবউদ্দীনের মতো শক্ত ছেলের চোখ বেয়েও জল গড়িয়ে পড়েছিল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে শান্ত ক'রেছিলাম। মাস্টারি নিয়ে আলো কয়েক বছর কুমিল্লাতেই আছে। কিন্তু ওই দিন সে আসবেই। আতোয়ারের পাশে পাশে যাবে শহীদ-মিনারে। ঈদ-পুজোয় সাধারণত সবাই দেশে-গাঁয়ে ফিরে আসে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমরা মিলি একুশে ফেবরুয়ারি। পুজো-ঈদে আজকাল আর একত্র হ'য়ে উঠতে পারি না।

ফেবরুয়ারির বিশ তারিখের আগে শাহাবউদ্দীনের দেখা সাধারণতঃ পাই না। কিন্তু এবার হঠাৎ দিন-পাঁচেক আগেই এসে হাজির। দেখে অবাক। 'কীরে সূর্য কোন্ দিকে উঠেছে আজ?'

শাহাবউদ্দীন স্থিরদৃষ্টে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মমতাজআপার যে বাড়াবাড়ি অসুখ তুই জানিস না।'

'মমতাজআপার অসুখ!' আমার বিস্মিত চোখের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

'আমি খবর পেয়ে ময়মনসিং থেকে ছুটে এসেছি, আর তুই ঢাকায় বসে খবর রাখিস না। তোরা কী? তাছাড়া তুই না সাংবাদিক।' শাহাবউদ্দীনের কণ্ঠে তিরস্কারের সুর। দু'মুহূর্ত আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে বলে উঠল, 'শীগ্‌গীর শার্ট চাপিয়ে আয়। এক্ষুনি মমতাজআপার বাসায় যাব।'

মমতাজআপার বাসায় যখন এসে পৌঁছলাম, তখন দশটা বাজে প্রায়। শীতের সকালের ফিকে কমলা রঙ তখন সাদা হ'তে চলেছে। বাড়ির অন্য সব লোকজনও ঘরে রয়েছে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে

মমতাজআপা। তাঁর একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে খাটে। গাঁয়ের রঙ ফ্যাকাশে—হলদেটে হ'য়ে গেছে।

আমি বিস্ময়ে, দুঃখে মূক হ'য়ে গেলাম। এই সেই মমতাজআপা যিনি একদিন জীবনের প্রাচুর্যে, রক্তের মাতনে বলে উঠেছিলেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!

মমতাজআপা তখন নারায়ণগঞ্জ মরগ্যান গার্লস স্কুলের হেড-মিসট্রেস। তাঁর দু'চোখে ছিল আশ্চর্য সম্মোহন, কণ্ঠে ছিল জাদু, স্কুলের প্রতিটি মেয়ে তাঁর কথায় উঠত বসত, আপার কথায় ওরা যে-কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠিত হ'তো না। মমতাজ-আপা দিনের পর দিন মেয়েদের যে এমন তাতিয়ে তুলেছেন, বাংলা ভাষার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছেন জানতে পারি নি আগে, জানলাম '৫২ সালের ২৫ ফেবরুয়ারি।

কোথায় কোন্ হেড মিস্ট্রেস ছাত্রদের প্ররোচিত করে ধর্মঘট ক'রতে? মমতাজআপা ক'রেছেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় ছাত্রপরিষদের সংগ্রাম-কমিটির ডাকে সাড়া দিয়েছে মরগ্যানের ছাত্রীরা। মমতাজআপার ডাকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা সবুজ ঘাসে-ঢাকা মরগ্যান গার্লস স্কুলের চত্বরে দাঁড়িয়ে মমতাজআপা অগ্নিবর্ষী ভাষায় ছাত্রীদের সেদিন বলেছিলেন, 'যে-ভাষায় তুমি আমি কথা বলছি, যে-ভাষায় তোমার মা আমার মা কথা বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-ভাষায় আমাদের বাপ-দাদারা কথা বলে এসেছেন, লীগ-সরকার আজ আমাদের মুখ থেকে তা কেড়ে নিতে চায়। এই যে মিষ্টি ক'রে তোমরা আজ বাংলা বলছ, বলতে পারবে না। সঙিন উঁচিয়ে ছুটে আসবে সেপাইরা। বলবে, উর্দু মে বাত ক'রো। উর্দু পড়তে হবে, লিখতে হবে, বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান, আব্বাসউদ্দীনের গানও প্রাণ খুলে তোমরা গাইতে পারবে না।' একটু থেমে মমতাজআপা ছাত্রীদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একবার।

সূর্যটা তেতে উঠেছে। থম থম্ করছে মেয়েদের ফর্সা মুখগুলো। ওরা ওদের প্রিয় মমতাজআপার কথা শুনে চলেছে। কী যেন জাদু আছে সে কথায়। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। মমতাজআপা আবার সুরু ক'রলেন, 'আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙালী বলে সারা বিশ্বে আজ আমরা গর্ব বোধ করি। বাঙালাদেশে জন্মেছেন সূর্য সেন ক্ষুদিরাম নির্মল সেন বিনয় বাদল দীনেশের মতো ছেলেরা, জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল জসিমউদ্দীন সুকান্ত, জন্মেছেন সুভাষচন্দ্র বসু, জন্মেছেন আব্বাসউদ্দীন আলাউদ্দীন খানের মতো গায়ক। এমনি আরও কতো সোনার ছেলে বাঙলার মাটিতে জন্মেছেন। ওঁরা আমাদের গর্ব। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গর্ব করার আর কিছুই থাকবে না।

'একদিন বাঙলার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দেশ স্বাধীন ক'রতে হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলেছে, আজ তার চেয়েও বড়ো দুর্দিন। ইংরেজের আমলে আমরা অন্তত নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে পারতুম, লীগ-সরকারের আমলে আমাদের কোনো পরিচয়ই থাকবে না। মাতাপিতার পরিচয়হীন একদল এতিমে পরিণত হবো আমরা। তোমরা কি এর প্রতিবাদ ক'রবে না। মায়ের এতো বড়ো অসম্মান চুপ ক'রে সয়ে যাবে! ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। ওরা আওয়াজ তুলছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তোমরাই-বা তুলবে না কেন। এই দুর্দিনে বোরখার আড়ালে থাকলে চলবে না। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে। তোমরা যদি আজ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছেলেদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াও তাহলে পূর্ববাঙলার মেয়ে-জাতটার আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। তোমরাও আওয়াজ তোল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শ'য়ে শ'য়ে মেয়েলি কণ্ঠ চিরে আওয়াজ উঠল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। স্লোগানে স্লোগানে সারা শহরের

লোকের মনে তপ্ত শিহরণ জাগিয়ে দিল। একটু বাদে ছাত্ররাও এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বাঙলার দামাল ছেলেদের পাশে আজ বাঙলার দামাল মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন উন্মাদনা, নতুন উত্তেজনায় সকলে চনমনিয়ে উঠেছে। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছে মমতাজআপা—ছেলে মেয়ে সকলের মমতাজআপা।

দিনের পর দিন মমতাজআপা আর মোস্তাফা সারোয়ারের জ্বালা-ধরানো বক্তৃতায় নারায়ণগঞ্জ শহরটা আন্দোলনে জেগে-ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো গর্জন ক'রতে থাকল। সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় মোস্তফা সারওয়ার তাই। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর দু'টি চোখ। মনে হয় কোনো শিল্পী তুলি দিয়ে চোখ দুটো এঁকে দিয়েছে। তার ডাকে ঘুমন্তও জেগে ওঠে। কথাশিল্পী মনোজ বসু একবার নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন সাহিত্যিক। রহমতুল্লা ক্লাবে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মোস্তফার বক্তৃতা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি নিজেও কাঁদলে, আমাদেরও কাঁদালে।' এমনি ছিল মোস্তাফার কণ্ঠের জাদু। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে ঢুকবার মুখেই মোস্তফাদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতেই পড়ে দুটো পামগাছ। এই বাড়িতে পাকিস্তানের কতো যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে ঠিক নেই। সোহ্‌রাওয়ার্দী থেকে সুরু ক'রে সব নেতাই এসেছেন এ-বাড়িতে। পরবর্তীকালের প্রখ্যাতা ছাত্র-নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর দীক্ষাও হ'য়েছিল এ-বাড়িতেই, মোস্তফার কাছে। ভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে সবচেয়ে বড়ো দান মোস্তফাদের। ওঁদের পরিবারের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে আন্দোলনে। ওঁদের মতো এতো নির্যাতিতও আর কেউ নয়।

পুলিশ আর মিলিটারি চষে ফেলেছে ঢাকার প্রতিটি ঘর। ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য ছেলেকে। ঢাকার আন্দোলন এবার ছড়িয়ে পড়ল ঢাকার বাইরে—সারা পূর্ববাঙলার শহর আর গঞ্জে।

সে-আন্দোলন সবচেয়ে দুর্বার হ'য়ে উঠল নারায়ণগঞ্জে। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে সারাটা শহর। রক্তের আঁখরে লেখা হয়ে গেছে শহীদ বরকত সালাম রফিক জাব্বার শফিকুরের নাম।

২৪ ফেবরুয়ারি মীটিং চলছে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ্ ক্লাবে। নবীগঞ্জ থেকে শীতলক্ষ্যা—শহরের দুই প্রান্ত ভেঙে ছাত্ররা এসেছে আজ। প্রত্যেকের বুকে কালোব্যাজ। মোস্তাফা তার উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেছে: 'আমরা শুধু নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চেয়েছি, রবীন্দ্র-নজরুল সুকান্তের লেখা পড়তে চেয়েছি, প্রাণভরে মাকে মা বলে ডাকতে চেয়েছি, আর ওরা বুলেট দিয়েছে। কতো মায়ের বুক খালি ক'রে রক্ত ঝরিয়েছে ঢাকার রাজপথে জালিম লীগ-সরকার তার ঠিক নেই, বরকত-সালাম-শফিকদের মৃত্যু নেই। নাজিম-নুরুল জানে না যে ওরা আমাদেরই মধ্যে বেঁচে উঠেছে। ওদের রক্ত-দেওয়া আমরা ব্যর্থ হ'তে দেবো না। আমাদের লড়াই চলবে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ক'রতেই হবে। ওরা আমাদের জেলে পুরবে, গুলি ক'রবে, বেঅনেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রবে দেহ—করুক। সূর্যসেন-ক্ষুদিরামের উত্তরসূরী আমরা। মৃত্যু-ভয় আমাদের নেই। এগিয়ে আমরা যাবই।' বলতে বলতে মোস্তফার ফর্সামুখে রক্ত জমে ওঠে। উত্তেজনায় তাঁর দুইটি সুন্দর চোখে আগুন ঝরে। একটু থেমে আবার বক্তৃতা সুরু ক'রতে যাচ্ছিল, এমন সময় রব ওঠে, পুলিশ পুলিশ। মুহূর্তে যে-যার পালাতে থাকে। রহমতুল্লার পিছন দিক দিয়ে দৌড়তে থাকলাম। কেউ-বা পাঁচিল টপকিয়ে পাশের সিনেমাহলে গিয়ে পড়ে। অল্পবয়সী কয়েকটি ছাত্র ধরা পড়ল। জীপে ক'রে নিয়ে চলে গেল ওদের।

পরের দিন ১৪৪ধারা থাকা সত্ত্বেও মরগ্যানের মেয়েরা স্কুলে গেল। মমতাজআপা যেতে বলেছে। সে ডাক উপেক্ষা ক'রতে পারে এমন কেউ নেই। মমতাজআপা বললেন, '১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রেই মিছিল বের ক'রতে হবে। গ্রেপ্তার ক'রে করুক।'

মেয়েরা গেট থেকে বেরুতে থাকে। পুলিশ আগে থেকেই গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বেরোতেই নিয়ে তোলে পুলিশের ট্রাকে। মমতাজআপাকে ধরল। মেয়েদের কণ্ঠ চিরে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—নাজিম-নুরুল নিপাত যাক্। ট্রাকে উঠেও স্লোগান দেয় মেয়েরা। মমতাজআপাকে নিয়ে গেল কোর্টে।

দাবাগ্নির মতো সে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। মমতাজ-আপাকে গ্রেপ্তার ক'রেছে! থানার চারদিকে ছাত্র আর যুবকরা আস্তে আস্তে জমতে থাকে। পুলিশকে হঠাৎ সচকিত করে স্লোগান ওঠে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মমতাজআপার মুক্তি চাই। পুলিশী জুলুম বন্ধ কর। একদল পুলিশ ছুটে আসে। দৌড়দৌড়ি পড়ে যায়। পুলিশ-ছাত্রে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। রাস্তার লোকও এসে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে।

খবর পাওয়া গেল, সন্ধ্যের পর মমতাজআপাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে। তাছাড়া আজ রাতেই শহর মিলিটারির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মোস্তফাদের বাড়িতে মীটিং বসল ছাত্র এবং যুবনেতাদের। সকলেই বলল: মমতাজআপাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না। মিলিটারিও ঢুকতে দেবো না আমাদের শহরে।

কী ক'রে বন্ধ করা হবে মিলিটারি আসার, কী ভাবে বাধা দেওয়া হবে মমতাজআপাকে নিয়ে যাওয়ার।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ঢুকবার সড়ক পথ একটিই। পথের দু'পাশে সারি সারি অনেক গাছ। ঠিক হ'লো ফতুল্লা, মানে নারায়ণগঞ্জের তিন-চার মাইল আগে থেকে পথের ওপর গাছ কেটে ফেলে রাখা হবে।

করাত আর কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। শ'য়ে শ'য়ে ছেলে গাছ কাটছে ফতুল্লা থেকে চাষাড়া পর্যন্ত। মড়্

মড়্ করে বিশাল গাছগুলো রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। শাখাপ্রশাখা নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে একের পর এক। ছেলেদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা!

ইলেকট্রিক লাইনের তারও কেটে দেওয়া হলো। মিলিটারি ঢুকে পড়লেও অন্ধকারে যাতে কিছু বুঝতে না পারে।

শীতের সন্ধ্যা। ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সারা শহর গাঢ় অন্ধকারে ডুব দিল। কুয়াসায় কয়েক গজ দূরের জিনিসও ভালো দেখা যাচ্ছে না।

হাজার হাজার ছাত্র আর যুবক কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অন্ধকারে ঘাঁপটি মেরে আছে।

গোটা সাতেকের দিকে খবর পাওয়া গেল মিলিটারি আসছে। ফতুল্লার কাছে মিলিটারি ভ্যানগুলো থমকে দাঁড়ালো। তারপর গাছ সরাতে লাগল একটার পর একটা। এর মধ্যে একদল মিলিটারি রাস্তার ঢাল দিয়ে চলে আসছে শহরের দিকে। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে ছিলাম সবাই। শ্মশানের কাছে আসতেই খোয়ার বৃষ্টি সুরু হ'লো। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল মিলিটারিরা। এরকম ভাবে বাধা পাবে ভাবতেই পারে নি বোধ হয়। একটু বাদে ফায়ারিং-এর আওয়াজ হ'লো। রাত্রির নীরবতা খান্ খান্ ক'রে সে শব্দ এসে পৌঁছল চাষাড়ায়।

মিলিটারিরা হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসছে চাষাড়ার দিকে। পুলিশ-ফাঁড়িতে এসে শেল্টার নিল ওরা। রেললাইন থেকে রাশি রাশি পাথর গিয়ে পড়ছে পুলিশফাঁড়িতে।

গাছ সরিয়ে সরিয়ে মিলিটারির ভ্যানও এসে পড়েছে। সার্চলাইট ফেলছে চারদিকে। সার্চলাইটের আলোয় আর আত্মগোপন করা সম্ভব হ'লো না। ছুটোছুটি পড়ে গেল।

ছুটে আসছে ওরা বেঅনেট উঁচিয়ে। একদল ছেলে ঢুকে পড়ল মোস্তফাদের বাড়ি। আমি অদূরে পুরনো বার-একাডেমি স্কুলটা

আগে যেখানটায় ছিল সেই খালটায় একটা কাঠের পুলের নিচে গিয়ে লুকোলাম।

মোস্তফাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল মিলিটারিরা। সারা বাড়ি তছনচ ক'রে ফেলছে। ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্ ক'রে কাপ-ডিশ ভাঙার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেদ ক'রে। বাড়ির মেয়েদের আর্ত চীৎকার উঠছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো কাউকে রেহাই দেয় নি ওরা। চৌবাচ্চায় গিয়ে লুকিয়েছিল একটি ছেলে। রেহাই পায় নি। চুলের মুঠি ধরে লায়লা আর লীলাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে সিঁড়ির নিচে। মোস্তফার বাবা ওসমান দালাল, বড়োভাই জোহাসাহেবকে মারতে মারতে এনে তুলল মিলিটারির ট্রাকে।

কে কোথায় ছিল জানি না। হঠাৎ অন্ধকার থেকে চীৎকার উঠল : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিলিটারির জুলুম চলবে না।

মিলিটারির সার্চলাইট চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি চষে ফেলছে। মোস্তফাদের বাড়ির পিছনের চাঁদমারিতে লুকিয়ে ছিল অনেকে। দৌড়ল। রেললাইন ধরে ছুটছে একদল তল্লার দিকে। আমার প্রায় সামনে থেকেই ছোট শাহাবউদ্দীনকে মারতে মারতে উঠিয়ে নিয়ে গেল জীপে। শীতের রাতেও কনকনে কচুরি-পানা ভর্তি ঠাণ্ডা জলে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, উঠবার উপায় নেই। অথচ থাকাও যাচ্ছে না। কাদায় পা ঢুকে যাচ্ছে।

একটু বাদে দেখলাম, মমতাজআপা আর কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটা জীপ ছুটে চলছে ঢাকার দিকে। তাঁরা জীপ থেকে চীৎকার ক'রে চলেছে : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিলিটারির অত্যাচার চলবে না।

কুয়াসায়, গাঢ় অন্ধকারে জীপটা মিলিয়ে গেল। মমতাজ-আপার কণ্ঠস্বরটাও ক্ষীণ হ'তে হ'তে আর শোনা গেল না শেষে।

এই সেই তেজস্বিনী মমতাজ আপা! শরীরে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই। শাহাবউদ্দীন আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকল, 'মমতাজআপা—'

মমতাজ আপা মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। পাশ ফিরলেন। শাহাবউদ্দীন আর আমাকে দেখে তাঁর বিষণ্ণ চোখ দুটো চিক চিক ক'রে উঠল। আমার থেকে শাহাবউদ্দীনের সঙ্গেই মমতাজআপার আলাপটা ছিল বেশি ঘনিষ্ঠ। শাহাবউদ্দীন একবার মমতাজআপাকে সম্পাদিকা ক'রে একটা প্রগতিশীল পত্রিকাও বের ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিল। ও প্রায়ই যেত মমতাজআপার কোয়ারটারে। শাহাবউদ্দীন বড়ো বোনের অপার স্নেহ পেয়েছে মমতাজআপার কাছে। যখন-তখন গিয়ে আবদার জুড়ত: আপা, ক্ষিদে পেয়েছে। খেতে দাও। শাহাবউদ্দীন পরে আমায় অনেকবার বলেছে, দেখ, বাঙলাকে আমি ভালোবাসতে শিখেছি মমতাজআপার কাছেই। আমার মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছেন মমতাজআপা।

বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'আয়, কাছে এসে বোস।' তারপর আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন 'এসো।'

কান্নার আবেগ চাপতে চাপতে শাহাবউদ্দীন বলল, 'তোমার এ কী চেহারা হ'য়েছে মমতাজআপা?'

মমতাজআপা সস্নেহে বললেন, 'আমাদের আর কি! বয়েস হ'য়েছে, মরতে তো হবেই! তোদের ওপরেই দেশের ভবিষ্যত নির্ভর ক'রছে। বাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ তো তোদের দিকে তাকিয়েই ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখছে। ওদের যেন সুখী ক'রতে পারো—তোমাদের আন্দোলন যেন সার্থক হয় যাবার আগে খোদার কাছে এই প্রার্থনাই ক'রে যাচ্ছি।' একটু থেমে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আমার ব্ল্যাড ক্যানসার, এখন ঘন ঘন রক্ত দিতে হচ্ছে। বেশি দিন আর হয়তো বাঁচবো না। আজ-কালের মধ্যেই মেডিকেলে ভর্তি হ'বো। পারলে যাস।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল মমতাজআপার।

বাড়ির সকলে শাহাবউদ্দীনকে চেনে বলেই কিছু বলছিল না। কিন্তু কপালের রেখা কুঞ্চিত হচ্ছিল দেখলাম।

ছায়া-ঢাকা নির্জন কালো পিচের রাস্তাটা ধরে এগোতে এগোতে মমতাজআপার সেই তেজস্বিনী মুখ আর আজকের বিষণ্ণ মুখটা বার বার মনের পর্দায় ছায়া ফেলছিল।

শাহাবউদ্দীনের মুখেও রা নেই। দু'জনেই নীরব।

একুশে ফেবরুয়ারির আগের দিন কুমিল্লা থেকে আলো এসেছে। কিছু বাড়তি ছুটি নিয়ে এসেছে এবার। ওর খালার বাড়িতেই আছে। আতোয়ারের ফুফার বাড়ি আর আলোর খালার বাড়ি পাশাপাশি। ছেলেবেলা থেকেই আতোয়ার ফুফার ওখানেই মানুষ। বাসা একটা অবশ্য আছে। সোনাকান্দায়। শীতলক্ষ্যার ওপারে। রাত হ'য়ে গেলে খেয়া মেলে না। তাই বেশির ভাগ রাতই কাটে শ্রমিক-ইউনিয়নের অফিসে। কোনো-কোনোদিন আমার এখানে এসেও থাকে।

উদাসীন ভাবে হাঁটছিল আতোয়ার। ফাল্গুনের উতল হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ছিল ঢোলা পাঞ্জাবিটা। ফুলার রোড ধরে পাশা পাশি হাঁটছি চারজনে—আমি, আতোয়ার, আলো আর শাহাবউদ্দীন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের অডিটরিয়ামের পাশের বাগানটা নানা রঙের ফুলে ফুলে ভরে গেছে। জিনিয়া, পপি, ক্রিসামথিয়াম আরও কতো ফুল। ব্রিটিশ কাউনসিলের অডিটরিয়ামে আমরা একবার একটা বড়ো ফাংসন ক'রেছিলাম। অরগেনাইজ ক'রেছিল প্রধানতঃ শাহাবউদ্দীন। আমরা সঙ্গে ছিলাম। পাকিস্তানের ডজনখানেক মন্ত্রী, শ'খানেক পরিষদ-সদস্য এসেছিলেন সে অনুষ্ঠান দেখতে। ছোটোবেলা থেকেই শাহাবউদ্দীনের দল সংগঠনের আশ্চর্য ক্ষমতা। হাঁটতে হাঁটতে শাহাবউদ্দীন আলোকে বলল: 'মমতাজআপার কাজের ভারটা তোমায় নিতে হবে। তোমার ওখানে স্কুলের মেয়েদের জাগিয়ে তোলার ভার তোমার। এক সময় মাস্টারদা তা ক'রেছেন, মমতাজআপা ক'রেছেন। তুমিও শিক্ষয়িত্রী। আশা করি তুমিও পারবে।'

আলো বলল, 'জানি না, আমার মধ্যে তোমরা কী দেখেছ? এত বড়ো কাজের ভার বইতে পারব তো। আমি তো সবসময়ই তোমাদের পাশে আছি। চিরকালই থাকবো। পূর্ব-

বাঙলার কাজে আমাকে সবসময়ই পাবে। বাঙলার জল, মাটি, ঘাস পাখি আমি যে বড়ো ভালোবাসি।'

কোন্ গাছ থেকে জানি একটা কোকিল কু-উ-উ কু-উ-উ ক'রে ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছিল। হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল। জানি না বসন্তের বাতাসটা এতো ভালো লাগে কেন? আতোয়ারও একবার আলোর দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে দু'জনেই নীরবে আমার পাশে পাশে চলতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে কেন্দ্রীয় শহীদ-মিনারের কাছে এসে পড়লাম। মিনারের গায় সিঁড়িতে বেলা শেষের লাল আলো এসে পড়েছে। এখানে এলেই মনটা কেমন যেন কান্নার আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। মিনারটা ডাইনে ফেলে ছোট্ট রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। কয়েক পা এগিয়েই বাড়িটা। গাছ-পালায় ঘেরা প্রশস্ত চত্বর। গেটে বুকে ব্যাজ পরে ছায়ানটের যে-সব ছেলে দাঁড়িয়েছিল ওদের কয়েকজন আমাকে আর আতোয়ারকে ভালোই চেনে। কার্ড চাইল না। এগিয়ে গেলাম। অনুষ্ঠান সুরু হ'তে বেশি দেরি নেই। শিল্পীরা মঞ্চে এসে সার বেঁধে বসে গেছে। খোলা মঞ্চ। পিছনে সাদা কাপড়ে একগোছা ফুলের ছায়া। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। আবছা দেখাচ্ছে শিল্পীদের। একটা নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে সারা গায়। চড়া আলো কোথায়ও নেই। মাঠে, মঞ্চে সর্বত্র একটা স্বপ্নীল পরিবেশ।

পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের বুকে বসে পড়লাম চারজনে। সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল চত্বরটা জুড়ে আবছা অন্ধকারে শ্রোতারা বসে।

সমবেতকণ্ঠে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানটি সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ হ'য়ে উঠল আরও রমণীয়। একেই দোল পূর্ণিমার রাত। আকাশে বড়ো চাঁদ। মেঘগুলো দ্রুত ছুটে চলেছে কোন্ নিরুদ্দেশের পানে। চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি চলছে। সারা চত্বরটা

কখনো চাঁদের আলোতে ভরে যাচ্ছে, কখনো আবছায়ায় ঢাকা পড়ছে। মন্দিরা, খোল, পাখাওয়াজ, বাঁশির সঙ্গে চলছে একটার পর একটা গান। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে বসন্তের আবাহন ক'রছে ছায়ানটের শিল্পীরা। অনেকটা দূরে বসে আছি। আবছায়াতে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আকৃতি দেখেই কয়েকজনকে চিনতে পারলাম—জাহেদুর রহিম, আবদুর রহিম চৌধুরী, ডক্টর মোতাহের হোসেনের মেয়ে ফাহমিদা, কলিম শরাফী, সনজিদা খাতুন। তাদের পিছনে দেখলাম সেতার হাতে ওয়াহেদুল হক সাহেব বসে। গান চলছে: 'দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে'। আলো আর আতোয়ার পরস্পরের দিকে চাইল একবার। জানি না ওদের মনে এই গান তখন কোনো আলোড়ন তুলেছিল কি না। 'আজি দখিন দুয়ার খোলো', 'কে দেবে, চাঁদ, তোমায় দোলা', শুনতে শুনতে যেন কোন্ জগতে চলে গিয়েছিলাম। কলিম শরাফীর কণ্ঠে 'ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে', গানটির রেশ আজও কানে লেগে রয়েছে। সব শেষে সমস্ত শিল্পী 'ওরে ভাই ফাগুন এসেছে বনে বনে' গানটি গাইতে গাইতে চক্রাকারে শ্রোতাদের পরিক্রমণ ক'রে পুকুরের সান-বাঁধানো ঘাটে এসে বসল সবাই। জলে চাঁদের আলোটা থিরথির ক'রে কাঁপছিল।

আজকে ঢাকায় রবীন্দ্র-সংগীতের এই যে এতো প্রচার, এতো কদর, এ-তো ভাষা-আন্দোলনেরই ফল। মুসলিমলীগ নেতারা হিন্দুদের সম্পর্কে যে বিষ ঢেলেছিল ভাষা-আন্দোলন তা শুষে নিয়েছে। গত কয়েক বছর রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপক প্রচারে ছায়া-নটের দান সবচেয়ে বেশি। আমি ছায়ানটের শারদ-উৎসবেও গেছি। মহালয়ার দিন খুব ভোরে বলদা গার্ডেনে সে-অনুষ্ঠান হয়। ঢাকার বোটানিক গার্ডেনের নাম 'বলদা গার্ডেন'। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া ওখানে আছে। পদ্ম আর শাপলা-শালুকে ভরা বলদা

গার্ডেনের ভিতরকার পুকুরটার প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটে শিল্পীরা বসে। শ্রোতারা পুকুরের চারধারে। শরতের শিশির-ভেজা ঘাসে বসে শারদ-আবাহন শুনতে যে কী ভালোই লাগে কী বলব! ঢুকতে, ঘাটের কাছে কী সুন্দর আল্পনা দিয়েছে মেয়েরা! সবে প্রথম ভোরের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে জলে। একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে কেয়াপাতার নৌকো গড়ে দীঘির জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে গাইলঃ 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি'। কখনো কখনো সমবেত কণ্ঠে, কখনো একক কণ্ঠে গান চলল। সব রবীন্দ্র-সংগীত। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা, নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা,' এবার অবগুণ্ঠন খোলো', 'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে'। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল শরৎ তাঁর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে যেন বলদা গার্ডেনে নেমে এসেছে।

অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতাদের নাড়ু, মোয়া, মুড়কি দেওয়া হ'লো জলযোগ ক'রতে।

ছায়ানটের সেকরেটারি কামাল লোহানী যখন মাটির নক্‌সা-কাটা প্লেটে নাড়ু-মোয়া নিয়ে এলো, হাল্কা ক'রে বললাম, 'বিউটিফুল। কনগ্রেচুলেশনস্‌ ফর সারভিং পিউরলি বেঙ্গলি ডিশ্‌।'

মৃদু হেসে কামাল লোহানী এগিয়ে গেলেন অন্যদের দিকে। চমৎকার ছেলে কামাল লোহানী। কামাল লোহানীকে আমি কখনো প্যাণ্ট পরতে দেখি নি। নিত্যকার পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি। সংবাদের সাব-এডিটর। বিয়ে ক'রেছে হিন্দু মেয়ে। কিন্তু ওঁর স্ত্রী পুজো-আচ্চা সবই ক'রে। কপালে সিঁদুর পরে। বিয়ে করার জন্যে ওকে ধর্ম বিসর্জন দিতে হয় নি। ধর্ম তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। কামাল লোহানীও ঈদ করে। তাঁদের ভালোবাসায় ধর্ম বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় নি।

জলযোগ হিসাবে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি দেওয়ার জন্য আজাদ

পত্রিকা সমালোচনা ক'রেছিল। বলেছিল, 'ওঁরা হিন্দু হ'য়ে গেছে। হিন্দুর মতো নাড়ু-মোয়া-মুড়কি খায়।'

নাড়ু-মোয়া কি হিন্দুর খাবার? এ তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রাম-বাঙলার প্রিয় খাবার। এ তো বাঙালীর জাতীয় খাবার। জানি না 'আজাদ পত্রিকা' এর মধ্যে হিন্দুয়ানীর গন্ধ পেলেন কোত্থেকে! আমি কয়েকজন বাঙালী মুসলমান এবং হিন্দু ছেলের কথাই জানি, যাঁরা লণ্ডন আমেরিকা পড়তে যাওয়ার সময় নাড়ু-মোয়া-মুড়কি নিয়ে গেছে। ওখানের বন্ধুরা খেয়ে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আবার ওই খাবার পাঠাতে লিখেছে। চপ কাটলেট থেকে নাড়ু-মোয়া অনেক স্বাদু।

ছায়ানট ছাড়াও ঢাকায় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারে যাঁদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তাঁদের মধ্যে নিক্কণ, ঐকতান, বুলবুল একাডেমি, জাগো আর্ট সেণ্টারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা তো একবার এক মুসলমান এস. ডি.ও-র বাসায়ই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব ক'রেছিলাম। স্বাধীনতার আগে বা পরে কোনো মুসলমান এস. ডি.ও-র বাসায় কখনো রবীন্দ্র-জয়ন্তী হ'য়েছে বলে আমার জানা নেই। দেশভাগের পর তো হিন্দুসংস্কৃতির নামে সত্যিকারের বাঙালী সংস্কৃতিকেই পাকিস্তান থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে উঠে-পড়ে লেগেছিল মুসলীমলীগ সরকার এবং তাদের বশংবদ কর্মচারি আর আনসাররা। ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ববাঙলার মানুষ আবার নিজেদের সংস্কৃতি কী বুঝতে পেরেছে, হিন্দু মুসলমানের বিভেদ ঘুচেছে।

আতোয়ারের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। ইউনিভার-সিটির সামনে এসে গেছি তখন। হাঁটছি আমি, আতোয়ার আর আলো। বসন্ত উৎসব দেখে গেটের কাছে শাহাবউদ্দীন বিদায় নিয়েছে। পলাশীর দিকে কী একটা জরুরি কাজ আছে। আতোয়ার বলছে:
'আলো, 'আজি জোছনা রাতে'—গানটা মনে আছে তোমার।'

আলো ভালোই গায়। আজি জোছনা রাতে গানটা আমি আলোর মুখে অনেকবার শুনেছি। আতোয়ারও শুনেছে। কিন্তু গান গাইবার জন্য অনুরোধ ক'রতে আতোয়ারকে আমি কখনো শুনি নি। পল্লীগীতি, নজরুলগীতি আর রবীন্দ্র-সংগীত এবং দেশাত্ম-বোধক গান ছাড়া তো আতোয়ার কোনো গানই শুনতে পারে না। হিন্দী গান তো ওর দু'চোখের বিষ।

আতোয়ারের কথা শুনে আলোর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। খুশি উপচে পড়ছে দুই চোখে। প্রাণ ঢেলে আলো গাইল গানটা। শ্রোতা আমি আর আতোয়ার।

শুয়ে শুয়ে সেদিন ভাবছিলাম, 'আতোয়ারটা যে কী! আলোর মতো মেয়ে পাওয়া যে-কোনো ছেলেব পক্ষে ভাগ্য। সি-এস-পি অফিসারও ওর পাণিপ্রার্থী হ'য়েছিল। আলো নাকচ ক'রে দিয়েছে। আলোর সারাটা হৃদয় জুড়ে যে আতোয়ার ছাড়া আব কারও স্থান নেই।

তখনো অনুষ্ঠান সুরু হয় নি। বাঙলা-একাডেমির সামনেকার নরম দুর্বায়-ঢাকা প্রাঙ্গণটা ভরে গেছে শ্রোতায়। আরও অনেক শ্রোতা আসছে। অদূরে অশ্বত্থগাছের নিচে মঞ্চ করা হ'য়েছে। আমার পাশেই মোজাম্মেল বসে। গোটা-দুই স্ন্যাপ নিয়েই ও চলে যাবে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে। এবার ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান কভারের ভার ছিল আমাব ওপর। সকালেই বেরুতে হ'য়েছিল- প্রভাত-ফেরী কভার ক'রতে। ছেলেমেয়েদের সে যে কী সুন্দর প্রভাত-ফেরী, সত্যিই দেখবার মতো। ঢাকার ছাত্রছাত্রী, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সকলেই যোগ দিয়েছে প্রভাতফেরীতে। হাতে সুন্দর ক'রে আঁকা প্ল্যাকার্ড। তাতে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতাব অংশ বিশেষ :

"মোদেব গরব মোদেব আশা আ মরি বাংলা ভাষা"

রবীন্দ্রনাথ

"এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর, করুণ : সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল ; সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল :"

জীবনানন্দ দাশ

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি।"

রবীন্দ্রনাথ

কবিতার পাশে পাশে আঁকা আছে মাছ, নদীর ঢেউ, ধানের শিষ, কাশফুল—জীবনানন্দের রূপসী বাংলার ছবি। সকলে তখন গেয়ে চলেছে একটার পর একটা গান : 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেবই

বসুন্ধরা,' 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' প্রভৃতি। গানের সুরে প্রথম ভোরের ঘুম-ভাঙা নগরবাসীরা ছাদে এসে দেখছে প্রভাতফেরী। ঢাকার রাজপথ পরিক্রমণ চলছে। এমন সুন্দব প্রভাতফেরী আর হয় না। নতুন বছরের প্রথম সূর্যটাকেও নতুন নতুন মনে হ'চ্ছিল। বড়ো ভালো লাগছিল ভোরের মৃদু বাতাসটা। প্রেসক্লাবে এসে প্রভাতফেবী শেষ হ'লো।

অনুষ্ঠান সুরু হ'য়ে গেছে, একটাব পর একটা গান আবৃত্তি চলছে। এবারে গান শেষ হ'তেই মাইকে সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল, শহীদুল্লাহ্ কায়সার ভাষণ দেবেন।

নড়েচড়ে বসলাম আমি। খাতা আর ডট পেন নিয়ে তৈরী হ'লাম। জানি, শহীদভাই লেখবার মতো কিছু বলবেনই। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শহীদভাই সুরু ক'রলেন, 'বাঙালীর জীবনে আর একটি নতুন বছর সুরু হ'লো। নতুন বছরটা বিঘ্নহীন, সুন্দর হউক — আজ শুধু এই কামনা।

'গেল বছরটা তো সংস্কৃতি নিয়ে হৈ-চৈ ক'রতে ক'রতেই গেছে। সেই বিতর্ক আজও শেষ হয় নি। সরকারী মহল মাঝে মাঝে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছে 'বিজাতীয় সংস্কৃতির' অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। জানি না বিজাতীয় সংস্কৃতি বলতে সরকার কী বোঝেন। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমপাকিস্তানই নাইট ক্লাব, ফ্যাশন শো, প্রভৃতি বিজাতীয় 'কালচার'-এ ভরে গেছে। পূর্ববাঙলার সৌভাগ্য যে, আমরা বিজাতীয় সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় আচারে-ব্যবহারে সত্যিকারের সংস্কৃতিমনা হ'য়ে উঠি এটা সরকারের পছন্দ নয়। তাই বাঙালীর সংস্কৃতিকে ওরা নাম দিয়েছে হিন্দুয়ানী। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপন নাকি হিন্দুয়ানী। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা শব্দ ব্যবহার ক'রে নাকি আমরা মহা অপরাধ ক'রে ফেলছি। পূর্ব্বপাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির

অনুপ্রবেশ প্রতিহত ক'রবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন আয়ুব-সরকার। তাঁরা বলছেন, পাকিস্তানে সিন্ধী পাঞ্জাবী বাঙালী কেউ নয়, সকলেই পাকিস্তানী, পাকিস্তান এক সংস্কৃতির দেশ। আমরা কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীকারে বিশ্বাসী।

'পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙালী এবং বাংলা তাদের ভাষা। শাসনতন্ত্রেও এই ভাষা এখন মর্যাদা পেয়েছে। কাজেই বাঙালীর ভাষা বা সংস্কৃতির বিকাশ কী ক'রে বিজাতীয় ব্যাপার হয়? 'পয়লা বৈশাখ' অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসংগীত হিন্দুয়ানী কি মুসলমানী এ নিয়ে একটা গোটা বই লেখা যায়, সংক্ষেপে আমি এ-সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলছি। ওঁরা বলেন, বাংলা পৌত্তলিকদের ভাষা। ও ভাষায় কথা বললে গুনাহ্ হবে। সেই হিসেবে তো আরবের সব মুসলমানেরই স্থান দোজখে নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। ইসলামধর্ম প্রচারের আগে আরবী তো পৌত্তলিকদেরই ভাষা ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পরও আরবীর রূপ বা বুৎপত্তি কিছুই পাল্টায় নি। পারসী অগ্নি-উপাসকদের ভাষা। কিন্তু পারস্যের মুসলমানরা এই ভাষা ত্যাগ করে নি। তাদের মহাকাব্য শাহনামা এই ভাষাতেই লেখা। সোহ্রাব-রুস্তম, শিরী-ফরহাদ পারস্য-লোক-কাহিনীর এই নায়ক-নায়িকরাও কেউ মুসলমান নন। তারা আমাদের প্রিয় হ'তে পারে আর সব দোষ বুঝি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চার বেলায়। হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের ভাষা ও সংস্কৃতি আর আমাদের সংস্কৃতি এক বলে? বাংলা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকল ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ভাষা। এখানে ধর্মের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? সংস্কৃতিকে 'তমদ্দুন' ভোরকে 'সোবেহ্ সাদেক' না বলাটা নাকি দোষের। সরকারের লোকেরা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে জোর ক'রে রাতারাতি ভাষা পাল্টে দেওয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায়ই যুগে যুগে ভাষার বিবর্তন হয়।

'ভাষা যেমন ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, তেমনি সংস্কৃতিরও অন্যতম

বাহন। পূর্বপাকিস্তানের বাংলাভাষীরা ঈদ, মহরম উদ্‌যাপন করে যে কারণে ঠিক সেই কারণেই 'পয়লা বৈশাখ' পালন করে। যেমন ইরানী মুসলমানরা আরবী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী নববর্ষ উদ্‌যাপন করে না, করে নিজেদের ঐতিহ্য নওরোজ অনুসারে। নওরোজ তাদের বসন্ত-উৎসবও বটে। নওরোজের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়ানো। এতে যদি তাদের মুসলমানত্ব খারিজ না হয়, তাহ'লে রবীন্দ্রসংগীত গাইলে, শ্যামা নৃত্যনাট্যে যোগ দিলে বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন ক'রলে আমাদের মুসলমানিত্বই-বা খারিজ হবে কেন?' শহীদভাই একটু থামলেন। তাকালেন শ্রোতাদের দিকে। সকলে স্তব্ধ হ'য়ে শুনছে শহীদভাইয়ের যুক্তিপূর্ণ কথা।

অশ্বত্থের পাতাগুলি মৃদু বাতাসে নড়ছে। নির্মেঘ আকাশ। ঘোড়-দৌড়ের মাঠটা ফাঁকা। আজ ঘোড়দৌড় নেই।

শহীদভাই আবার সুরু ক'রলেন, 'ধর্মীয় ভাষা বলে যেমন কিছু নেই, ধর্মীয় সংস্কৃতি বলেও কিছু নেই। যা আছে তা হ'লো ধর্মীয় প্রভাব। এক-এক দেশে এক-এক ধর্ম প্রচারিত হ'য়েছে এক-এক সময়। সেই-সেই ধর্ম সেই-সেই সময় সে-সমস্ত দেশের মানুষের উপর, তাদের ভাষা ও চালচলনের উপর প্রভাব রেখে গেছে। কিন্তু শুধু আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতির একটি অঙ্গ মাত্র। আরব, তুর্কী, ইরানীদের কথাই ধরা যাক্। এদের মিল অনেক। তবু ওরা তিনটি পৃথক্ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে যার যার ভৌগোলিক পরিবেশ, হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং ভাষাকে ঘিরে।

'আর একটা বিষয় বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ ক'রব। সামাজিক অবস্থা এবং পরিবেশ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে থেকে ছিলেন। সেই প্রতিবন্ধকতা আজ অনেকাংশে দূর হ'য়ে গেছে। আজ মুসলিম সমাজ-বিন্যাসে এসেছে নতুন শক্তি, শিক্ষিত,

মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হ'য়েছে, হ'য়েছে কলকারখানা—সেই সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণী। এই সামাজিক বিন্যাসে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও মমতা বাড়ছে, সংস্কৃতি-চেতনা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন পড়েছে নিজেদের ঐতিহ্য মূল্যায়নের। আজ দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনেই মাতৃভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতৃভাষার বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে জন্ম নিচ্ছে ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। পঞ্চাশ বছর আগে এটা সম্ভব ছিল না। কেন না আজ যাঁরা বাংলা লিখছেন, পড়ছেন, তাঁরা সে-সময় ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। রবীন্দ্রসাহিত্য পড়া দূরে থাকুক, রবীন্দ্রনাথের নামই তখন তাঁরা শোনেন নি। কিন্তু 'পয়লা বৈশাখে' শুভ হালখাতা বরাবরই হ'য়ে এসেছে। কাজেই সীমান্তের ওপার থেকে হিন্দুয়ানীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে—এটা কষ্টকল্পিত, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কী উদ্দেশ্যে সরকার এইসব প্রচারনা চালাচ্ছে তাই ভাববার দিন এসেছে আজ।' বক্তৃতা শেষ হ'লো। করতালিতে অভিনন্দন জানালো সকলে শহীদভাইকে। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন শহীদভাই। তাঁর আজকের ভাষণ শুনতে শুনতে আমার বার বার মনে হচ্ছিল গত বছর মুসলমান মেয়েদের কপালে টিপ দেওয়া, শাড়ি পরা, মাথায় ফুল গোঁজা নিয়ে খান, এ সবুর আর আবদুল মোনেম খান যে কটাক্ষ ক'রেছিলেন শহীদভাই তার চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শাড়ি যদি হিন্দুয়ানী হয়, তবে আচকানও হিন্দুয়ানী। কারণ নেহরুজী তা পরেন। কাজেই মোনেম খান সাহেবকেও তার পোশাক ছাড়তে হয়। সালোয়ার কামিজ তো পাঞ্জাবিদের পোশাক। আলখাল্লাও পরার জো নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ আলখাল্লা পরতেন। আর মাথায় ফুল গোঁজা বা কোনো প্রতিকৃতিকে মাল্যদান, বা কোনো অতিথিকে মাল্যদান করা যদি গুনাহ্‌র কাজ হয়, তবে তো আয়ুব-মোনেম-সবুররাই বড়ো পাপী। মাথায় ফুলের মালা গুঁজে মেয়েদের দিয়ে তাঁদের এবং তাঁদের মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করার রেওয়াজ তো তাঁরাই চালু ক'রেছেন।

শহীদভাইয়ের বক্তৃতার পর মঞ্চে আবৃত্তি ক'রতে উঠলেন শওকত হাফিজ খান। জেল থেকে ১লা বৈশাখে মাকে একজন রাজবন্দী চিঠি লিখেছেন। তারই কাব্যানুবাদ। কবিতাটি সে-দিনের 'সংবাদে'র নববর্ষের বিশেষ সংখ্যায় বেরিয়েছে। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে শওকত হাফিজ খান পড়ে চলেছেন :

'বার বার দেখি শুধু বাংলার মুখ,
এ মাটির মাঝে আছে অনাবিল সুখ
মা, এ গান এখনও আমরা গাই।
গেয়েছি।
—এ আমাদের অনল শপথ।
(জাহান্নমের অগ্নিতে যদিও আমরা জ্বলছি।)

বসন্ত বিমূঢ় এখানে। পলাশ কদম কর্তিত।
কোকিল পাপিয়ার গান
এখানে
স্বামী হারা যুবতীর
অথবা
পুত্র হারা জননীর বিলাপ।

আঁধারের মাঝে মোবা যেন এক-একটি অশরীরী মানব,
মৃত্যুর কফিনে জড়ানো আমরা কতগুলি গলিত শব।
নিয়ত আজরাইল আমাদের সংহার করে প্রাণ,
তাই তো পারি না দিতে তোমায় কোনো সজীব প্রতিদান।

এ চিঠি পেয়ে—
জানি তুমি কাঁদবে
কিন্তু মা, মহাকালের সিঁড়ি ভেঙে
একদিন আমাদের জয়সূর্য উঠবে।'

কবিতাটি পড়া শেষ হ'তেই আমার পাশ থেকে দুটি মেয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'অপূর্ব।'

আরও অনেকে বলবেন। আমায় আবার ছায়ানটের অনুষ্ঠানে যেতে হবে। ফুলার রোডের একটা স্কুলে হবে সে-অনুষ্ঠান। বাঙলা-একাডেমি থেকে বেরিয়ে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে ফুলার রোডে পড়লাম। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। গাছপালায় ছাওয়া ফুলার রোড ধরে নীরবে হাঁটতে বড়ো ভালো লাগছিল।

২৭ এপ্রিল। ফুলে ফুলে ভরে গেছে শেবে বাঙলার মাজার। হাঁজারো মানুষেব মৌন মিছিল আজ এসে থামছে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে। ফুল আর মালা হাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সকলে সাদামাটা মাজারটির দিকে। চাবটে খুঁটির ওপর কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে একচালাটা—অনাদৃত, অবহেলিত। মাজারের চারপাশ সবুজ ঘাসে ভরে উঠেছে। ওপরে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় আকাশ আলো ক'বে ফুটে আছে রাশি রাশি আগুন-রঙা ফুল। সারা বছর দোয়েল, শ্যামা, বেনে-বউ-এব বিশ্রম্ভালাপ ক'ববাব মতো নির্জন পবিবেশে বাঙালীর একান্ত আপনার জন হকসাহেব সমাহিত রয়েছেন। মেটে মাজারেব ওপব হাতেব ফুলগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে ভাবছিলাম

সালের এই দিনটিরই কথা।

দিনটা ছিল শুক্রবার। কয়েকদিন ধরেই আকাশ .থকে যেন আগুন ঝরছিল। দুপুরে দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে, গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ওই দিন কিন্তু সকালেই আকাশে দেখা গেল কালো মেঘের ছায়া। কেমন যেন বিষণ্ন বিষণ্ন লাগছিল দিনটা। অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। নিউজ ডেস্কে কে. জি. ভাই অর্থাৎ কে. জি. মোস্তাফা বসে মফস্বল রিপোর্ট দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। চীফ রিপোবটার শহীদুল হক ফোনটা ধরলেন। গুরুতর খবর নিশ্চয়ই। দেখলাম, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। একবার শুধু তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল, 'সত্যি!' ফোন রেখে আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

একটা গুমোট অস্বস্তিতে পরিবেশটা বিচলিত হ'য়ে উঠল, কী

হ'য়েছে শুনবার জন্য শহীদুল হক সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ধীরে ধীরে তিনি কষ্টে উচ্চারণ ক'রলেন, 'হকসাহেব আর নেই।' আমাদের সকলের মুখ থেকেই এক যোগে বিস্ময় বিস্ফারিত ক'টি কথা বেরুল, 'হকসাহেব নেই!' কে.জিভাই চমকে আমাদের দিকে ঘাড় ফেরালেন।

ছুটলাম মেডিকেল কলেজের দিকে। বিদ্যুৎ গতিতে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে, বোধ হয় শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গঞ্জে। কেউই খবরটা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না। পূর্ববাঙলার পাঁচ কোটি মানুষের হৃদয়ে হকসাহেব যে অমর। তিনি কি মরতে পারেন! হাজার হাজার মানুষ ছুটে চলেছে মেডিকেল কলেজের দিকে। প্যাণ্ট, পাজামা, ধুতি, লুঙ্গি একাকার হ'য়ে গেছে—যতদূর দৃষ্টি যায়, মাথা আর মাথা। জল ছল-ছল চোখে শুনছে তার মাইকের ঘোষণা।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে চলেছেন হকসাহেবের মৃত্যু-সংবাদ।

শতাব্দীর ইতিহাস হকসাহেব আজ আর নেই! ভিতরটা কান্নায় হু-হু ক'রে উঠছে।

অগ্রাণের রাত। মাঠে মাঠে সোনা-রঙ ধান। ঘাসে ঘাসে কুয়াসার পাতলা আস্তর পড়েছে। বরিশালের সাতুরিয়াতে জন্মালেন ফজলুক হক। সেটা ছিল ১৮৭৩ সাল। নিজেদের বাড়ি ছিল চাখারে। ছোটোবেলা থেকেই জীবনানন্দের রূপসী বাংলা ফজলুল হককে উন্মনা ক'রে দিত। বাংলার মাছ, পাখি, ঘাস, ফড়িং বড়ো ভালো বাসতেন কিশোর ফজলু। ধানের ক্ষেত, নদী, খাল তার মন টানত অহরহ। খালের জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাছ ধরে, বর্ষার টলটলে জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটে ঘরে ফেরে সে। বাবা ওয়াজেদ আলী রেগে মাকে বলতেন, 'ফজলুটাকে একদিন কুমিরে খাবে।' মা সাইদান্নেছা বলতেন, 'বালাই ষাট। কুমিরে খাবে কেন!

বড়ো হ'য়ে ফজলু আমার কুমির তাড়াবে।' কে. এম. দাশ লেনের বাড়িতে বসে হকসাহেব একথা বলেছিলেন তোয়াহাভাইকে। কথাটা আমার তোয়াহাভাইয়ের কাছেই শোনা।

তখন কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেন নি যে মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফজলুল হকের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর খাল কেটে যে-কুমির এনেছিল—ফজলুল হকের জীবনে সেই কুমির তাড়ানোই ছিল একমাত্র ধ্যান।

একসঙ্গে তিনটি বিষয়ে অনার্স নেওয়ার দুঃসাহস এবং তিনটিতেই প্রথম শ্রেণীতে পাশ করার কৃতিত্ব যাঁর, ইংরেজী নিয়ে এম.এ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতির মাঝখানে, মাত্র ছয়মাস আগে গণিতে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে যে-পাশ ক'রতে পারে, যেই ছাত্রের ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে আচার্য প্রফুল্ল রায়ও ছাত্রের বাসায় গিয়ে হাজির হন, তিনি পরবর্তী কালে বাঙলার কর্ণধার হবেন—এ তো স্বাভাবিক। শেরে বাঙলা ফজলুল হক ডিস্টিংশন সহ ল'পাশ ক'রে একদিন বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষানবিশী সুরু করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য বলেই না এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়েছিলেন ফজলুল হক।

১৯৪৩ সালের ফেবরুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিষদের অধিবেশনে মেদিনীপুরের ঘটনার উপর মূলতবী প্রস্তাব তোলা হ'লো। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সদস্যদের আশ্বাস দিলেন, ঘটনার তদন্ত করা হবে। স্বভাবতই ইংরেজ গভর্নর হার্বার্ট চাইছিলেন না সেই রোমহর্ষক ঘটনার তদন্ত হোক। তিনি হকসাহেবের আচরণ সম্পর্কে কৈফয়ত তলব ক'রলেন। হকসাহেবের ব্যক্তিত্বে ঘা লাগল। তিনিও কড়া ভাষায় তার জবাব দিলেন, 'আপনার ৫ ফেবরুয়ারি তারিখের পত্রের জবাবে আপনাকে জানাচ্ছি, আপনার সঙ্গে আলোচনা ছাড়া সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় আপনি আমার আচরণের যে কৈফয়ত তলব ক'রেছেন, সেই কৈফয়ত দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি না।

কিন্তু আপনাকে আমার নিশ্চয়ই সতর্ক ক'রে দেওয়া প্রয়োজন যে, চিঠিতে আপনি যে-অভদ্র ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন, ভবিষ্যতে গভর্নর ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানে তা পরিহার করার কথা মনে রাখবেন।

'শনিবার থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রেছি। তাঁরা জানতেন যে, আমরা তদন্তের পক্ষপাতী। কী ক'রে আমি বিশ্বাস ক'রব যে, সকল মহল থেকে তদন্তের দাবি উঠবে—এমন একটি নিশ্চিত বিষয় আপনি জানতেন না। আমাকে আপনি ডেকে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তাও করেন নি। আপনি আপনার কর্তব্যপালনে অবহেলা ক'রে এখন আমাকে দায়ি ক'রছেন যে, আমি একটি অননুমোদিত সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রেছি। পরিষদের দায়িত্বশীল সদস্যরা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা তদন্ত-অনুষ্ঠানের বিরোধীতা কেউ করেন নি, এমন কি ইউরোপীয় সদস্যেরাও নন। এ-অবস্থায় তদন্ত-অনুষ্ঠানের দাবি মেনে নেওয়াই আমার উচিত বলে মনে হ'য়েছে।

'আপনার চিঠি দেখে মনে হ'চ্ছে, তদন্ত-কমিটী গঠনে অনুমতি দিতে আপনি নারাজ। যদি তাই হয়, তাহ'লে পরিষদে আমাকে বিবৃতি দিতে হবে যে, আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছি না, কেন রাখতে পারছি না তা ব্যাখ্যা করবার জন্য আপনার চিঠিটা পরিষদে অবশ্যই পড়ে শোনাতে হবে আমাকে।

'আজ সকাল দশটায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা ছিল। ইতি মধ্যেই আপনার প্রাইভেট সেকরেটারিকে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার সঙ্গে আমার দেখা করা সম্ভব হবে না। কারণ আপনি চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন, তার উপযুক্ত সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে কোনো লাভ হবে না।'

এই আত্ম-সম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্বের পাঠ যে তিনি আশুতোষের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন। আশুতোষ চেয়েছিলেন, ফজলুল হক স্বাধীন ব্যবসা করুক, দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করুক। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে সরকারি চাকুরিতে যোগ দিলেন হক-সাহেব। অনেক আশা করেন আশুতোষ ফজলুল হকের কাছে। তাঁর এই চাকুরি নেওয়ায় তিনি ব্যথিত হ'লেন। সরকারি চাকুরিতে থাকা কালে একদিন ফজলুল হক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলেন। ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনে তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কিহে, কেমন চলছে আজকাল? আরামেই আছ বোধ করি।'

স-সঙ্কোচে ফজলুল হক জবাব দিলেন, 'এই এক রকম চলে যাচ্ছে স্যার। কাজটা বড্ড এক ঘেয়ে এই যা। ফাইলের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয় সারা সময়।'

'তা দুঃখ ক'রছ কেন, ওটাই তো গোলামীর আনন্দ। তারপর একটু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'বার বার তোমায় বললাম তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, কিন্তু শুনলে না।

'কী করি স্যার, মাসের শেষে এক সঙ্গে '

'ভেবে আশ্চর্য হই যে তোমদের মতো ছেলেরা কী ক'রে টাকায় বিকিয়ে যাও? পৃথিবীতে খাওয়া-পরার জন্য টাকার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু টাকাই কি সব? না-না আমি চাই না ওরা এদেশের মাথা মাথা ছেলেদের কিনে নিক।'

ফজলুল মাথা নত ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কি, জবাব দাও।'

'কিন্তু স্যার....'

'কী? টাকা। যাও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে চলো এসো। হাইকোর্টে ওকালতি সুরু কর। যতদিন পশার জমাতে না পার, মাসে যা খরচ লাগে আমি দেব।' উত্তেজিত ভাবে চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার আশুতোষ। সশব্দে হাতের মোটা বইটি রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর কয়েক মুহূর্ত উত্তেজিত ভাবে পায়চারি ক'রতে ক'রতে সবেগে কক্ষান্তরে প্রবেশ ক'রতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ শোন, আমি স্পষ্টই তোমাকে বলে দিচ্ছি, একান্তই যদি তুমি গোলামীর মায়া ছাড়তে না পার, আর কখনো এসো না এখানে। বুঝব, তোমার মৃত্যু হ'য়েছে।'

কতো দুঃখে যে আশুতোষ শিষ্যের প্রতি এই মর্মান্তিক বাক্য নিক্ষেপ ক'রছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন হকসাহেব। গোলামীর মায়া কাটিয়ে তিনি ফিরে গেলেন কলকাতায়। হাইকোর্টে ওকালতি সুরু ক'রলেন। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে দক্ষ এ্যাডভোকেট হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। রাজনীতির আসরেও গড়ে উঠতে লাগল তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ।

১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হ'লেন। নিখিল ভারত জয়েন্ট সেকরেটারির দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হ'লো।

তিনিই ১৯০৫ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে আহ্‌সান মঞ্জিলে বসে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলে রূপ দিয়েছিলেন মুসলিমলীগের।

দিনের পর দিন সারা ভারত ঘুরেছেন। এক নেতার কাছ থেকে আর নেতার কাছে গিয়েছেন। জানিয়েছেন ঢাকা সম্মেলনে যোগদানের কথা। গিয়েছেন বোম্বাইতে জিন্নাহ্‌র কাছে। জিন্নাহ্‌ তখন কংগ্রেসে।

বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্যাণ্ডেলে সম্মেলন বসল। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে ডেলিগেট এসেছেন। জন্ম নিল 'নিখিল ভারত মুসলিমলীগ।' স্যার সলিমুল্লাহ্‌র স্বপ্নকে বাস্তবায়িত ক'রলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। মুসলিমলীগ সম্মেলনেই ফজলুল হকের মধ্যে ভবিষ্যত নেতৃত্বের স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন আসাম

পূর্ববঙ্গ সংযুক্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড। স্যার ব্যামফিল্ড তখন রাজধানী ঢাকায়। গভর্নর হাউসে ডেকে পাঠালেক ফজলুল হককে। চায়ের আসরে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিতে সাধলেন। রাজী হ'য়ে গেলেন ফজলুল হক। ব্যামফিল্ডও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন এমন একজন লোককে রাজনীতি থেকে দূরে সরাতে পেরে।

চাকরি ছেড়ে আবার মুসলিমলীগে ফিরে এলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আবার গেলেন জিন্নাহ্‌র কাছে। এবারে তাঁর অভিযান সফল হ'লো। জিন্না কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিমলীগে যোগ দিলেন।

বোম্বাই থেকে ফিরে দেখেন, নবাববাহাদুর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন-পরিষদের ঢাকা বিভাগীয় শূন্যপদে উপনির্বাচন হবে। স্যার সলিমুল্লাহ্‌র ইচ্ছা, এই নির্বাচনে হকসাহেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে হক সাহেবের এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধেও তিনি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং জিতেও ছিলেন। এরপর বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের ইলেকশনেও জিতলেন। পরিষদের সদস্যও হ'লেন তিনি। ১৯২৪ সালের পয়লা জানুয়ারি অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হলেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী ফজলুল হকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হ'লো কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ, নিজের গ্রামে চাখার কলেজ, প্রতিষ্ঠা ক'রলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ এবং এমনি আরও অনেক স্কুল-কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনিই প্রথম বাঙালী প্রিন্সিপাল নিয়োগ ক'রেছিলেন।

মন্ত্রীত্ব যাবার পর হকসাহেবের অর্থাভাব দেখা দেয় খুব। মন্ত্রীত্ব থাকা কালে তাঁর এক বন্ধু কেশরাম পোদ্দারের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন ব্যবসার জন্য। হকসাহেব হ'য়েছিলেন তার জামিন। বন্ধুর ব্যবসা ডুবল। কেশরাম পোদ্দার তখন

হকসাহেবের কাছে টাকা দাবি ক'রলেন। হকসাহেবের তখন টাকা শোধ দেবার অবস্থা নয়। একটু সবুর ক'রতে বললেন। কিন্তু কেশরাম শুনতে নারাজ। আদালতে মামলা দায়ের ক'রল সে। আদালতের কাছে কেশরাম দাবি জানাল, টাকা দিতে না পারলে যেন তাঁকে দেউলে ঘোষণা করা হয়। দেউলে ঘোষণার অর্থ, হকসাহেবকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে হবে রাজনীতি থেকে। কারণ, তখন আইন ছিল, দেউলেদের রাজনীতি করার অধিকার নেই।

বিচারের দিন কোর্টে লোকে লোকারণ্য। খবর পেয়ে দেশবন্ধু ছুটে এলেন। এসে কেশরামকে বললেন, 'পোদ্দার, হক সাহেবকে দেউলে ঘোষণা ক'রলে কি তুমি তোমার টাকা পাবে ?

কেশরাম পোদ্দার মাথা চুলকিয়ে বলেন, 'কী করি স্যার ? টাকা না পাই, মনে একটা সান্ত্বনা তো পাব।'

'না, তা হয় না পোদ্দার। তুমি মোকদ্দমা তুলে নাও। হক-সাহেব তোমার টাকা রাখবেন না। তবে এতগুলো টাকা, তোমাকে আস্তে আস্তে নিতে হবে।

'আপনি বলছেন টাকা দেবে ?'

'কেন, হক সাহেব কি বলেছেন টাকা দেবেন না ?'

'না স্যার, তা নয়, তবে'—

'হ্যা, আমি বলছি, মোকদ্দমা তুমি তুলে নাও। উনি টাকা না দিলে আমি তোমায় দেব।' দৃঢ়কণ্ঠে দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বললেন কথাগুলো।

কেশরাম পোদ্দার মোকদ্দমা তুলে নিলেন। দেশবন্ধু এগিয়ে না এলে হক সাহেবের রাজনীতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত সেদিনই। অথচ ইংরেজী-শিক্ষা বর্জন নিয়ে ঢাকা আর্মানিটোলা ময়দানে এই হকসাহেবের সঙ্গেই চিত্তরঞ্জন দাশের মতানৈক্য হ'য়েছিল।

হকসাহেব দেশের মানুষেব কাছে এতো প্রিয় ছিলেন কেন? তিনি যে ছিলেন দরিদ্রেব, নির্যাতিতের বন্ধু। একদিন ববিশাল থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। বাস্তায় এক জায়গায় দেখলেন বহু লোকের ভিড়। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি ছেলের বুকফাটা কান্না ভেসে আসছে। হকসাহেব প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ মারা গেছে বোধ হয়। তবু তিনি ভিড়েব ভিতর দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখলেন, নীল কালো পোশাক পরা এক চৌকিদাব ধমকাচ্ছে একটি ছেলেকে। চৌকিদারদের পাশে আদালতের পেয়াদা দাঁড়িয়ে। ছেলেটার বুড়ো বাপ গামছায় চোখ মুছছে ঘন ঘন। ঘরের মধ্যেও শোনা যাচ্ছে কোনো নাবীব চাপাকণ্ঠে কান্নাব শব্দ।

উঠোনে কিছু মালপত্তর। শিলনোড়া থেকে পিঁড়ি অর্থাৎ গরিব চাষীব সর্বস্ব। ছেলেটি একটি কাঁসার থালা বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'এটা আমাব আমার, এটা আমি দিমু না। কিছুতেই না।'

'না দেবে না! মামাবাড়ির আব্দার আর কি!' বলে চিলের মতো ছোঁ মেরে ছেলেটার কাছ থেকে থালাটি কেড়ে নিল চৌকিদার।

মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল ছেলেটা।

হকসাহেব বুঝলেন, খাজনার দায়ে মাল ক্রোক ক'রছে জমিদার। নায়েবকে ডেকে মালক্রোকি দাবির পাই পয়সা অবধি মিটিয়ে দিলেন তিনি। তারপর থালাটি তুলে দিলেন ছেলেটির হাতে। থালা পেয়ে তার দুই চোখে খুশি উপচে পড়ল। কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধের চোখে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।

হকসাহেব প্রায়ই বলতেন, এই ঘটনাটিই পরবর্তীকালে তাঁকে কৃষক-আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়। ১৯২৬ সালে ঢাকার মাণিক-গঞ্জে কৃষক-প্রজা আর জমিদারে বিরোধ দেখা দিল। জমিদাররা দেনার দায়ে কৃষকদের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রজাদের সম্মেলন ডাকা হ'লো। হকসাহেবকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'লো সভাপতিত্ব করার জন্য। ঢাকা, টাঙ্গাইল, পাবনা—দূর দূর অঞ্চল থেকে

লক্ষাধিক কৃষক-প্রজা হাজির হ'লো সে সম্মেলনে। সভায় তিনি ঘোষণা ক'রলেন, চাষীরা যেন কোনো মহাজনের জমি আবাদ না করে। হকসাহেব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বললেন, 'দয়া ক'রে জমি যখন নিয়েছে এবারে লাঙল চষুক, মাঠে নেমে ফসল বুনুক, ফসল ফলাক, ফসল কাটুক।'

কৃষকরা সাড়া দিল তাঁর ডাকে। বন্ধ রইল চাষাবাদ। বছর ঘুরে যায়। জমিদারের অনেক ক্ষতি হ'য়ে যাচ্ছে। শেষে বাধ্য হ'য়ে জমি ফেরত দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আপোস-রফা ক'রলেন তাঁরা। আন্দোলনের সফলতা তাঁকে আরও উৎসাহিত ক'রল। কৃষক-প্রজাদের নিয়ে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে একটা রাজনৈতিক পার্টি গঠন ক'রলেন তিনি। নাম রাখা হ'লো 'বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি'। নতুন পার্টি ক'রলেও হকসাহেব তখনো মুসলিমলীগ ছাড়েন নি।

১৯৩০ গোলটেবিল বৈঠক বসবে লণ্ডনে, বাকিংহাম প্রাসাদে। লণ্ডনে যাওয়ার আগে কলকাতার বেনেপুকুর লেনের বাসায় মিলাদ মহফিলের হ'লো। আট-দশজন মৌলানাও হাজির হ'য়েছেন। মিলাদ শেষে হকসাহেব আব্বাসউদ্দীনকে গাইতে বললেন। হারমনিয়াম আনা হ'লো। মৌলবীরা চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ওটা দি'য়ে কী হবে সাহেব?'

হকসাহেব হেসে বললেন, 'এতক্ষণ আপনাদের মিলাদ পড়া শুনলাম। এবার আব্বাসের গলায় একটু মিলাদ-পড়া শুনব।'

'না পাক নাপাক' বলে মৌলবীরা চীৎকার ক'রে উঠলেন।

হকসাহেব তখন বললেন, 'কারু আপত্তি থাকলে তিনি যেতে পারেন।'

মৌলবীরা দরজায় সবে পা দিয়েছেন, এমন সময় আব্বাসউদ্দীন সুরু ক'রলেন নজরুলের গান :

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু-পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।'

সুরের মূর্চ্ছনায় হকসাহেব তন্ময় হ'য়ে গেছেন, হয়তো তার মন তখন চলে গেছে ধু ধু বালুর দেশ আরবে—মক্কা-মদিনায়।

মৌলবীরা কিন্তু দরজা পেরোতে পারলেন না। গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থাণুর মতো। ফিরে এসে গুটি গুটি বসে পড়লেন আসরে।

গান শেষ হ'লে হকসাহেব বললেন, 'কী, এ-গান কি না-জায়েজ?'

লজ্জিত হ'লেন মৌলবীরা।

হকসাহেব বললেন, 'দেখুন যা জানেন না—তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না কখনো। না জেনেশুনে কথায়-কথায় ধর্মের ফতোয়া দিয়ে দিয়ে মুসলমানদের আব ক্ষতি ক'ববেন না—আপনাদের কাছে এই অনুরোধ।'

সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামি হকসাহেবের মন কখনো স্পর্শ ক'বতে পারে নি।

মুসলিমলীগ তো নাইট-নবাব, জমিদার-মহাজনদের সংগঠন। দরিদ্র চাষীদের স্থান কোথায় সেখানে! হকসাহেবের কৃষক-প্রজা আন্দোলনে তাঁরা যে তাঁদের মৃত্যু-পরোয়ানা দেখতে পাচ্ছেন। মুসলিমলীগ থেকে সরে এলেন তিনি। 'কৃষক-প্রজা' দল সংগঠনে উঠে পড়ে লাগলেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক'রে হকসাহেব সেই সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলেন না। চক্রান্ত ক'রে সরানো হ'লো তাঁকে সেখান থেকে।

হকসাহেব আবার 'কৃষক-প্রজা পার্টি' গড়া সুরু ক'রলেন নতুন উদ্যমে। ঢাকা ময়মনসিং বরিশাল রাজসাহী—সর্বত্রই তাঁর পার্টি গঠিত হ'লো। পাশে এসে দাঁড়ালেন আবু হোসেন সরকার, পীর বাদশা মিয়া, সৈয়দ নওশের আলী, আসরাফউদ্দীন চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক আইন-পরিষদের নির্বাচন এসে গেল।

পটুয়াখালি কেন্দ্রে খাজা নাজিমউদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ক'রলেন হকসাহেব। নিজের জমিদারিতে অঢেল টাকা ঢেলেও নাজিমউদ্দীন হকসাহেবের কাছে হেরে গেলেন। ইলেকশনে মুসলিমলীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি প্রায় সমান সমান আসন পেল দুই দলের কোয়ালিশন ছাড়া মন্ত্রীত্ব গঠন অসম্ভব। আপোস রফা শেষে একটা হ'লো। ১১জন সদস্য নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো; হকসাহেব হ'লেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রীর দফতরটা কারু হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলেন না তিনি। নিজের হাতেই রাখলেন সে-দফতর। বাঙলা দেশে গরিব ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষালাভ যে কতো কষ্টসাধ্য তিনি তা ভালো ক'রেই জানতেন।

হকসাহেব কতো গরিব ছাত্রকে যে পরীক্ষাব ফিস দিয়েছেন, কতো কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে সাহায্য ক'রেছেন তাব ইয়ত্তা নেই। তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে কেউ ফিরত না। জাতিধর্ম নির্বিশেষেই তিনি সাহায্য ক'রতেন।

রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে হকসাহেব সাহিত্যানুরাগের পরিচয়ও দিয়েছেন। তারই চেষ্টায় 'নবযুগ' পত্রিকা বের হয়, যার সম্পাদক ছিলেন নজরুল ইসলাম এবং কমরেড মুজাফ্‌ফর আহম্মদ চৌধুরী।

একবার এক আসরে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন তিনি। ধর্মতলায় ওয়াছেল মোল্লার দোকানের দোতলায় ঈদপ্রীতি সম্মেলন হ'চ্ছে। হকসাহেব গিয়েছেন প্রধান-অতিথি হ'য়ে। নজরুল আর আব্বাউদ্দীনের গানে মেতে উঠলো আসর। হঠাৎ নজরুল তাকিয়ে দেখেন পাশের লোকটির পিঠে এক টুকরো কাগজ রেখে হকসাহেব যেন কী লিখে চলেছেন। লেখা শেষে হক-সাহেব নজরুলের দিকে চেয়ে বললেন, 'বলতে পার কাজী কী লেখেছি ?'

'কী, কবিতা-না গান ?'

'যদি বলতে পার, মিষ্টি খাওয়াব।'

নজরুল হেসে বললেন, 'আপনি মিষ্টি খাওয়ালে ডালভাত খাওয়াবে কে আমাদের ?'

হাসির হুল্লোড় পড়লো আসরে।

হকসাহেবও হাসতে হাসতেই বললেন, 'কবিতা। পারলে না তো।'

নজরুল হুমড়ি খেয়ে পড়লেন টুকরো কাগজটার ওপর। পড়ে বিস্ময়ে আনন্দে বলে উঠলেন, 'চমৎকার কবিতা তো। আপনি কবিতা লেখেন না কেন।'

'তাহলে মন্ত্রীত্ব ক'রবে কে ? আর তোমরাই বা লিখবে কী ?' হকসাহেবের রসিকতায় আবার হাসির লহরা উঠলো আসরে।

সময় পেলেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধুর সান্নিধ্য উপভোগ ক'রতেন তিনি।

লাহোরে যারা 'গো ব্যাক ফজলুল' বলতে এসেছিল তারাই 'শেরে বাঙাল জিন্দাবাদ' বলে শোভাযাত্রা ক'রে সভামঞ্চে নিয়ে গেল তাঁকে। এমনিই ছিল তাঁর কথাব জাদু। তাঁর বক্তৃতায় মানুষ অন্য রকম হ'য়ে যেত।

মুসলিমলীগ সম্মেলনে 'লাহোর রেজুলেশন' পাঠ ক'রতে সাহস পাচ্ছেন না কেউ। হকসাহেব উঠে দৃঢ় স্বরে পড়ে গেলেন 'লাহোর প্রস্তাব।' কোনো গণ্ডগোল হ'লো না।

হকসাহেব আবার লীগে এলেন। কাজ হাসিল হ'তেই লীগের ওপরতলার নেতারা হকসাহেবের বিরুদ্ধে আবার চক্রান্ত সুরু ক'রলেন। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশের সমর-পরিষদে যোগ দেওয়া নিয়ে জিন্নাহ্‌র সঙ্গে ফজলুল হকের ফের মতবিরোধ হ'লো। হকসাহেবের বিরুদ্ধে জিন্নাহ্‌ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। শেষ পর্যন্ত হকসাহেব সমর-পরিষদ ছাড়লেন, সেই সঙ্গে মুসলিমলীগও ছাড়লেন চিরতরে।

হকসাহেবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাও ভেঙে গেল। মুসলিম-

লীগকে বাদ দিয়ে তিনি অন্য সব দল নিয়ে 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল' ক'রলেন। কয়েক মাস বাদেই গভর্নর হার্বাটের সঙ্গে তাঁর সংঘাত সুরু হ'লো 'পোড়ামাটি নীতি' কার্যকরী করা নিয়ে। ফলে গদী হারালেন তিনি। সেই জায়গায় এলেন নাজিমউদ্দীন। সমর পরিষদের নির্দেশ মতো নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা 'পোড়া-মাটি' নীতি কার্যকরী ক'রতে উঠেপড়ে লেগে গেলেন। কারণ, জাপানীরা যে তখন ঘরের দরজায় এসে গেছে—আর বসে থাকা চলে না।

জরুরি অবস্থা। সরকারি টাকশালে ছাপা হচ্ছে দেদার নোট। ছড়িয়ে দিচ্ছে সে-সব নোট কনট্রাকটরদের হাতে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে খাদ্যশস্য এনে মজুত ক'রতে হবে সরকারি গুদামে। তারপর তা পাচার ক'রে দিতে হবে গঙ্গার পশ্চিমে—একেবারে বাঙলাদেশের বাইরে।

হকসাহেব বুঝলেন, এর পরিণতি কী? দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি। নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনেই খাদ্যশস্য মজুতের পরিণাম সম্পর্কে হকসাহেব হুঁশিয়ারী শোনালেন: এমন দুর্ভিক্ষ এদেশে ঘনিয়ে আসছে যে ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের চেয়েও তা হবে সর্বনাশা এবং ভয়ঙ্কর। বাঙলায় যদি দুর্ভিক্ষ হয় তাহ'লে এখানে বিপ্লব অবধারিত—যে-বিপ্লব ঘটেছিল রাশিয়ায়, পূর্ব গোলার্ধের এই সুদূরবর্তী অঞ্চলেও তা ঘটতে বাধ্য। যাঁরা এই দুর্ভিক্ষকে ডেকে আনছেন, আমরা যদি বেশি দিন সেই মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় থাকতে দিই, তাহ'লে তাদের কুকার্যের তালিকা আরও দীর্ঘ হবে।

হকসাহেবের* আশঙ্কাই সত্যি হ'লো। 'পোড়া মাটি' নীতি কার্যকরী করার ফলে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 'মাগো একটু ফ্যান দিবেন' চীৎকারে শহরগুলোর আবহাওয়া বীভৎস হ'য়ে উঠল। গ্রামকে গ্রাম উজার হ'য়ে গেল। ৫০ লক্ষ লোক প্রাণ হারালো সেই দুর্ভিক্ষে। কনট্রাকটর আর কালোবাজারীদের মুনাফা হ'লো

১৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র ৩০০ টাক'র জন্যে এক-একটি মানুষকে না খাইয়ে মেরেছে ওরা।

• দেশ ভাগ হ'লো। হকসাহেব তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন ঢাকায়। নাজিমউদ্দীন হ'লেন পূর্ব বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী। মুসলিমলীগের দাপটে কয়েকটা বছর হকসাহেব রাজনীতি থেকে প্রায় নির্বাসিত হ'য়েই রইলেন।

মুসলীমলীগের তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের ফলে ১৯৫০ সালে পূর্বপাকিস্তানে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধল। পূর্বপাকিস্তানকে শোষণ এবং পাকিস্তান থেকে ধীরে ধীরে হিন্দুদের তাড়ানোই ছিল মুসলিমলীগের দুইটি মূল-নীতি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকায় প্রথম অসাম্প্রদায়িক অরাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হ'লো। নাম—'পূর্বপাকিস্তান যুবলীগ।' যুবলীগ ভাষা-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। সে-সময় পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান। নাজিমউদ্দীন তখন কায়েদ-ই-আজমের শূন্যপদ পূরণ ক'রে গভর্নর জেনারেল হ'য়েছেন। '৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী আততায়ীর হাতে মারা গেলেন নাজিমউদ্দীন তখন পাঞ্জাবিতনয় গোলাম মহম্মদকে গভর্নর জেনারেল-এর পদটি ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর আসনে নেমে এলেন।

১৯৫৩ সালের গোড়ায় কৃষকনেতা হাজী দানেশের নেতৃত্বে প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠিত হ'লো। নাম—'পূর্বপাকিস্তান গণতন্ত্রী দল।' ঢাকা আরমানিটোলা ময়দানে ওই দলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো। গণতন্ত্রীদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সাহেব হকসাহেবকে শোনা'লেন নতুন দলের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য। কর্মকর্তাদের নামও বললেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে রফিকুল ইসলাম সাহেব নিজের নাম বলতেই হকসাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুই যার ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেটা

আবার একটা দল নাকি ? তবে হ্যাঁ, একটা মানুষ আছে বটে তোদের দলে, হাজী দানেশ।'

সারা দেশ তখন মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে। রোষে ফেটে পড়ছে ; দাবি উঠছে সাধারণ নির্বাচনের। পাকিস্তান হবার পর ছয় বছর কেটে গেছে, নির্বাচনের নামগন্ধ নেই। এতদিনে একটা শাসনতন্ত্র পর্যন্ত রচিত হয় নি !

করাচির প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রও সে-সময় বেশ জমে উঠেছে। গোলাম মোহম্মদ রাতারাতি নাজিমউদ্দীনকে সরিয়ে ওয়াশিংটন থেকে বগুড়ার মোহম্মদ আলীকে এনে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসালেন। পার্লামেণ্টে অধিবেশন হ'লো না, অনাস্থা প্রস্তাব উঠল না। অথচ নাজিমউদ্দীন গদী হারালেন।

এদিকে সাধারণ নির্বাচনের দাবি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শেষে নির্বাচন ক'রতে রাজী হ'লেন। এই সময় শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের জন্যও একটি কমিটী হ'লো। কমিটী রিপোর্ট দিল যে, উর্ধ্ব পরিষদ গঠিত হবে প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। নিম্ন এবং উর্ধ্ব—দুই পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাশ হবে বাজেট। তার অর্থ দাঁড়ালো সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসন কাঠামোয় পূর্বপাকিস্তানীদের কোনো ভূমিকাই থাকছে না। পূর্বপাকিস্তানীরা এই রিপোর্টের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সুরু ক'রলো। শেষে বাতিল হলো ওই রিপোর্ট। আবার প্রস্তুত হ'লো নতুন রিপোর্ট। এবারের রিপোর্টে অবশ্য বলা হ'লো জাতীয় পরিষদে পূর্বপাকিস্তানের আসনসংখ্যা পশ্চিম-পাকিস্তানের সমানই হবে। কিন্তু জনসংখ্যা অনুপাতে সদস্য বণ্টনে রাজী হ'লো না তারা কিছুতেই।

নির্বাচন এসে গেছে ! ছাত্ররা চায় মুসলিমলীগকে হটাতে। তারা বুঝল, মুসলিমলীগের সঙ্গে লড়াই ক'রতে পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে এক হ'তে হবে। যুক্তফ্রণ্ট করার কথা

উঠল। কিন্তু আসন রফা কিছুতেই হয় না। শেষে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ছাত্রদের চাপে পড়ে একুশ দফার ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, আওয়ামীলীগ, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে গঠিত হ'লো যুক্তফ্রন্ট। দলের নেতা হ'লেন মৌলানা ভাসানী, ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

জনসাধারণের দরবারে যুক্তফ্রন্ট নেতারা 'একুশ দফার' ওয়াদা ঘোষণা ক'রলেন। তাঁরা বললেন, নির্বাচনে জিতলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ক'রবেন, ভূমিহীন কৃষকদের উদবৃত্ত জমি দেবেন, এবং খাজনা হ্রাস ক'রবেন, চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থাও ক'রবেন, কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন ক'রবেন। তাদের অন্যান্য ওয়াদা ছিল, পূর্বপাকিস্তানকে শিল্পে ও কৃষিতে স্বাবলম্বী করা, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কালা কানুন বাতিল, নিম্ন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো, জননিরাপত্তা আইন ও অরডিন্যান্স বাতিল, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, বিচার ও শাসন বিভাগকে পৃথক্ করা শহীদ-মিনার নির্মাণ করা, নৌবাহিনীর হেড কোয়ারটার পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন করা, ২১ ফেবরুয়ারি ছুটি ঘোষণা ইত্যাদি। হক-ভাসানীর বক্তৃতায় সারা পূর্ববাঙলায় সারা পড়ে গেল। যেখানেই যান, অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পান হক-ভাসানী।

যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তায় মুসলিমলীগ ভীত হ'য়ে পড়লো। কিন্তু তখন আর নির্বাচন বন্ধ রাখার উপায় নেই। নির্বিচারে যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের আটক ক'রলেন লীগ-সরকার। চৌদ্দ হাজার কর্মীকে আটক রেখেও কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। শোচনীয় ভাবে মুসলিমলীগ হেরে গেলো নির্বাচনে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো। হকসাহেব হলেন তার মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথমে নিজের দলের কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রলেন তিনি। বাঙালীর একান্ত আপনারজন হকসাহেব পূর্ববাঙলার কর্ণধার হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও খুশি হ'য়েছিলেন সেদিন। কলকাতায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। হকসাহেব সাড়া দিলেন সে ডাকে। ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটায় ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজের একটি বিমানে এসে পৌঁছলেন তিনি দমদমে। সাত দিন ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হ'লো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দেন তার মর্মার্থ হ'লো: রাজনৈতিক কারণে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হ'লেও বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালীত্বের যে একটা নিজস্ব ধারা আছে, দুই বাঙলায় তা প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সে দিক থেকে বাঙালীকে কোনো শক্তিই দ্বিখণ্ডিত ক'রতে পারবে না।

৩ মে স্টেটসম্যান হেডিং দিলো: Huq hopes to end artificial barrier.

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি জানালেন, ভিসা প্রথা বিলোপ এবং দুই বাঙলার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করার চেষ্টা ক'রবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় লীগনেতারা হক মন্ত্রিসভাকে সুনজরে দেখেন নি গোড়া থেকেই। কলকাতায় হকসাহেবের ওইসব বক্তৃতা তাঁকে অপসারণের সুযোগ এনে দিল। হকসাহেবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হ'লো। অবিভক্ত বাঙলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক স্বাধীন পূর্ববাঙলায় হ'লেন কিনা বিশ্বাসঘাতক! আর কথাটা বললেন কিনা বগুড়ার ছেলে মোহাম্মদ আলী। আশ্চর্য!

করাচির কর্তারা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করার সুযোগ খুঁজছিলেন। পেয়েও গেলেন পর পর কয়েকটা অজুহাত। হকসাহেব তাঁর মন্ত্রিসভায় একটা পররাষ্ট্র দফতরও সৃষ্টি ক'রেছিলেন।

পূর্বপাকিস্তান কি আলাদা হ'তে চাইছে। না হ'লে পররাষ্ট্র দফতর কেন?

করাচি থেকে প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বার্তা এলো। জানতে চেয়েছে পূর্বপাকিস্তানে পররাষ্ট্র দফতর কী প্রয়োজনে?

বার্তা পেয়ে হকসাহেব রাগে উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপছেন অবিভক্ত বাঙলার জাঁদরেল গভর্নর হার্বাটকে পর্যন্ত যিনি কৈফিয়ত দেন নি তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইছে গোলাম মোহাম্মদ। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় কোথায় ছিল গোলাম মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলীর দল। সেক্রেটারিকে জবাব দিতে বললেন ছু'এক কথায়—প্রয়োজন আছে, ক'রেছি। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যই এই দফতর।

বার্তা পেয়ে করাচির কর্তারা আরও রেগে গেলেন। পারলে এই মুহূর্তে খারিজ করেন মন্ত্রিসভা। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের পিছনে যে আছে সাড়ে চার কোটি মানুষ। তাদের কথা ভেবেই কর্তারা অন্যপথ ধরলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর ডাইরেক্ট এ্যাকশানের পথ ধরে উত্তেজিত ক'রে তুললেন আদমজীর অবাঙালী শ্রমিকদের। তারা ছোরা আর পেট্রোল নিয়ে আক্রমণ চালাল বাঙালী শ্রমিকদের ব্যারাকে।

কী, এতো বড়ো আস্পর্ধা! বাঙলাদেশে বসে বাঙালী শ্রমিকদের ওপর হামলা। রুখে উঠল বাঙালী শ্রমিকরাও। দাঙ্গা বেঁধে গেল দুই দলে।

আদমজী জুট মিল এমন দুর্গ বিশেষ যে দিন কয়েক তো সে খবর বর্হিজগতে পৌঁছলই না। শেষে খবর পেয়ে মুজিবর রহমান ভ্যান ভ্যান পুলিশ নিয়ে গেলেন সেখানে। ছুটে এলেন মৌলানা ভাসানী। তিনি যে বাঙালী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। তাঁরা গিয়ে দেখলেন কংক্রিটের রাস্তায় চাপ চাপ তাজা রক্ত। মৃত দেহ পড়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছুরির আঘাতে ফেঁসে গেছে ভুঁড়ি।

ভিতরের পুকুরটা লাশে গাদা হ'য়ে গেছে। শ'য়ে শ'য়ে নয়, হাজার হাজার শ্রমিক মারা গেছিল সে দাঙ্গায়।

কেউ জানে না কতো হাজার। লক্ষ্যার জলে ভেসে গেছে কতো হতভাগ্যের দেহ। গোলাম মোহাম্মদ আর মোহাম্মদ আলীর ষড়যন্ত্রের বলি ওরা।

দৃঢ়হাতে মুজিবর রহমান অবস্থা আয়ত্তে আনলেন। তাতে কী? অযোগ্যতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করলেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। জারি ক'রলেন ৯৩ ধারা। গ্রেপ্তার ক'রলেন আতাউর রহমান, মুজিবর রহমান, আজিজুল হক প্রমুখকে। কেন্দ্রের কর্তাদের ভয়, তাঁরা বাইরে থাকলে তাদের সব জারিজুরি যাবে ভেস্তে। ঢাকায় কে. এম. দাস লেনের বাড়িতে ফজলুল হককে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'লো।

চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে বিশ্বাস নেই। ৯৩ জারি ক'রেই তাঁকে সরিয়ে গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর ক'রে পাঠালেন প্রতিরক্ষা সচিব এস্কান্দার মির্জাকে। ঢাকায় পা ফেলতে-না-ফেলতেই মির্জার মিলিটারি শাসন সুরু হ'য়ে গেল। চার হাজারের মতো রাজনৈতিক কর্মী আর নেতাকে এনে পুরলেন হাজতে। টুঁ শব্দ ক'রলেই টুঁটি চেপে ধরেন মির্জা।

একসময় গোলাম মোহাম্মদের নিজের গদিই হ'য়ে উঠল টলটলায়মান। ভাগ্যিস দেশি ভাইরা ছিল। পাঞ্জাবি সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সজাগ হ'য়ে গেলেন তিনি। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা বাতিল ক'রলেন। ভেঙে দিলেন গণ-পরিষদ, সেই সঙ্গে ভেস্তে গেল 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র'।

মন্ত্রিসভা ভেঙে কিন্তু ওই দিন বিকেলেই বিপাকে পড়ে গোলাম মোহাম্মদকে আবার মন্ত্রিসভা গড়তে হ'লো। প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীই। গোলাম মোহাম্মদের বার্তা পেয়ে জুরিখ থেকে ছুটে এলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী।

পেলেন আইন-দফতর। অর্থমন্ত্রী হলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। মন্ত্রিসভায় আনলেন ডাক্তার খানসাহেবকে। সীমান্তগান্ধী গফ্ফার খানের ভাই ডাক্তার খানসাহেব। গফ্ফারখান তো লোভে মজবে না। তাই খানসাহেবকে দলে ভিড়িয়ে বানচাল ক'রতে চাইলেন পাখতুন-আন্দোলন। পশ্চিমপাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ নিয়ে একটা ইউনিট গড়ে তোলার বাসনা গোলাম মোহাম্মদের অনেক দিনের। এক ইউনিট হ'লে পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা পাঞ্জাবিদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ; পাঞ্জাবী-তনয় গোলাম মোহাম্মদও কায়েমী হ'য়ে বসতে পারবেন গদীতে। এক ইউনিট ক'রেই ডাক্তার খানসাহেবকে পশ্চিমপাকিস্তানের গভর্নর ক'রে পাঠালেন গোলাম মোহাম্মদ।

আইন অনুযায়ী পার্লামেণ্টের নতুন নির্বাচন ক'রতে বাধ্য হ'লেন গোলাম মোহাম্মদ। সেই সঙ্গে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী গিয়ে এলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আবার ফিরে গেলেন ওয়াশিংটনে। ১৯৫৫ সালের ৩ জুন পূর্বপাকিস্তান থেকে গভর্নর শাসন তুলে নেওয়া হ'লো। কেন্দ্রের নির্দেশে 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন গভর্নর খাজা শাহাবউদ্দীন। ইস্কান্দার মির্জা মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় খাজা শাহাবউদ্দীন তাঁর জায়গায় গভর্নর হ'য়ে এসেছিলেন। আর হকসাহেবকে করলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'য়েই হকসাহেবের প্রথম চেষ্টা হ'লো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি তা ক'রলেনও। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকরী হ'লো সে-শাসনতন্ত্র। বাংলা তাতে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেলো। সার্থক হ'লো বরকত সালাম রফিক জব্বার শফিকুরের রক্ত দেওয়া।

শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার আগেই হকসাহেব চলে এলেন পূর্ব-পাকিস্তানে, গভর্নর হ'য়ে।

গভর্নর জেনারেল হ'য়ে অবধি গোলাম মোহাম্মদ সোয়াস্তি পান নি। গদী আগলে রাখতেই সারাক্ষণ তাঁকে বিব্রত থাকতে হ'য়েছে। অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য বাইরে গেলেন। মির্জাকে বসিয়ে গেলেন নিজের জায়গায়। ভাবলেন মির্জা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবেন না। শরীর সারিয়ে এসেই বসবেন আবার নিজের জায়গায়। কিন্তু বৃথাই সে আশা! মির্জা অনড় হ'য়ে বসলেন গদিতে। গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভারও পট বদল হ'লো। পাঞ্জাবের মোহাম্মদ আলী গিয়ে এলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী। প্রধান মন্ত্রী হ'য়েই সোহ্‌রাওয়ার্দী বাতিল ক'রলেন আবু হোসেনের মন্ত্রিসভা। সে-জায়গায় আনলেন আতাউর রহমানকে। মুজিবর রহমান আবার মন্ত্রীত্ব পেলেন।

ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর 'আওয়ামী মুসলিমলীগ'-এর 'মুসলিম' শব্দটি ছেঁটে আগেই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল করা হ'য়েছিল। এবার 'আওয়ামী লীগ' থেকে ভাসানীর দল বেরিয়ে এসে গড়লেন 'ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি'। মতভেদ হ'লো এক ইউনিট আর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে। সোহ্‌রাওয়ার্দী আগে এক ইউনিট এবং সিয়াটো চুক্তিজোটের বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হ'য়েই ভুলে গেলেন সব। এক ইউনিট আর পাক মার্কিন সামরিক চুক্তির গোঁড়া সমর্থন বনে গেলেন তিনি রাতারাতি।

১৯৫৭ সালের ফেবরুয়ারিতে কাগমারি সম্মেলনে মৌলানা ভাসানী তীব্র সমালোচনা ক'রলেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর। আভাস দিলেন নতুন দল গঠনের। কাগমারীর মতো ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্বপাকিস্তানে আর হয় নি। দেশ বিভাগের আগে আসামে যে-ভাসানী ছিলেন মুসলিমলীগের গোঁড়া সমর্থক সেই ভাসানী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এমন আশ্চর্য সম্মেলন ক'রেছেন ভাবতে অবাক লাগে। টাঙ্গাইল থেকে কাগমারি পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় তৈরি করিয়েছিলেন তিনি অনেকগুলো তোরণ। লেনিন, সেক্সপীয়র, আব্রাহাম লিনকন, মহাত্মা

গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রমুখের নামে নামকরণ ক'রেছিলেন সে-সব তোরণের। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলও যোগ দিয়েছিলেন সে সম্মেলনে।

ওই বছরই জুলাই মাসে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে গণতন্ত্রী সম্মেলন হ'লো। সারা পাকিস্তান থেকে বারোশ'র মতো প্রতিনিধি এসেছিলেন সে-সম্মেলনে। এসেছিলেন মিয়া ইফতেখারউদ্দীন। অগাধ টাকা তাঁর। দুর্বিপাকে পড়ে পাকিস্তান সরকারও টাকা ধার নিয়েছিলেন তাঁর কাছে। ইফতেখারউদ্দীনের ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে লেনিন আর স্টালিনের বিরাট দু'টি তৈলচিত্র। এসেছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফ্ফার খান।

এক ইউনিট বাতিল, স্বায়ত্তশাসন আদায়, যুদ্ধ-জোট বর্জন প্রভৃতি প্রশ্নে 'ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি'র জন্ম হ'লো সেদিন। মুখে না বললেও একথা আজ আর কারু অজানা নেই যে, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি মানেই কমিউনিস্ট পার্টি।

'৫৭ সালের ১১ অক্টোবর সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বিদায় ক'রে চুন্দ্রীগড়কে এনে প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসালেন মির্জা। বেশিদিন থাকতে পারলেন না চুন্দ্রীগড়। পদত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'লেন। এলেন ফিরোজ খান নূন।

ওদিকে পূর্বপাকিস্তানেরও পট'ও বদল হ'লো। '৫৮ সালের ৩১ মার্চ গর্ভনর ফজলুল হক আতাউর রহমানকে হটিয়ে আবার আবু হোসেন সরকারকে নিয়ে এলেন।

ক্ষিপ্ত হ'য়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী তৎক্ষণাৎ ফিরোজখান নূনকে ট্রাঙ্ককলে ভয় দেখালেন, আধঘণ্টার মধ্যে ফজলুল হককে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর পদ থেকে না সরালে নূন-মন্ত্রিসভা থেকে তিনি আওয়ামীলীগ সদস্যদের সমর্থন তুলে নেবেন। আওয়ামীলীগের সমর্থন না পেলে নূন-মন্ত্রিসভার পতনও অনিবার্য। কী আর করেন নূন-সাহেব।

গদী রাখতে গিয়ে হকসাহেবকে বরখাস্ত ক'রে চীফ সেক্রেটারি হামিদ আলীকে গভর্নর ক'রে পাঠালেন পূর্বপাকিস্তানে। আর পরের দিনই আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত ক'রলেন হামিদ আলী। এ যে বাদশা হারুন অর রশিদের সময়কার আবু হোসেনের অবস্থা দাঁড়ালো। বোগদাদের আবু হোসেনের মতোই বাঙলার আবু হোসেন একদিনের বাদশা হ'য়েছিলেন। আতাউর রহমান আবার স্বস্থানে ফিরে এলেন। ১৮ জুন পরিষদে সরকার পক্ষের একটি প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হ'লো। অর্থাৎ আতাউর রহমানের দলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা আর নেই। পরদিনই আতাউর রহমান পদত্যাগ ক'রলেন। মন্ত্রিসভা গঠন ক'রতে আবার ডাক পড়ল আবু হোসেন সরকারের। তিনটা দিনও কাটেনি, আবু হোসেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুজিবর রহমান একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাবটি পাশও হ'য়ে গেল। ২৩ জুন পদত্যাদ ক'রলেন সরকার সাহেব। ২৫ জুন এস্কান্দার মির্জা সাময়িকভাবে বিধানসভা বাতিল ক'রে দিয়ে প্রেসিডেন্ট শাসন চালু ক'রলেন। কিছুদিন বাদে প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নিয়ে আওয়ামীলীগকে আবার মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাকা হ'লো।

স্পীকার আবদুল হাকিম কৃষক-শ্রমিক পার্টির। তাই আওয়ামীলীগ ঠিক ক'রলো আবদুল হাকিমকে স্পীকারের পদ থেকে সরাতে হবে আগে। কৃষক-প্রজা পার্টিও ঠিক ক'রলো অ্যাসেম্বলির কাজ চালাতে দেবে না। এ্যাসেমবলিতে দুই দলের সংঘর্ষের পরিণতি ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু। ঘটনাটি হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ২৪ সেপ্টেম্বর গভর্নর বিধানসভা মূলতবী ঘোষণা করেন। অক্টোবরের সুরুতেই কেন্দ্রে নূন মন্ত্রিসভারও রদবদল হ'লো বার বার। শেষে সব খেয়োখেয়ির পরিসমাপ্তি হ'লো ৭ অক্টোবর। মির্জা মার্শাল ল জারি ক'রলেন। সুরু হ'লো ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

গভর্নর পদ থেকে খারিজ হ'য়ে হকসাহেব আর ফিরে যান নি রাজনীতিতে। ফিরে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। জনগণের কল্যাণের ধুয়া তুলে আয়ুব তো জনগণের বুকের ওপর অনড় হ'য়ে চেপে বসেছেন। ন্যায়-নীতির বিচারে হকসাহেব খুঁজে পান না এই অভিনব শাসন-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা। শেষের দিনগুলি কে. এম. দাস লেনের বাড়িতে দুপুরের নির্জনে বসে স্মৃতিচারণায় কেটেছে তাঁর। দেখতেন নিমপাখি, বুলবুল, বেনেবউ; গ্রীষ্ম বর্ষা শরতকে দেখেন; আর ভালোবাসেন। ভাবেন, ছোটোবেলার কথা। চাখারের খাল-বিলেব কথা।

আজ সারা বাঙলার মানুষকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন বাঙালীর বড়ো আ·নাপ্ন জন সেই হকসাহেব।

পবের দিন আউটার স্টেডিয়ামে জানাজা হ'লো। জানাজা শেষে দাফনের জন্য শোকযাত্রা চলল হাইকোর্টের দিকে। সারা পূর্ববাঙলাব লোক যেন সেদিন ঢাকায় ভেঙে পড়েছিল। ছায়া-ঢাকা রমনার র'জপথ ধরে এগিয়ে চলেছে লক্ষ মানুষেব শোক মিছিল। কৃষ্ণচূড়ার আগুন-রঙা রূপও যেন আজ ম্লান।

অন্যদের সঙ্গে গভর্নর আজম খানও খালি পায়ে লাশ বয়ে নিয়ে চলেছেন। যে-আজম পিস্তল উঁচিয়ে আয়ুবকে গদিতে বসিয়েছেন, যে-আজমের নামে লাহোরের মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়ায়, সেই অকুতোভয়, বিশালদেহী লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খানের চোখেও আজ জল! তাঁর প্রশস্ত কপালে কাটা দাগটাকে মনে হয় রাজটীকা। জানি না এই রাজটীকার জোরেই কি না কয়েক মাসেই সারা বাঙলার আপনজন হ'য়ে গেছেন আজম খান। বাঙলার 'জেলেভাই, চাষী-ভাই' তাঁর নামে পাগল।

খবর এলো টাইডাল বোর-এ চট্টগ্রাম ধুয়ে মুছে গেছে। সন্দীপ, হাতিয়া, কুতুবদিয়া আরও অসংখ্য দ্বীপে জনবসতির চিহ্নটুকু পর্যন্ত

নেই। এতো প্রবল ছিল সে জলোচ্ছ্বাস যে মোটা গাছের ডাল ধরেও রক্ষা পায় নি অনেকে। দেখা গেছে, গাছের ডালে হাতটা ধরাই আছে, দেহটা চলে গেছে কোথায়, কেউ জানে না। জলোচ্ছ্বাসের সে কী গর্জন! রূপকথার সাতশ' রাক্ষসীর গর্জনকেও হার মানায় তা। বিশাল ঢেউ মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরও জলে ডুবে গেছিল। কতো হাজার লোক যে মারা গেছিল তার হিসেব নেই। কেউ বলে পঁচিশ হাজার, কেউ বলে চল্লিশ হাজার। সরকারি হিসেব ছিল পনের থেকে বিশ হাজার।

আমরা রিপোর্ট আনতে গিয়ে সে বীভৎস দৃশ্যের কিছুটা পরিচয় পেয়েছি। গলিত শবের গন্ধে গ্রামের পর গ্রাম বাতাস ভারি হ'য়েছিল। নাকে রুমাল বেঁধে যতটুকু দেখে এসেছি তা-ই কখনো ভোলা যাবে না। শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে রয়েছে মা। ঘুমন্ত অবস্থায় ভেসে চলে এসেছে কোথা থেকে কে জানে। অসংখ্য মৃতদেহের ফটো নিয়েছিল মোজাম্মেল।

দিনটা ছিল ১০ অক্টোবর, ১৯৬০ সাল। আজম খান সবে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হ'য়ে এসেছেন। শুনেছিলাম, আজম খান রূঢ়, আজম খান নিষ্ঠুর এবং কড়া। সকলের মনেই একটা অজানা আতঙ্ক, কী জানি কী হয়। কিন্তু ধারণা পাল্টে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। দুর্যোগের খবর পেয়ে আজম খান সেই মুহূর্তে চলে গেলেন চট্টগ্রাম। গিয়ে দেখেন, দুর্গতদের সাহায্য তো দূরের কথা, সামান্য খবর নেওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত হয় নি তখনো।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি গভর্নর স্বয়ং এতো দ্রুত ছুটে আসবেন চট্টগ্রামে। চাপরাশির মুখে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হ'লেন আজম খানের কাছে। দেখেন, আজম খান রাগে ঘরময় পায়চারি ক'রছেন। তখনও তাঁর টাই বাঁধা শেষ হয় নি। 'নট'-টা ঠিক ক'রতে যাচ্ছিলেন। টাইয়ের 'নট' ঠিক ক'রতে দেখে আজম খান ক্ষেপে গেলেন আরও। টাই ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে

বললেন, 'আমি ঢাকা থেকে চলে এলাম, আর তুমি এখনও টাই বাঁধছ? হাজার হাজার লোকের আর্তচীৎকার কি তোমার কানে এখনো পৌঁছয় নি। তুমি মানুষ না আর কিছু। আই ডু নট রিকোয়ার এন অফিসার লাইক ইউ।'

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ড ক'রে আজম খান বেরিয়ে পড়লেন। পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখলেন ধ্বংসের লীলা, মৃতের স্তূপ। রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রলেন সেই মুহূর্তে। ঘরে ঘরে গিয়ে নিজ হাতে খাবার দিলেন, কাপড় দিলেন। দিনের পর দিন একনাগাড়ে খেটে চললেন গভর্নর আজম খান। এই একটি মানুষেব জোরেই ছিন্নমূল মানুষরা বুকে বল পেল, বাঁচার প্রেরণা পেল, আবার বাড়িঘর ক'রল। আজম তো মানুষ নন, চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে মানুষরূপী দেবতা।

যেখানেই শুনেছেন মানুষের দুঃখকষ্টের কথা, সেখানেই তিনি সশরীরে হাজির হ'য়েছেন। পূর্ববাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী, জেলের দুঃখ মোচনের চেষ্টা ক'বেছেন।

একবার ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ আসছিলেন চেম্বার অব কমার্সের এক সভায়। ফতুল্লার ওখানে দেখলেন এক জায়গায় রাস্তার ধারে কলসি নিয়ে মারামারি ক'রছে অনেকগুলো বউ-ঝি। আজম খান বিস্মিত হ'য়ে সেকরেটারিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কী ব্যাপার! এরা এবকম মারামারি ক'রছে কেন?' সেকরেটারী জানালেন, 'পানির জন্য। কয়েক গ্রামের মধ্যে কল বোধহয় একটাই। তাই কার আগে কে পানি নেবে তারই জন্যে ঝগড়া।'

আজম খান গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। একবার ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সারি সারি দেবদারু-গাছে-ছাওয়া রাস্তা দিয়ে তার হাল্কা আকাশী রঙের বড়ো গাড়িটা কনফারেন্স হলের সামনে দাঁড়াতেই ছুটে এলেন হানিফ আদমজী, ইস্পাহানীর মতো শিল্পপতিরা। আজম খান নিজেই গাড়ির

দরজা খুলে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ভিতরে এগিয়ে চললেন মিলিটারি কায়দায়। সকলেই অবাক! কী ব্যাপার! আজম খানের পিছনে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলেছে চেম্বার অব কমার্সের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যেতে যেতে আজম খান শুধু বললেন, 'হোয়ার ইজ ইওর ফোন?' লোকটি সেকরেটারির রুমে নিয়ে গেলেন আজম খানকে। ঘরে ঢুকেই আজম খান দ্রুত ডায়াল ক'রলেন সেকরেটারিয়েটে। ওপাশ থেকে উত্তর আসতেই আজম খান বললেন, 'আজম স্পীকিং হিয়ার। আজ রাতের মধ্যেই ফতুল্লাতে একটা টিউবওয়েল বসাতে হবে। কাল সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরার পথে আমি দেখতে চাই কল হ'য়ে গেছে।'

ওপাশ থেকে জাঁদরেল সরকারি কর্মচারিটি তখন তোত্‌লাতে সুরু ক'রেছেন। তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে শুধু বললেন, 'স্যার, এটা ফুড ডিপার্টমেনট্।'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। না হ'লে তোমাকেই ধরব।' বলেই ফোন রেখে দিলেন আজম খান।

ফুড সেকরেটারি কী আর করেন। তাড়াতাড়ি ছুটলেন ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে। ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে সারা রাত ধরে কাজ হ'লো।

সকালে আজম খান দেখলেন, নতুন কল বসেছে। মারামারি নেই। দিব্যি একের পর এক মেয়েরা পানি ভরে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখে স্মিত হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

তেজগাঁ থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত বিরাট সড়ক তৈরী ক'রতে হবে। হাতে সময় নেই। দিনরাত কাজ চলছে। আজম খান নিজেও তদারকি ক'রছেন কাজের। উৎসাহ দিচ্ছেন মজুরদের। দুপুরেও গভর্নর হাউসে ফেরেন না সব দিন। মজুরদের সঙ্গেই মাটির সানকিতে খেয়ে নেন চারটি।

একজন সাধারণ রিকসাঅলা পর্যন্ত গভর্নর হাউসে সরাসরি

তাঁর কাছে চলে যেতে পারত। ঈদের দিন তিনি দিন-মজুর, রিকসাঅলা, ছাত্র সকলের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রতেন। সকলেরই ধারণা ছিল গভর্নর না জানি কী রাজকীয় হালেই থাকেন। খাটটা বুঝি-বা সোনা দিয়েই বাঁধানো। কিন্তু আজম খানকে দেখে বিস্মিত হ'ন সবাই। পরনে অতি সাধারণ পোশাক। খাট নয়, খাটিয়ায় ঘুমোন তিনি। গরিবের বন্ধু আজম খান।

জিনিসপত্রের দাম হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। চারিদিকে হাহাকার। চাষী, মজুর, শ্রমিক, জেলেদের শুষে শিল্পপতিরা বড়ো রকমের মুনাফায় মেতে উঠেছে। আজম খান আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী প্রভৃতি গ্রুপের শিল্পপতিদের গভর্নর হাউসে ডেকে এনে বললেন, 'আমি চাই সাতদিনের মধ্যে আপনারা জিনিসপত্রের দাম কমান।'

শিল্পপতিরা হা হা ক'রে উঠলেন, 'বলেন কি স্যার, ও কি আমাদের হাতে? আমরা যেমন যেমন কিনি তেমন তেমন বিক্রি করি।'

আজম খান কঠোর স্বরে বললেন, 'আমি ওসব জানি না, সাতদিনের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম না কমলে আমি আপনাদের স্টেডিয়ামে দাঁড় করিয়ে স্যুট ক'রব। দেখব, দাম কমে কিনা।'

যা মানুষ। মুখে যা বলছেন, কাজে ক'রতেও পিছবেন না। শিল্পপতিরা ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে ক'রতে উঠে পড়লেন। এবং ভোজবাজির মতোই ফল হ'লো। হু হু ক'রে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম পড়ে গেল।

গভর্নর থাকা কালে আজম খান একবার দিল্লী গিয়েছিলেন। দেশের বাড়িতে। খবর শুনে এক বুড়ি ছুটে এলো। আজম খান পায়ে হাত দিয়ে বুড়িকে প্রণাম ক'রলেন। আনন্দে বুড়ির চোখে জল এসে গেল। ছোটবেলা থেকেই বুড়ি আজমকে দেখেছে। সে ছিল আজমদের বাড়ির ঝাড়ুদারনি। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং পূর্ববাঙলার গভর্নর হ'য়েও ঝাড়ুদারনিকে প্রণাম করতে বোধ হয়

আজমই পারেন। বুড়ি বলল, 'বাবা আজম, শুনলাম তুমি 'গরমেণ্ট' না কী হ'য়েছো ?'

আজম হেসে বললেন, 'খোদা মেহেরবানী ক'রে আমাকে লোকের খিদমত করার ভার দিয়েছেন।'

মানুষের সেবাই যে আজমের ধর্ম। ক্ষমতায় আসার আগে আয়ুব তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন, দেশটা পেশাদার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যেতে বসেছে। আমরা যদি শক্তহাতে হাল না ধরি, তাহলে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

আজম তাই বিশ্বাস ক'রেছিলেন। তাই তো আয়ুবকে এনে গদিতে বসিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, আসলে গদির লোভটাই আয়ুবের কাছে বড়ো, জনসাধারণের কল্যাণ নয়।

গদিতে থেকে যদি মানুষের কল্যাণই না হ'লো তাহ'লে গদি আঁকড়ে থেকে লাভ কী ? ছাত্রহত্যা ক'রে গদিতে বসতে হবে ? তার চেয়ে গদি ছেড়ে দেওয়া শতগুণে শ্রেয়। তাই তো আয়ুবের নির্দেশ সত্ত্বেও আজম খান বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর গুলি চালাতে পারেন নি। আয়ুব তখন ঢাকায়, গভর্নর হাউসে।

নির্জন রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে বড়ো ভালো লাগছিল। এমনিতেই রাস্তাটা ফাঁকা থাকে। অন্যদিন যাও-বা দু'চারটে গাড়ি চলতে দেখি, আজ তাও নেই। সবাই আশঙ্কা ক'রছে ছাত্র-পুলিশে আজ সংঘর্ষ একটা হবেই। সকালেই ইউনিভারসিটিতে মীটিং। শরতের মৃদু বাতাস বইছিল। শরতের বাতাসের একটা সুন্দর গন্ধ আছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল গাঢ় নীল আকাশের ফালি। রমনার রাস্তার দু'পাশে অনেক গাছগাছালি। একবার একদল আমেরিকান সাংবাদিক ঢাকায় বেড়াতে এসেছিল। প্রেস-ক্লাবে কফি খেতে খেতে ওদের নেতাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, ঢাকা কী

রকম লাগছে তোমাদের? উত্তর দিয়েছিল, ওহ্ ইটস্ এ গুড ভিলেজ। ন্যুয়র্কের তুলনায় ঢাকা গ্রামই বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ঢুকতেই দেখা হ'য়ে গেল আমাদের ইউনি-ভারসিটি করেসপনডেন্ট শেলীর সঙ্গে। দেখেই বলল, 'কল্হন, তুমি এখানটা সামলাও। আমি হলগুলো দেখে আসছি।'

এগিয়ে গেলাম।

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এসে জমেছে। আরও আসছে। এই সাত-সকালেও এতো ছাত্র-ছাত্রী এসে গেছে! ভাবতেও অবাক লাগে। আমতলার দিকে এগিয়ে গেলাম। ছাত্রদের অনেকেই চিনত। আমাদের জুনিয়র। পথ ক'রে দিল। মেনন—রাশেদ খান মেনন উঠে দাঁড়াতেই এতক্ষণের মৃদু গুঞ্জনটা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। রোগা-পাতলা ফরসা চেহারাব এই ছেলেটিই আয়ুবের মস্ত ভীতি। ছাত্র ইউনিয়নের ভি.পি.। আদর্শের প্রশ্নে বাবার সঙ্গেও আপোস করে নি সে। বাবা কনভেনশন মুসলিমলীগের গোঁড়া সমর্থক। আর ছেলে বিরোধীপক্ষ। কতোবার যে রাশেদ জেলে গেছে, গ্রেপ্তারি পরো-য়ানা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঠিক নেই। কিন্তু কখনো অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নি। বাবা জাব্বার খান ন্যাশন্যাল এ্যাসেম্বলির স্পীকার। আয়ুবের বড়ো প্রিয় পাত্র। একবার আয়ুবের অনুপস্থিতিতে এ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের কাজও চালিয়েছেন তিনি। এ কি কম লোভ? কিন্তু এই ছোটো ছেলেটাকে বাগ মানাতে না পারায় আয়ুবের কাছে তিনি ভালো ক'রে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারেন না। তর্জনগর্জনেও ফল হয় না। রাশেদ যে গাজিউল হক, তোয়াহা, ওলি আহাদের উত্তরসূরী। রাশেদ বলে চলেছে, 'ভাইসব, দাবি মানা না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই। ভয় করি না আমরা আয়ুবের বেঅনেটের। সালাম-বরকত-রফিক-শফিকের পথ ধরেই এগিয়ে যাব আমরা। বাঙলার ছেলেরা রক্ত দিতে ভয় পায় না। জানি, রমনার রাজপথ আবার লাল হবে; তবু ভয়

করি না। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কালা কানুন বাতিল ক'রতেই হবে। শিক্ষা সংকোচন ক'রে পূর্বপাকিস্তানী-দের আর দাবিয়ে রাখা চলবে না।' তারপর বাইরে দাঁড়ানো হেলমেট ধারী পুলিশবাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলল, 'ওই সব পুলিশরা শুনে যাক আমাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা। আয়ুবের রক্তশাসানিকে আমরা ভয় পাই না। দাবি আমরা আদায় ক'রবই।' উত্তেজনায় রাশেদের ফর্সা মুখে রক্ত জমে উঠেছে।

এমন সময় ক্যান্টিনের কাছে সোরগোল উঠল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, একটা পায়জামা আর সাদা শার্ট পরা লোককে ছাত্ররা ধরে মারছে। ঘুসি খেয়ে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জামাটা ছিঁড়ে গেছে। একটা ছেলে হাত মুচড়ে ধরে বলল, 'টিকটিকিগিরি করার আর জায়গা পাও না। ইউনিভারসিটির ভিতরে এসেছো?' যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে লোকটা বলে, 'আজ ছেড়ে দিন। আমি আর কোনোদিন আসব না। আল্লাহ্‌র কসম।'

রাশেদ এসে ছাড়িয়ে দিল। ছাড়া পেয়ে লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল গেট পেরিয়ে। ফোঁপব দালালি ক'রতে এসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের। নাজেহাল হ'য়ে ফিরে গেছে।

বারোটার দিকে খবর এলো একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি ক'রেছে। ছাত্ররা তখন শোভাযাত্রা বের ক'রবার জন্য তৈরি হ'য়ে গেছে। একটা চাপা রাগ আর উত্তেজনায় গরগর করছে ছেলেরা: আমরা চুয়াল্লিশ ধারা মানি না।

'আমাদের দাবি মানতে হবে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল কর।' বলতে বলতে ছাত্ররা এগিয়ে যায় গেটের দিকে। মুহূর্তে পুলিশরা ছুড়ে দেয় টিয়ারগ্যাসের শেল। ছাত্ররাও পাল্টা ইট ছুড়তে থাকে। ঠিক সেই '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের দৃশ্য! বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিশে আর ছাত্রে খণ্ড যুদ্ধ চলল। অনেক ছাত্র

আহত হ'লো। পুলিশই আহত হ'লো ৫০ জনের মতো। যশোরেও সেদিন ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা ৮৩।

পরের দিন দশটার দিকে হাজার হাজার ছেলে সেকরেটারিয়েট বিল্ডিং-এ ঢিল ছুড়তে থাকে। ছুটে এলো পুলিশ। এলোপাথারি লাঠি চলল। টিয়ারগ্যাস শেল ফাটল। ধোঁয়ায় ভরে গেল প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তাটা। খবর পেলাম, কার্জনহলের সামনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুল কাদের চৌধুরীর গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ছাত্ররা। ভুলুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে গেলাম। দাউ দাউ করে জ্বলছে হাল ফ্যাসানের গাড়িটা। ই. পি. আর. বাহিনী তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে ছাত্রদের। কার্জনহলের ভিতর সকলে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাকে খোয়া পড়ছে গিয়ে তাদের মাথায়। ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে বেল বাজিয়ে দমকলবাহিনী এসে গেল। ছাত্রদের সঙ্গে আজ সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছে। তীব্র বিক্ষোভে ফেটে ফেটে পড়ছে তাদের গর্জন। ছাত্রদের ইটের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। গুলি চালাল ই. পি. আর. বাহিনী। আবার হাইকোর্টের সামনের কালো পিচের রাস্তাটা তাজা রক্তে মেখে গেল। '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে এরই অনতিদূরে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল শফিকুর রহমান।

অফিসে ফিরে গিয়ে শুনলাম জজকোর্টের সামনেও গুলি চলেছে। একজন ছাত্রকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটাচ্ছিল। সাহস ক'রে একেবারে কাছ থেকেই ফটো নিচ্ছিল মোজাম্মেল। মোজাম্মেল বরাবরই একটু দুঃসাহসী। ফটো নেবার সময় কোনো হুঁস থাকে না। একবার চকবাজারে বিরাট আগুন লেগেছিল। চালের উপর থেকে ফটো নিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। সামাদ দেখল, জজ-কোর্ট বিল্ডিং থেকে লাল ফ্ল্যাগ দেখানো হ'চ্ছে। ছুটে গিয়ে মোজাম্মেলের হাত ধরে টেনে মুহূর্তে শুয়ে পড়ল। আর তৎক্ষণাৎ সাঁ ক'রে গুলিটা গিয়ে পিছনের দেওয়াল ফুটো ক'রে দিল। অল্পের জন্যে রক্ষা।

গুলিতে তিনজন শহীদ হ'লো সেদিন।

এ-আন্দোলন শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পূর্বপাকিস্তানে। রাতে গিয়ে দেখি কে. জি. ভাইয়ের ডেস্কে টেলিগ্রাম এসে জমেছে কুমিল্লা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, বরিশাল, কুষ্টিয়া—বলতে গেলে প্রায় কোনো জায়গায়ই বাদ নেই।

পরদিন ইউনিভারসিটিতে মধুর ক্যান্টিনে এক সভায় ডাকসুর নেতারা ঠিক ক'রলো প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করা হবে। পূর্ববাঙলাব ইতিহাসে আর একটা রক্তে-রাঙা দিন চিহ্নিত হ'লো।

ইউনিভারসিটিব ভিতর ঢুকে ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন ডক্টব মাহমুদ হোসেন। তাই তাঁকে বিদায় নিতে হ'য়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলাবের পদ থেকে। আয়ুব তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাতে পাবেন, কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের মন থেকে তো তাঁকে সরাতে পাবেন নি। ছাত্রদের অজস্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়েছেন ডক্টব হোসেন। এ কি একজন শিক্ষাব্রতীর সবচেয়ে বড়ো পাওয়া নয়?

বাইরে নিজের কুশপুত্তলিকা দাহ হ'চ্ছে দেখে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আয়ুব আজম খানকে গুলি চালাতে বললেন ছাত্রদের ওপর। অস্বীকার ক'রলেন আজম। কেন, ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মেনে নিলেই হয়। কার স্বার্থে তাদের দাবি বানচাল করার চেষ্টা চলছে? আয়ুব আর আজম খানের মধ্যে কথা কাটাকাটি হ'লো। ফলে বিদায় নিতে হ'লো আজম খানকে। দলমত নির্বিশেষে সারা পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচকোটি মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা নিঙড়ে নিয়ে, সকলকে কাঁদিয়ে ২৩ অক্টোবর চলে গেলেন আজম লাহোরে,—নির্জন প্রবাসে। হ্যাঁ, লাহোর তো তাঁর কাছে প্রবাসই। পূর্ববাঙলাই তাঁর দেশ। পূর্ব বাঙলার এমন আপনজন বলেই না তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে সারা দেশের লোক ভেঙে প'ড়েছিল স্টেডিয়ামে। এমন বিদায়

সংবর্ধনা পাকিস্তানে কখনো কেউ পায় নি। বাঙলার এতো আপনজন বলেই না আজ শেরে বাঙলার শব বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন তিনি। কেঁদে চলেছেন অঝোরে বাঙলার যশস্বী সন্তানের মৃত্যুতে।

লাখো জনতার মৌন মিছিল এগিয়ে চলেছে হাইকোর্টের দিকে। সকলেরই চোখ অশ্রুপূর্ণ। এত বড়ো শোক মিছিল ঢাকায় আর কেউ কখনো দেখে নি। কোনো নেতার ভাগ্যে জোটে নি এই দুর্লভ সম্মান।

শতাব্দীর ইতিহাস মনের পর্দায় দ্রুত একের পর এক ছবি ফেলে গেল। নিজের অজান্তেই একটা বড়ো নিশ্বাস পড়ে থাকবে। মোজাম্মেল ফিরে তাকাল। মাজারে আমার ফুল দেওয়া হ'য়ে গেছিল। আমার হাতে ক্যামেরাটা দিয়ে মোজাম্মেলও হকসাহেবের মাজারের ওপর একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ রেখে চুপ করে দাঁড়াল কয়েকটা মুহূর্ত। তার পর ধীর পায়ে ফিরে এলো। সকলেই আসছে যাচ্ছে নিঃশব্দে, সন্তর্পণে। হকসাহেবের ঘুম যেন না ভাঙে!

রমনার পথে আনমনে হাঁটছিলাম। বার বার মনে ওই সব কথাই এলোমেলো চকিত ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছিল।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে গিয়ে যখন পৌছলাম, ন'টা বাজতে তখনো মিনিট-দুই বাকি। সারা পাকিস্তানের জাঁদরেল জাঁদরেল আইনজীবিরা তো আছেনই, চুনোপুটি আইন-জীবিও রয়েছেন অনেক। অবশ্য, তাদের অধিকাংশই কৌতূহলী দর্শক। রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিকে জমজমাট আদালত-কক্ষ। ঢাকার সাংবাদিকরা তো আছিই, বিদেশী সাংবাদিকরাও রয়েছেন। এ যে ঐতিহাসিক বিচার। ভাওয়ালকুমারের মামলা ছাড়া ঢাকায় আর কোনো মামলায় বোধ হয় এত হৈ-চৈ পড়ে নি। সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে 'প্রেস কর্নারে' গিয়ে বসলাম। ঠিক ন'টা বেজে পনের মিনিটে বিচার-কক্ষে ঢুকলেন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস. এ. রহমান। পিছনে পিছনেই এলেন 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার' বিশেষ ট্রাইবুনালের অপর দুই সদস্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস আর. খান এবং মখসুমূল হাকিম। ১৯ জুন 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার' শুনানী সুরু হ'য়েছিল। মাস-খানেক মূলতবী থেকে ২৯ জুলাই দ্বিতীয় দফা সুরু হ'য়েছে। আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি. এস. পি. অফিসার ফজলুল রহমান, রুহুল কুদ্দুস, খান. এম. সামসুর রহমান, একজন মেজর এবং ৩ জন ক্যাপ্টেন সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হ'য়েছে যে, তাঁরা কমাণ্ডো স্টাইলে হঠাৎ ক'রে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগারগুলো দখলে এনে পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় ছিলেন। এমন কি তারা ভারতের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের চুক্তিও ক'রেছিলেন যে, জল বা আকাশপথে ভারত পশ্চিমপাকিস্তান থেকে সৈন্য পাঠাতে বাধা

দেবে এবং তাঁদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রবে। তাঁরা আরও ঠিক করেছিলেন যে, পশ্চিমপাকিস্তানে বসবাসরত পূর্বপাকিস্তানীদের ফেরত না দিলে পশ্চিমপাকিস্তানীদের পূর্বপাকিস্তানে 'জিম্মি' হিসেবে আটকে রাখবেন। নির্যাতন ক'রে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, চাকরি-বাকরি প্রমোশন লাইসেন্স প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে সরকার ২৩২ জন সাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন। অমানুষিক নির্যাতন ক'রে সাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন কামালউদ্দীন আহাম্মদকে। রাজসাক্ষী হওয়ায় অভিযুক্তের এগারোজনকে ক্ষমা ক'রেছেন সরকার। অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে কামালউদ্দীনসাহেব শেষে রাজী হ'য়েছিলেন সাক্ষী দিতে। কিন্তু সরকাবপক্ষের প্রধান কৌশুলি মঞ্জুর কাদের স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, কামালউদ্দীন এইভাবে মামলাটা কেচে দেবে। স্টেটমেণ্টে যা বলেছিল সাক্ষী দিতে এসে বলল তাব উল্টো। সনাক্ত ক'রতে পারলেন না তাঁদের যাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। উত্তেজিত মঞ্জুর কাদেরের অনুরোধে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা ক'রলেন। কাল জেরা শেষ হয় নি। আজ আবার সুরু হ'লো তার জেরা।

আসামী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি সালাম খান উঠে দাঁড়াতেই বিচার-কক্ষে স্তব্ধতা নেমে এলো। কামালউদ্দীনসাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, মিঃ আহাম্মদ, কাল যখন আপনি বলছিলেন বন্দী থাকাকালে আপনার ওপর নৃশংস অত্যাচার করা হ'য়েছে আপনি কি সেই সময় ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন যে আদালতে তো মাত্র দশ মিনিট, তারপর আমার কী হবে?

কামালউদ্দীন আহাম্মদ বললেন, 'জ্বী হ্যাঁ। যে অমানুষিক নির্যাতন আমার ওপর ক'রেছে আবার ক'রলে আমি আর বাঁচব না। ভয়ে আমি মন খুলে সাক্ষ্য দিতে পারছি না।'

এই সময় সালাম খান ট্রাইবুনালের বিচারপতির দিকে তাকালেন। তাঁর চাহনির অর্থ, দেখুন স্যার উনি কী বলছেন। তারপর সহযোগী

একজন এ্যাডভোকেটের কাছ থেকে একটা চিরকুট নিয়ে বললেন, 'জীপটা কি আপনার কেনা ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কোন্ মডেলের ?'

'সিকসটি ফাইভ মডেলের। একজন লোকের কাছ থেকে গাড়িটি আমার কেনা।'

'আচ্ছা, আপনি বলেছেন জীপটি কিছুদিন কে. জি. আহাম্মদও ব্যবহার ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ?'

'প্রথম দিকে তিন মাস তিনি আমাদের সেলভেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন।'

'রক্সি হোটেল থেকে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ির দূরত্ব কতখানি ?'

'রক্সি হোটেল মীরপুর রোডে। মুজিবর সাহেবের বাসা আমি চিনি না এবং তাঁকে আমি কখনো দেখিও নি।'

'বেশ ! বেশ !' একটু থেমে সালাম খান হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনি বলেছেন করাচিতে আপনি যখন সুলতানউদ্দীনের বাসায় ছিলেন তখন একদিন সেখানে একটা সভা হ'য়েছিল। নক শুনে দরজা খুলে দাঁড়াতে আপনি কাকে দেখেছিলেন ?'

'লেফটেন্যান্ট মোজাম্মল হোসেনকে।'

'কতোক্ষণ চলেছিল সভা ?'

'তিনটে থেকে চারটে। চারটের পর আমি বেরিয়ে যাই।'

'আচ্ছা কাল আপনি বলেছিলেন ক্যান্টনমেন্ট মেসে মেজর হাসান এবং মেজর শরীফ প্রায়ই আপনার কাছে আসতেন।'

'হ্যাঁ।'

'তাদের কেউ কি আপনাকে জবানবন্দী দিতে বলেছিলেন ?'

'লেফটেন্যান্ট শরীফ বলেছিলেন।'

'জবানবন্দী দিতে রাজী করানোর জন্য কী সে-সময় আপনার ওপর মারধোর ক'রেছিল কেউ ?'

'হ্যাঁ, ক'রেছিল। আমি জবানবন্দী দিতে রাজী না দেখে দরজার কাছ থেকে একজন সুবেদার বলে উঠলো, স্যার ভালোমুখে কাজ হবে না, ভালো ক'রে 'বানালে' সুরসুর ক'রে সুবোধ ছেলের মতো কথা শুনবে। পরে জেনেছিলাম, তার নাম শফি। অত্যাচার সহ্য ক'রতে না পেরে, বিশেষ ক'রে আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচারের ভয় যখন তারা দেখাল, তখন আমি স্টেটমেণ্ট দিতে রাজী হ'লাম। লেফটেন্যাণ্ট শরীফ কতোগুলো পয়েণ্টের উপর স্টেটমেণ্ট লিখতে বললেন।'

সালান খান জানতে চাইলেন, পয়েণ্টগুলো কী?

'শেখ মুজিবর রহমান এবং এ. এফ. রহমান সি. এস. পিকে আমার বন্ধু বলে উল্লেখ ক'রতে বলে।'

'আর কারু নাম লিখতে বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন। আমাকে জানানো হয়, আমি যেন বলি চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার বিশেষ পরিচিত এবং তিনি একদিন আমার বাসায় জেনারেল আজম খানের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আরও কয়েকজনকে আমি চিনি—তাও লিখতে বললেন। তারা আমায় জানাল, সনাক্ত করণে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যে আগে থেকেই সকলের ফটো দেখিয়ে রাখবে আমায়। মেজর হাসান জবানবন্দী বলে গিয়েছিলেন, আর আমি লিখে নিয়েছি।'

'মেজর হাসান কি এখন আদালতে আছেন?'

মিস্টার আহাম্মদ আদালতের কক্ষের সকল মানুষের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর দৃষ্টির অনুসরণে দর্শকদেরও চোখ ঘুরছিল। সকলে মেজর হাসানকে দেখবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, কামালউদ্দীনসাহের ধীরকণ্ঠে বললেন, 'না, তিনি এখন এখানে নেই।'

'মাই লর্ড, আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' বলে বসে পড়লেন সালাম খান।

উঠে দাঁড়ালেন সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদের। আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি। মঞ্জুর কাদের কামালউদ্দীনসাহেবকে জেরা ক'রতে উদ্যত হ'তেই বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি মিস্টার টমাস উইলিয়াম আপত্তি তুললেন। বললেন, 'যে-সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হ'য়েছে, তাকে জেরা কবার অধিকার নেই। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান মিস্টার উইলিয়ামের বক্তব্য নাকচ ক'রে মঞ্জুব কাদেরকে জেরা ক'রতে অনুমতি দিলেন। মঞ্জুর কাদেব স্বরু ক'রলেন তাঁর সওয়াল। বললেন, 'আপনার ওপর নির্যাতন-সম্পর্কে আপনি আপনাব স্ত্রীব কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা হাইকোর্টে রীট আবেদন কবাব আগে না পরে ক'রেছিলেন।'

'আগে লেখা।'

'৫ জন ডাক্তাবেব বোড আপনার ওপর নির্যাতন হ'য়েছে—এমন রিপোর্ট দিয়েছেন কি?'

'তারা কী রায় দিয়েছেন আমি দেখি নি।'

'ডাক্তাবরা কি আপনাব শবীরেব ওপব আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন?'

আমি তাঁদেবকে দেহেব আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছি। তাঁরা কী দেখেছেন আমি জানি না। তাদের একজন আমায় বলেছেন, 'দেখুন, আমাদের হাত-পা বাঁধা, চোখ থেকেও নেই।'

জেরা শেষ হ'লে কামালউদ্দীন সাহেব ট্রাইবুনালের চেয়াবম্যানকে বললেন, 'স্যার এখন আমার নিরাপত্তার কী হবে? সামরিক কর্তৃপক্ষের হেফাজতে আমার যে-সব জিনিসপত্র রয়েছে, তা ফেরত পাব কি?

বিচারপতি এস. এ. রহমান বললেন, 'আপনি এখন মুক্ত মানুষ। আপনার জিনিসপত্র সবই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

কামালউদ্দীনসাহেব দর্শকদের মধ্যে এসে বসলেন। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়স্বজনরাও এসেছেন দেখলাম।

এরপর সুরু হ'লো সাক্ষী আমির হোসেনের জেরা। আমির হোসেন প্রাক্তন কর্পোরাল। বয়স চৌত্রিশ। ফরিদপুরের লোক। ১৯৫২ সালের ৭ জুলাই থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান-বাহিনীর বৈমানিক ছিলেন। বিমান-বাহিনী থেকে রিটায়ার্ড করার পর করাচির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে যোগ দেন।

সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদেরের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, 'ঠিক তারিখটা মনে নেই, তবে '৬৪ সালের শেষাশেষি কিংবা '৬৫ সালের গোড়ার দিকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওই সময় লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহম্মদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গেও তখনই আমার পরিচয়। পরিচয়ের কয়েকদিন পরেই স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহম্মদ আমাকে প্রায়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বলতেন। বলতেন, পূর্বপাকিস্তান আলাদা না হ'লে পূর্বপাকিস্তানীরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। আমি তাঁর কথা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে তিনি একদিন আমায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসাটা ছিল কে. ডি. এ. স্কীম ১-এ। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম আমায় তাঁদের কথায় আস্থা রাখতে বললেন। বললেন, আমিও দলে আছি। আমাদেরকে সশস্ত্র বিপ্লব ক'রে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন ক'রতে হবে। তিনি বললেন, অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমানে কার্যরত সৈনিককে নিয়ে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলার' জন্য সশস্ত্র-বাহিনী গঠন করা হ'য়েছে। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের কথায় অভিভূত হ'য়ে আমিও ওই দলে যোগ দিই। প্রায়ই লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের বাসায় গোপন বৈঠক বসত। আমিও যেতাম সেখানে। সেই সব বৈঠকে

সুলতানউদ্দীন আহম্মদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ছাড়াও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। তাদের এক জনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি গরিলাবাহিনীর হাবিলদার দলিলউদ্দীন। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে সুলতানউদ্দীন আহম্মদ ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন আন্দোলনের ব্যাপারে। সেখান থেকে আমাকে তিনি করাচিতে তিন খানি চিঠি লেখেন।'

এই সময় সরকার পক্ষ থেকে চিঠিগুলি দাখিল করা হ'লো। চিঠিগুলোতে Ext PW 31, Ext PW 32, PW 33 নম্বব দেওয়া। তারপর মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'বলেন, 'আচ্ছা মিঃ হোসেন, চিঠিতে কী লেখা ছিল আপনার মনে আছে কি?'

'হুবহু মনে নেই। তবে বিষয়বস্তু মনে আছে। সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ জানান যে, তিনি ওখানে ছাত্র-সমাজেব সঙ্গে মিশে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা'র জন্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আবও জানান যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানেরও সে-সময় পূর্বপাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান না যাওয়ায় আন্দোলনের ক্ষতি হ'চ্ছে। আমি যেন তাঁর সম্পর্কে তাঁকে খোজ নিয়ে জানাই। তিনি অপর এক পত্রে জানান, শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকার বাসায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা হবে। আমি যেন সে সভায় যোগদানেব জন্য প্রস্তুত থাকি। প্রথম পত্রের উল্টো পিঠে বাম কোণে লেখা ছিল, আমি যেন তাঁর কাছে 'c/o মোহাম্মদ মতিউর রহমান (এস) 'পথিকাবাস'. ৪নং মোমেনপুর, ঢাকা—৫।' এই ঠিকানায় চিঠি লিখি। ব্রাকেটের 'এস' বর্ণটি অবশ্যই লিখতে বলেছিলেন। 'এস' মানে সুলতানউদ্দীন। চিঠিতে আমায় তিনি ঠিকানা লিখতে বারণ ক'রেছিলেন।

তৃতীয় পত্রে সুলতানউদ্দীন আমায় জানালেন, তিনি একটি গোপন প্রেস পেয়েছেন, আন্দোলনের জন্য সেখানে প্রচারপত্র ছাপা যাবে। আরও জানালেন, আমি কয়েকদিনের মধ্যে টাকা পাঠাচ্ছি,

লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদকে নিয়ে যেন আমি টাকা .পাওয়া মাত্র ঢাকা চলে যাই।'

এই সময় বিবাদীপক্ষের খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীর কথায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সাক্ষী চিঠিগুলোর অনুবাদ নিজের খেয়াল খুশিমতো ক'রছেন।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য ক'বে আমির হোসেনকে তাঁর সাক্ষ্য চালিয়ে যেতে বললেন।

আমির হোসেন আবার বলতে স্বরু ক'রলেন, 'ওই চিঠির সঙ্গে আমি একটি লিফলেটও পাই। কয়েকদিনের মধ্যে আমি ১৫০০শ টাকাও পেয়ে যাই। নূর মোহাম্মদও তাঁর টাকা পেয়েছিলেন।

সালেব ২৮ আগস্ট সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমি ঢাকা গেলাম। নূর মোহাম্মদ আমার সঙ্গে যেতে পারেন নি, তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার তখনো তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন নি।

বিমান থেকে নেমে দেখি, সুলতানউদ্দীন আহম্মদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। জীপ নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন। জীপে ধানমণ্ডীর ২নং রোডে একটা বাড়িতে আমায় নিয়ে গেলেন তাঁরা। বাড়িটার ফটকে নাম লেখা ছিল 'আলেয়া'। পরে জানতে পারি লেফটেনেণ্ট মোয়াজ্জেমের আত্মীয় ডাক্তার খালেকের বাড়ি ওটা। ওখান থেকে যাই ঢাকা হোটেলে। সেখানে আগে থেকেই সীট রিজার্ভ ক'রে রাখা ছিল। সুলতানউদ্দীন, এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও আমার সঙ্গে ঢাকা হোটেলে উঠলেন।

পরদিন হোটেল থেকে আগের দিনের ওই জীপটাতেই ডাক্তার খালেকের বাসায় গেলাম। জীপের নম্বরটা এখন আর আমার ঠিক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে তার প্রথম দুইটি সংখ্যা ছিল '৩৯'।

বেলা তিনটের সময় শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় গিয়ে

পৌঁছলাম। আমরা চার জনেই গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। শেখ মুজিবর রহমান আমাদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। সেই বৈঠকে রহুল কুদ্দুস সি. এস. পিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আলোচনার সূত্রপাত করেন মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বললেন, আমাদের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে আজ বিরাট একটি সশস্ত্র-বাহিনী গড়ে উঠেছে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠনের জন্যে। আমাদের আরও অস্ত্র এবং অর্থের প্রয়োজন।

এর পর মুজিব সাহেব কথা বললেন, আমি ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। শীগ্‌গীরই সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। আপাতত আমি আপনাদের কয়েকটা কিস্তিতে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দিচ্ছি। প্রয়োজনে আপনারা টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। আপনারা সশস্ত্র-বাহিনী গঠনের কাজ চালিয়ে যান, টাকার জন্য চিন্তা নেই।

বৈঠক শেষে আবার ঢাকা হোটেলে ফিরে এলাম। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম পরদিন করাচি চলে গেলেন। ১ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবর রহমান হোটেল খরচার জন্য আমার হাতে সাতশ' টাকা দিলেন।

একটা ট্যাক্সি ক'রে ৯ সেপ্টেম্বর আবার মুজিব সাহেবের বাসায় গেলাম।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ট্যাক্সিটা কার ছিল ?'

সাক্ষীর উত্তর : জনাব কে. জি. আহম্মদের।

তারপর আগের প্রসঙ্গে ফিরে আমির হোসেন বললেন, 'সেদিন শেখ মুজিবর রহমান আমার হাতে ৪ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তা থেকে হোটেল খরচা বাবদ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতানউদ্দীন আহাম্মদকে কিছু টাকা দিই। ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে গেল। ওই মাসের শেষাশেষি আমি করাচি চলে এলাম। করাচিতে গিয়ে সব টাকা আমি মোয়াজ্জেম হোসেনকে দিলাম। নভেম্বর মাসে করাচিতে আমার সঙ্গে কে. জি. আহাম্মদ

এবং ফজলুল রহমান সি. এস. পি-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। ফজলুল রহমান সাহেব তখন করাচিতে অর্থ-দপ্তরের ডেপুটি সেকরেটারি। নভেম্বর মাসে আমাদের দুটো বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের বাড়িতে। ওই সভায় প্রাক্তন করপোরাল সামাদও উপস্থিত ছিলেন। সামাদ '৫৩ সাল থেকেই আমার সহকর্মী। সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি শীগ্‌গীরই করপোরাল সামাদকে পূর্বপাকিস্তান পাঠাবেন।

তিনি আরও বললেন, 'আমাদের এখন কয়েকটা 'ট্র্যানজিসটার ট্র্যান্সমিটার' প্রয়োজন। সেই সময় ফজলুল রহমান সাহেব জানালেন. লণ্ডন থেকে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ট্র্যানজিসটার ট্র্যান্সমিটার আনাবার ব্যবস্থা ক'রছেন। তাঁর ছোটো ভাই লণ্ডনে পড়াশুনা ক'রতে গেছে। সে-ই সব ব্যবস্থা ক'রবে ওখানে।

দু-তিনদিন বাদে 'ইলাকা হাউসে' দ্বিতীয় বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম জানালেন, পূর্বপাকিস্তানে দ্রুত আন্দোলনের কাজ চলছে। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতানউদ্দীন আহম্মদ পুরোদমে সেখানে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তিনি জানান, পূর্বপাকিস্তানে পার্টির সদস্য সংখ্যা এখন তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। '৬৫ সালের নভেম্বরে আমিও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে দু'-একটা চিঠি পাই।'

এই সময় মঞ্জুর কাদের উঠে সাক্ষীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, 'দেখুন দেখি, এটাই কি সেই চিঠি?'

আমির হোসেন সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে আবার বলতে সুরু করেন, 'চিঠির শেষে অপর পত্রখানিতে 'M' লেখা ছিল। 'এম' মানে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। এরপর সাক্ষী একটা চিঠি পড়ে শোনাতে থাকেন: মাই ডিয়ার হোসেন সাব, আমার সালাম নেবেন। করাচি থেকে দু'খানি চিঠি পেয়ে সব জানলাম।

বড়ো ভাইয়া লিখেছেন, তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। বড়ো ভাইয়াকে বলবেন, এখানকার বড়ো ভাইয়ার নির্দেশ মতোই আমি চিঠিখানি লিখেছি।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এস. এ. রহমান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বড়ো ভাইয়া কে?'

'বড়ো ভাইয়া হ'লো করাচিতে লেফটেন্যানট মোয়াজ্জেম এবং ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমান। আমির হোসেন আবার চিঠির বাকি অংশ পড়তে লাগলেন: আমরা ওষুধের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি। লোকের অভাবে পাঠাতে পারছি না।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ওষুধ মানে কী?'

সাক্ষী জানালেন, ওষুধ বলতে এখানে টাকা-পয়সার কথা বোঝাচ্ছে। তারপর শেষাংশ পড়লেন তিনি: কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ক্রমে ক্রমে ঘরের মিস্ত্রিরা ভালো কাজ ক'রছে।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ঘরের মিস্ত্রি কী?'

সাক্ষী: মানে দলের কর্মীদের কথা বলা হ'য়েছে এখানে। তারপর আমির হোসেন আদালতে বললেন, অস্ত্রসস্ত্র এবং সমর্থন লাভের জন্য আমাকে ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাদের মনোভাব জেনে নেওয়ার নির্দেশ আসে পূর্বপাকিস্তান থেকে।

মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে পড়তে বললেন। আমির হোসেন চিঠিটা পড়তে সুরু ক'রলে হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে চিঠিতে বর্ণিত 'রোগীর অবস্থা ভালো' কথাটার মানে কী জানতে চান তিনি।

আমির হোসেন বললেন, 'রোগী বলতে এখানে পূর্বপাকিস্তানকে বোঝান হ'য়েছে। চিঠিটা লিখেছিল স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।'

সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি আর-একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। চিঠিটা লিখেছেন সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ।

সাক্ষী আমির হোসেন পড়তে স্বরু ক'রলেন : প্রিয় আমির সাহেব, প্রীতি জানবেন। আপনি অনেক কিছু জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। সব কিছুর জবাব আপাতত দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি তো ভালো ভাবেই আমাকে জানেন, নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই আশা করি। আমি কাজের লোক, কাজ ক'রতেই ভালোবাসি। আপনি জ্ঞানী লোক বেশি বলার দরকার করে না। আপনি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন কিনা জানাবেন। আপনি ঐ দেশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলুন।'

বাদীপক্ষের কৌস্থলির এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান, ''ঐ দেশ' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বুঝানো হ'য়েছে।'

সাক্ষী এর পর বলেন, 'আমি লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের কাছ থেকেও দু'খানি চিঠি এবং ২২শ' টাকা পাই। চট্টগ্রাম থেকে আগত একটি বাণিজ্য-জাহাজের স্টুয়ার্ড স্থলতানউদ্দীন আহম্মদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নাম ক'রে টাকাটা আমাকে দিয়ে যায়।

চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে সালের ফেবরুয়ারিতে বদলি হ'য়ে আমি পূর্বপাকিস্তানে এলাম। এখানে আসার পর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে তিনখানা ডায়েরী দিয়ে ভিতরকার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ ক'রতে বললেন।'

এই সময় মঞ্জুর কাদের একটি ডায়েরী হাতে নিয়ে সাক্ষীকে বললেন, 'দেখুন দেখি এটা চিনতে পারেন কিনা?'

সাক্ষী বললেন, 'হ্যাঁ, ওই তিনটে ডায়েরীর একটা এটা। ডায়েরীর হাতের লেখা লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের। আগে থেকেই আমি তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত। ডায়েরীতে একটি অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ছিল আর দলের প্রধানদের কতগুলো কোড নাম। শেখ মুজিবর রহমানের ছদ্মনাম 'পরশ'; স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান—'মুরাদ'; লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন 'তুহিন'; লীডিং সীম্যান স্থলতানউদ্দীন আহম্মদ—'কমল'; সি. এস. পি.

এ. এফ. রহমানের ছদ্মনাম দেওয়া হ'য়েছে 'তুষার'; লীডিং সীম্যান নুর মোহাম্মদের নাম 'সবুজ'; 'শেখর' হ'লো সি. এস. পি রুহুল কুদ্দুসের নাম আর আমার নাম দিয়েছিল 'উল্কা'।

ডায়েরীতে আরও নির্দেশ ছিল 'আমার বদলির জন্য 'কে. জি.'র সঙ্গে ঢাকায় যোগাযোগ ক'রবেন। অর্থাৎ করাচি থেকে চট্টগ্রামে লে. মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলির জন্য যেন আমি ঢাকায় ন্যাশন্যাল শিপিং করপোরেশনের ডিরেক্টর কাজী গিয়াসউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করি। 'কে. জি.' কাজী গিয়াসউদ্দীনের সংক্ষিপ্ত নাম। অন্যান্য নির্দেশগুলি হ'লো: 'ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রবেন, সামাদ আর দোহার চাকুরির ব্যবস্থা ক'রবেন; টাকা জোগাড় ক'রে পাঠাবেন; সুলতান ও মুজিবরের সঙ্গে দেখা ক'রবেন; কে. জি.'র কাছ থেকে জীপ নেবেন।'

মঞ্জুর কাদের বললেন, 'আমির সাহেব আপনি কি এই সব নির্দেশ-গুলোর অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন? থাকলে একটু ব্যাখ্যা করুন।'

আমির হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আগেই কিছু কিছু আলোচনা হ'য়েছিল। 'ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রবেন' বলতে বুঝিয়ে ছিলেন ঢাকায় আমার থাকার জন্য এবং ভারত থেকে যে-সব অস্ত্র পাব তা রাখার জন্য আমি যেন একটা বাড়ি ভাড়া করি এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ শেখ মুজিবর রহমান এবং আহম্মদ ফজলুল রহমানের কাছ থেকে নিয়ে নি। সামাদ আগে ছিল কর্পোরাল আর দোহা ছিল এয়ারম্যান। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিলে ওদের যেন আমি চাকুরির ব্যবস্থা করে দিই। তারপরের নির্দেশটিতে শেখ মুজিবর রহমান অথবা অন্য কারু কাছ থেকে টাকা জোগাড় ক'রে পাঠাতে বলেছে। এর পরের নির্দেশটি তো স্পষ্টই। কে. জি. আহাম্মদের কাছে জীপটি নিতে বলা হ'য়েছিল। গিয়ে শুনলাম, কামালউদ্দীন আহাম্মদের জীপ। তাই তাঁর কাছে আমি আর জীপটি চাই নি।'

মঞ্জুর কাদের বললেন, 'আচ্ছা, এই যে '৬৪ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখের ডায়েরীতে যে-সব নির্দেশ রয়েছে, তা কার হাতের লেখা আপনি চেনেন ?'

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ, লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের। 'এতো তাড়াতাড়ি নয়,' এই শিরোনামায় তিনটে নির্দেশে বলেছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগাযোগমন্ত্রী সবুরকে আনতে চেষ্টা ক'রতে ; ভারত, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে এবং মাল খালাসের ব্যবস্থা ক'রতে অর্থাৎ মুজিবর যদি ভারত থেকে সমরাস্ত্র পায়, তাহ'লে সেগুলো খালাস ক'রে জায়গা মতো রাখতে বলেছিল। তার পরের পাতায় 'তথ্যের তালিকা' শিরোনামায় ছিল জেলা ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপের কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণ, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তাদের বাসার ঠিকানা, স্কুল-কলেজের নাম ঠিকানা, সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ শিপিং কোম্পানীর মালিক এবং ডিরেক্টরদের নাম ঠিকানা। জেলে আটক ব্যক্তিদের খালাস পাওয়ার সম্ভাব্য তালিকা, বিশ্বস্ত ও যোগ্য পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের তালিকা, দক্ষ সি. এস. পিদের নাম-ঠিকানা, রেলওয়েতে কর্মরত উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসারদের ঠিকানা, সাবেক সাভিসমেন এবং তাদের বর্তমান যোগ্যতার পরিচয়, বাস-ট্রাকের ঠিকানা এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আইনজীবিদের নাম-ধাম। সব শেষে ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের মানচিত্র জোগাড় ক'রতে নির্দেশ দিয়েছিল। সুবেদার আশরাফ আলী আমায় একটা ক্যাণ্টনমেণ্টের স্কেচ দিয়েছিল। সেটা কোন্ ক্যাণ্টনমেণ্টের আমি জানি না। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমায় বলেছিলেন যে, তিনি এম. ই. এস-এর এস. ডি. ও.'র কাছ থেকে তিনটি ক্যাণ্টনমেণ্টের মানচিত্র স গ্রহ ক'রেছেন।

সরকারপক্ষের কৌসুলী মঞ্জুর কাদের বললেন, 'ডায়েরীর এক জায়গায় যে শপথের কথা রয়েছে তার মানে কী ?'

রাজসাক্ষী আমির হোসেন বললেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নয়া যোগদানকারীদের শপথ নেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে।'

আমির হোসেন একটু থামলেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আদালতকক্ষে। থম থম ক'রছে দর্শকদের মুখ। তারপর বিচার-পতির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে সুরু ক'রলেন, '১৯৬৬ সালের ২ ফেবরুয়ারি করাচি থেকে আমি ঢাকায় আসি। তখন ঢাকা হোটেলে উঠেছিলাম। ৫ ফেবরুয়ারি আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকা থেকে করাচি যাই। সেখানে 'হোটেল মিশকা'য় উঠি। সেই হোটেলেই স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ, এ. বি. খুরশিদ, খুদে অফিসার রহমান—এবং লেফটেন্যান্ট হক একে একে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমাদের গোপন অধিবেশন হয় 'মিশকা হোটেলে'র ৩নং রুমে। এ. বি. খুরশিদ সেনাবাহিনীর এ পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে পেরেছেন সেই বৈঠকে তাঁদের নামের একটা তালিকা দেন। সেখানে ঠিক হয় যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কাজকর্ম বর্ষার সময় সুরু করা হবে। কারণ বর্ষার সময় পূর্ববাঙলার অধিকাংশ জায়গা বন্যায় প্লাবিত হ'য়ে যায়। ফলে মিলিটারির যাতায়াত এখনকার মতো সহজ সাধ্য হবে না।

৬ তারিখে ওই রুমেই আবার আমাদের বৈঠক বসে। সেদিনের সভায় মানিক চৌধুরী, বিধানচন্দ্র সেন এবং ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের সুবেদার রাজ্জাকও ছিলেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তাঁদের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দেন। ওই বৈঠকেই পার্টির কাজের জন্য মানিক চৌধুরী আমার হাতে তিন হাজার টাকা দিলেন।

৮ ফেবরুয়ারি আমি ঢাকা চলে আসি। এবার উঠলাম 'হোটেল আরজু'তে।'

এই সময় PW 3/32 চিহ্নিত একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে মঞ্জুর কাদের বললেন, 'এ চিঠি কে কার কাছে লিখেছে?'

'সাক্ষী. 'আলো' লিখছে 'উল্কার' কাছে, অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন চিঠিটা আমার কাছে লিখেছিলেন।'

তারপর মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর কাছে চিঠিতে উল্লিখিত কয়েকটি সাঙ্কেতিক কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

প্রশ্ন: চিঠিতে যে 'কনট্রাক্টবী ব্যবসার' উল্লেখ আছে সেটা কী?

উত্তর: সেটা আন্দোলন।

প্রশ্ন: 'মায়ের অসুখের' অর্থ কী?

উত্তর: পূর্বপাকিস্তানেব অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে।

প্রশ্ন: 'ডাক্তার' কে? আর ওষুধ-পত্রই-বা কী?

উত্তব: ডাক্তার শেখ মুজিবব রহমান, ওষুধপত্র হ'লো অস্ত্রসস্ত্র।

মঞ্জুব কাদের বললেন, 'বেশ, এবারে তার পরেব ঘটনা বলুন।'

সালেব মার্চ মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে একটি নির্দেশ আসে। এক্স কপোরাল সামাদকে আহম্মদ ফজলুল বহমানেব কাছে নিয়ে গিয়ে যেন তাঁর চাকুরির ব্যবস্থা ক'রে দিই। আহম্মদ ফজলুল রহমান তাঁকে ধানমণ্ডিতে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে ম্যানেজারেব চাকবি দিলেন। তাঁর কাজ হ'লো ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারি এবং আহম্মদ ফজলুল রহমানের মধ্যে যোগাযোগের এজেন্ট হিসেবে কাজ কবা। পেট্রোল পাম্পটির মালিক মিসেস ফজলুল রহমান।

মার্চ মাসেই মহাখালী এয়ারপোর্টের কাছেই এক স্থানে গোপন বৈঠক ডাকলাম। কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ই. পি. আর. টি. সি ক্লার্ক মুজিবর রহমান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ইউসুফ কম্পাউণ্ডার, ই. পি. আর. টি. সির সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, এডুকেশনাল ইনস্ট্রাক্টর ফ্লাইট সার্জেন্ট হক, নওয়াজ, জি. টি. জেড. এ. চৌধুরী, ও সার্জেন্ট মিয়া।'

মঞ্জুর কাদের-এর কথায় সাক্ষী তাঁদের সনাক্তও ক'রলেন।

তারপর বললেন, 'ওই সভায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতি সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা করি।'

এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের সাক্ষী আমির হোসেনের হাতে একটি দলিল তুলে দিলেন। ভালো ক'রে দেখে আমির হোসেন বললেন, এটা একটা ক্যান্টনমেণ্টের স্কেচ। এটা আমায় দিয়েছিলেন সুবেদার আশরাফ আলী।

১২ মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় এলেন। সেদিনই সন্ধ্যেয় আওয়ামীলীগ-সম্পাদক তাজিমউদ্দীনের বাস্‌ভবনে এক বৈঠক হ'লো। আমরা তো ছিলামই, শেখ মুজিবর রহমানও ছিলেন সেই বৈঠকে।'

মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'কী আলোচনা হ'য়েছিল সেই বৈঠকে?'

সাক্ষী: বৈঠকে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম বললেন যে, আমরা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর বহু লোককে আমাদের আদর্শে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ ক'রতে পেরেছি। ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রসস্ত্র পেলেই আমরা বিপ্লবের দিন ঠিক ক'রবো। পূর্ববাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষও আমাদের পিছনে আছে। শেখ মুজিবর রহমান জানালেন, অস্ত্রসস্ত্রের ব্যাপারে শীগ্‌গীরই হাবিলদার দলিল-উদ্দীন এবং জয়দেবপুর থেকে একজন ক্যাপ্টেনকে ভারতে পাঠানো হবে। অস্ত্র পাওয়া মাত্র গেরিলা ট্রেনিং-এর কাজ সুরু হবে রাঙামাটি এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায়।'

বাদীপক্ষের কৌঁসুলীর জিজ্ঞাসা: সেই বৈঠকে কি তাজিমউদ্দীন-সাহেব উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: না।

এর পর সুরু হয় বিবাদীপক্ষের জেরা। মুজিবর রহমানের সমর্থনকারী বিখ্যাত বৃটিশ আইনজীবি এবং শ্রমিকদলের সদস্য মিস্টার টমাস উইলিয়াম আমির হোসেন মিয়াকে ঘণ্টা আড়াই ধরে জেরা ক'রলেন।

টমাস উইলিয়াম আমির হোসেনকে জিজ্ঞেস ক'রলেন নাটকীয় ভঙ্গীতে, 'মিয়া সাহেব, আপনি বিয়ে ক'রেছেন?'

আমির হোসেন একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'জী হ্যাঁ।'

প্রশ্ন : ছেলেপুলে কয়টি?

উত্তর : ছেলেপুলে হয় নি।

প্রশ্ন : করাচিতে আপনি কোথায় থাকতেন?

উত্তর : জাহাঙ্গীর রোডে।

প্রশ্ন : ঢাকায় আসার পর কোথায় ছিলেন?

উত্তর : ঢাকা হোটেলে—১৯৬৬ সালের ৪ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। পরে আরজু হোটেল-এ ছিলাম।

প্রশ্ন : আরজু হোটেল থেকে উঠে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : ১০৭ দীননাথ সেন রোডে—ভাড়া বাড়িতে উঠি।

প্রশ্ন : বাড়ির মালিকের নাম কী?

উত্তর : এ্যাসিসট্যাণ্ট সেসন জজ হারুন-অর-রশিদ।

প্রশ্ন : আগে তাকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কবে?

উত্তর : ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষে অথবা মে-এর প্রথম সপ্তাহে।

মিস্টার উইলিয়াম বললেন, 'তার মানে, দীননাথ সেন রোডের বাসায় ওঠার কিছুদিন বাদেই।'

'হ্যাঁ।'

'দল ছাড়ায় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম আপনাকে ভয় দেখান নি?'

'হ্যাঁ।'

'সে-অনুযায়ী কোনো ক্ষতি ক'রেছিলেন কি?'

'না।'

এরপর মিস্টার উইলিয়াম পি. ডব্লিউ ৩।৫৯ চিহ্নিত একটি দলিল

দেখিয়ে বললেন, এটা আপনি চিনতে পারেন কী ? নিশ্চয়ই পারছেন। আপনাকে করাচিতে ডেকে পাঠানো হ'য়েছে। কিন্তু কেন ?

'জানি না।'

'আপনি কখন গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন।'

'ওই বছরই ১৩ ডিসেম্বর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামতেই দু'জন সাদা পোশাক পরা পুলিশ আমাকে ধরে সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল।'

'আপনি যে গ্রেপ্তার হবেন সেটা কি আগে থেকেই জানতেন ?'

'না।'

'তারপর সেখান থেকে রাজারবাগে নিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ধরে জেরা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রল।'

টমাস উইলিয়াম একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে গলার স্বরটা নামিয়ে বললেন, 'মিয়া সাহেব, অত্যাচার হয় নি, মাত্র দু-ঘণ্টার জেরায়ই কি আপনি বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।'

আমির হোসেন একটু উত্তপ্ত স্বরে বলল, 'বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

'কোন্ পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেছিলেন ?'

'ডি এস পি মান্নাফ ও আর দু'একজন।'

'ডাইয়েরী দুটো আনবার চিরকুট কার হাতে দিয়েছিলেন ?'

'মান্নাফসাহেবের হাতেই।'

'পরে যে চিঠিগুলি দাখিল ক'রলেন সে সময় চিঠিগুলির কথা বললেন না কেন ?'

'মনে ছিল না।'

'চিঠিগুলো কেন আপনি রেখে দিয়েছিলেন ? এসব চিঠি নিশ্চয় নষ্ট ক'রে ফেলা বিধেয়।'

আমির হোসেন এসময় একটু থতমত খেয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে আত্মজীবনী লিখব। তখন কাজে লাগবে।'

'চিঠি এবং ডাইয়েরীগুলো পুলিশের হাতে পড়লে খুবই বিপদ হ'তে পারে জেনেও আত্মজীবনী লেখার জন্য তা রেখে দিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

টমাস উইলিয়াম মৃদু হেসে বললেন, 'মিয়া সাহেবের দেখছি, আত্মজীবনী লেখার খুবই সখ।'

এই কথায় দর্শকদেব গ্যালাবী থেকে চাপা হাসির রোল উঠল।

টমাস উইলিয়াম এবাব টেবিল থেকে একটা টেলিগ্রাম তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ১৯৬৫ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বরে কি আপনি ঢাকায় এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের নির্দেশ অনুযায়ী ২৮ আগস্ট তারিখে পার্টি মাটিং-এ যোগ দিতে ঢাকায় আসি।'

'আপনি কি ওই সময় কবাচি অফিসে টেলিগ্রাম করেছিলেন পি আই-এ'ব ফ্লাইট বন্ধ। পবামর্শ চাই।'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ফ্লাইট বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল।'

টমাস উইলিয়াম এবারে টেলিগ্রামটি আমিব হোসেনের হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রেরকেব ঠিকানাটা জোরে জোরে পড়ুন তো।'

সাক্ষী জোরে জোরে পড়লেন, '১০৭, ডি এন .সন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪।'

'পোস্ট-অফিসের স্ট্যাম্পের তারিখটা কতো ?'

কাচুমাচু ক'রে আমির হোসেন বললেন, '১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।'

'আপনি বলেছেন ওই বাসায় ১৯৬৬ সালের এপ্রিল যান। এবং বাড়ির মালিককে আগে থেকে চিনতেন না। ব্যাপার কী ?'

'সাক্ষী আমির হোসেন হতবুদ্ধি হয়ে চুপ ক'রে থাকেন।

দর্শকদের গ্যালারিতে গুঞ্জন ওঠে। টমাস উইলিয়াম এবার জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে তো ভারত, আমেরিকা এবং

চীনের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছিল। 'আপনি যোগাযোগ ক'রেছিলেন কি ?'

'আমি নিজে করি নি। ১৯৬৫ সালের জুন-জুলাই মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন করাচিতে মার্কিন দূতাবাসের এ্যাসিসট্যান্ট নৌ-এ্যাটাচি মিস্টার নোবল-এর বাসায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমাদের পরিকল্পনা জানিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চান।'

'তাহলে তো মোয়াজ্জেম সাহেব নিজেই যোগাযোগ ক'রতে পারতেন, আপনাকে বলেছিলেন কেন ?'

'জানি না। যাঁরা ভার দিয়েছিল তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

টমাস উইলিয়াম রহস্য ক'রে বললেন, 'ও ? তাই নাকি ?'

তারপর টমাস উইলিয়াম বসতে বসতে সালাম সাহেবকে জেরা ক'রতে বললেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান উঠে দাঁড়ালেন। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনার গায়ের ওই হাওয়াই সার্টটা আপনার কেনা ?'

আমির হোসেন একটু রুষ্ট ভাবেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কিসের শার্ট ? কতো দাম ?'

'টেট্রনের। বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।'

'আচ্ছা, মিয়াসাহেব আপনার পায়ের জুতোজোড়াও কি কেনা ?'

আর যায় কোথা ? ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়ে সাক্ষী বললেন। 'রাবিশ। আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

সালাম খান ততোধিক জোর দিয়ে বললেন, 'জবাব আপনাকে দিতেই হবে।'

উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন আমির হোসেন, 'না, দেবো না।'

সাক্ষীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে বিবাদীপক্ষের সকল কৌঁসুলী এক যোগে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালেন।

বিচারপতি আমির্ব হোসেনকে ক্ষমা চাইতে বললেন। আমির হোসেন ক্ষমা চাওয়ার পর অবস্থা আবার শান্ত হ'লো। ফের জেরা স্বুরু হ'লো।

সলাম খান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গী-সাথীরা যে-গ্রেপ্তার হ'য়েছেন আপনি জানতেন না ?'

'না।'

'আপনি কোন্ পত্রিকা পড়েন ?'

'পাকিস্তান অবজারভার।'

'পাকিস্তান অবজারভারে কি আপনি ওই খবর দেখেন নি ?'

'না ?'

'গ্রেপ্তারের পর আপনাকে সার্চ ক'রে যে 'সীজার লিস্ট' তৈরি ক'বেছিল পুলিশ তাতে কি চাবিব কথা উল্লেখ ছিল ?'

'জানি না।'

সালাম খান বললেন, 'তাহ'লে পুলিশের কাছে আগেই চাবিটি দিয়ে রেখেছিলেন আপনার ব্যাগটি খুলে ডায়েরী বার ক'রবার জন্য।'

'না। আমি গ্রেপ্তারের পর দিয়েছিলাম।'

সালাম খান হেসে বললেন, 'আপনার কাছে চাবি থাকলে সেই সময় নিশ্চয়ই পুলিশ তা পেত এবং সীজারলিস্টে তার নাম থাকত।'

'পুলিশ কেন লিস্ট করে নি আমি কী ক'রে বলব ?'

'কে. জি. আহম্মদ কি আপনাদের দলের সদস্য ছিলেন ?'

'না।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি বলেছিলেন কে. জি. আহাম্মদ আপনাদের দলের সদস্য ছিলেন ? আবার এখন বলছেন ছিলেন না। তু'রকম কথা কেন ?'

সাক্ষী নীরব রইলেন।

আবার প্রশ্ন করেন আবতুস সালাম খান, '১৯৬৫ সালের আগস্টের শেষে কতোদিন ছিলেন ঢাকায় ?'

'২৬ দিন। ঢাকা হোটেলেই ছিলাম।'

'ঢাকা হোটেলের রেজিস্টারে কি নাম ছিল ?'

'না, আমি নাম তুলি নি।'

'হোটেল আরজুতে কি আপনার নাম ছিল ?'

'নিজের নামে ছিলাম না সেখানে, আবদুর রহিম নামে থাকতাম।'

'১৯৬৫ সালের আগস্টে ঢাকায় এসে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ, ২৯ আগস্ট ধানমণ্ডীর 'আলেয়া'তে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।'

'যুদ্ধের সময় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন কোথায় ছিলেন ?'

'করাচির নৌবাহিনীর সদর দফতরে লিয়াজো অফিসার হিসাবে কাজ ক'রতেন।'

'করাচির নৌবাহিনীর সদর দফতরটা কোথায় ?'

'জানি না।'

'সমুদ্রবক্ষে কি ?'

'আমি জানি না।'

'আপনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন, যুদ্ধটা তখনই হয়েছিল, তাহ'লে লে. মোয়াজ্জেম ঢাকায় কী ক'রে এলেন সেই সময় ?'

সাক্ষী নীরব।

'আলেয়া থেকে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ির দূরত্ব কতটুকু ?'

'মীরপুর রোড হ'য়ে গেলে এক মাইলের মতো।'

'মীরপুর রোড হ'য়ে কেন ? সব চেয়ে সোজা রাস্তাটার কথা বলুন।'

'জানি না।'

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বললেন, 'পরে করাচি থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে এসে ঢাকা হোটেলে ছিলাম, স্বনামেই। হোটেল ত্যাগ করি ১৯৬৬ সালের ৪ ফেবরুয়ারি।'

'ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আপনি কীসে গিয়েছিলেন ?'

'ট্রেনে।' পরক্ষণেই বলেন, 'আমি ঠিক মনে ক'রতে পারছি না বিমানে না ট্রেনে গিয়েছি।'

'আপনি বলেছেন, আপনারা ক্যান্টনমেন্টগুলো আক্রমণের জন্য 'ডি-ডে'র অপেক্ষা ক'রছিলেন। বেসামরিক স্ট্রাটেজি পয়েন্টগুলো ছিল গভর্নর হাউস, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, ওয়ারলেস সেণ্টার, পুলিশ হেডকোয়ারটার। ইত্যাদি—কেমন ?'

'জ্বী হ্যা।'

হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে সালাম খান জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'হোসেন ফ্লাওয়ার মিল চেনেন ?'

'হ্যা। শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে আমি ওই আটার কল স্থাপন করার জন্য প্যাড ছেপেছিলুম।'

'আটার কল দিতে কতো টাকা লাগে ?'

'দুই-তিন হাজারে হ'য়ে যায় সম্ভবতঃ।'

'প্যাডে ১০৭ ডি. এন সেন রোডের ঠিকানা ছিল ?'

'হ্যা।'

'আপনি কি আটার কলটা ক'রেছিলেন ?'

'না। টাকার অভাবে করতে পারি নি।'

'কিন্তু সেই সময় তো ব্যাঙ্কে আপনার ১০ হাজার টাকা ছিল।'

'হ্যা, তবে টাকাটার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'টাকার কথা ভুলে গিয়েছিলেন—স্ট্রেনজ্! আপনি তো দেখছি চাকরি আর আটার কল নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন? আন্দোলন করার সময় মোটেই ছিল না।'

'তা ঠিক।'

'আচ্ছা, ব্যাঙ্কে জমানো ১০ হাজার টাকা আপনি কোত্থেকে পেলেন ?'

'চাকরি ক'রে টাকাটা জমিয়ে ছিলাম আমি।'

একটু মুচকি হেসে আবদুস সালাম খান বললেন, 'ও বেশ! বেশ! বিমান-বাহিনীতে তো আপনি ওয়ার ম্যান হিসেবে ঢোকেন। তখন কতো বেতন পেতেন?'

'৪৭ টাকা।'

'কতোদিন ওয়ারম্যান ছিলেন?'

'মনে নেই।'

'করপোরাল হ'লেন কোন্ বছর?'

'স্মরণ ক'রতে পারছি না।'

'কর্পোরাল হিসাবে চাকুরিতে অবসর গ্রহণের সময় আপনার মাসিক বেতন ১৭৫ টাকা ছিল না কি?'

'জী হ্যাঁ।'

'আপনার একটা পোস্টাল সেভিংস একাউণ্টও আছে।'

একটু ইতস্তত ক'রে আমির হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ আছে।'

অতো কম বেতনে চাকুরি ক'রে আপনি ওই টাকা জমিয়ে ছিলেন এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'আপনাদের ভাবনার ওপর আমার হাত নেই।'

'বিপ্লবের জন্য আপনারা কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রেছিলেন?'

'আমি থাকা পর্যন্ত কিছুই হ'তে দেখি নি।'

'আচ্ছা দলে নতুন লোক নিলে আপনি তো শপথ গ্রহণ করাতেন। শপথের বয়ানটা কী ছিল?'

তোতলাতে তোতলাতে জবাব দিলেন সাক্ষী, 'মানে, পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বাধীনতা চাই....পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে—এই সব আর কি!'

'অর্থাৎ এর বেশি আপনি জানেন না।'

'না, আরও আছে।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানই বললেন, 'কী সেগুলো বলুন।'

সাক্ষী বেশ ঘাবড়ে যান। বিচলিত স্বরে বলতে থাকেন,

'পূর্বপাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমপাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে ·পূর্বপাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিমপাকিস্তানে বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে—এই সব আর কি !'

সালাম খান তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'শুধু এই ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনার ওপর পাঁচজন জাঁদরেল সি. এস. পি অফিসারকে দলে টানার নির্দেশ ছিল। কী এমন যোগ্যতা আপনার আছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আপনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'লো ? আপনি তাঁদের চেনেন না, তাঁদের দলে টানার মতো বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই আপনার নেই।'

'যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা জানেন।'

'আমি যদি বলি তাঁদের মামলায় জড়ানোব উদ্দেশ্যে মিথ্যা তাঁদের নাম ক'বেছেন ?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'আপনার ওপর ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, সবুর খানের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে বলা হ'য়েছিল, সি. এস. পি অফিসারদের দলে টানতে বলেছিল—কোনো কাজই করেন নি। তারপরেও দলের নেতাদের আপনার ওপর আস্থা ছিল বলতে চান, এবং সমস্ত গোপনকথা আপনাকে জানানো যেন একটা অবশ্য কর্তব্য ছিল ? যেখানে যতো গোপন মীটিং হ'য়েছে আপনি রয়েছেনই, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?'

'আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আমার হাত নেই।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানেব দিকে চেয়ে আবদুস সালাম খান বললেন, 'স্যার, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

বিচারপতি সেই দিনের মতো আদালতের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা ক'রলেন।

দলে দলে লোক বেরিয়ে এলো আদালতকক্ষ থেকে।

বিকেল হ'য়ে এসেছিল। সূর্যের আলো গাছের মাথায় চিক চিক ক'রছে। দুপাশে গাছের সারি। ক্যাণ্টনমেণ্টে যাবার পিচের রাস্তাটা ছায়া-ছায়া। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দেখলাম মিলিটারিরা খাকি প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে ফুটবল খেলছে। ঘেমে সপ্‌সপে হ'য়ে গেছে গায়ের গেঞ্জি। 'No Entry' এ্যারো চিহ্নিত পোস্টটা বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম।

'আগড়তলা মামলা'টা দাঁড় করাতে আয়ুবকে তো বেশ কাঠখড় পোড়াতে হ'য়েছে। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক শেখ মুজিবব রহমান দেশদ্রোহী একথা পূর্বপাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি লোক কখনোই মেনে নেবে না। গণ-আদালতে ভেস্তে যাবে সব জারিজুরি।

অনেকদিন বাদে অভাবিত ভাবেই সুকান্ত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে খানসাহেবের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। শহীদ খানকে আমবা খানসাহেব বলেই ডাকি। শহীদ আমাদের অনেকদিনের বন্ধু। আতোয়ারের সঙ্গেই ট্রেডইউনিয়ন ক'বে। ন্যাপের একনিষ্ঠ কর্মী। তাছাড়া কবিও। সব ঋতুতেই তাব পরিধেয় পাজামা আর সার্ট। মাথাব টাকটা ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে দেখলাম। একগাল হেসে এগিয়ে এলো, 'আবে কল্হন যে!'

মুচকি হেসে জবাব দিলাম, 'আমারও তো একই প্রশ্ন।'

'আর বলবেন না, জেল থেকে বেবিয়েই খুলনা চলে গিয়েছিলাম। ট্রেড ইউনিয়নেব ব্যাপারে। জেলে থাকায় ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনে বড়ো ভাটা পড়ে গিয়েছিল।' বলে আমার হাতে আলতো করে হাত বেখে বললেন, 'চলুন, রণেশদা এবাবে বলবেন। অনুষ্ঠান শেষে তোড়ে আড্ডা জমাবো। আজ আর কোনো কাজ নয়।'

আসরের মাঝখানে বসতে বসতে ভাবছিলাম খানসাহেবের কথা। তাঁব কাজে এবং আদর্শে কোনো ফারাক নেই, ফাঁকি নেই। দুনিয়ার সব শোষকেব বিরুদ্ধে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁব লড়াই। ওঁর প্রিয় কবি সুকান্ত। সুকান্তর মতো শহীদেরও প্রশ্ন: 'বলতে পারো ধনীর মুখে যাবা জোগায় খাদ্য, ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?' ওর কাছে জাত নেই, ধর্ম নেই, পুজোর প্রসাদও খায়, আবার উরুসের সিন্নিও নেয়। মানবতাই ওঁর ধর্ম। '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভুয়া অভিযোগ তুলে তুলে আয়ুবের বশংবদ কর্মচারিরা হিন্দু নির্যাতনে উঠে-পড়ে লাগে। যখন-তখন আনসার-বাহিনী আর কনভেনশন

মুসলিমলীগের কর্মীরা হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে যুদ্ধফাণ্ডের জন্য মোটা টাকা চাঁদা দাবি ক'রত। একবারও বিবেচনা ক'রে দেখত না, টাকাটা দেওয়ার মতো সঙ্গতি তাঁর আছে কি না। একজন সামান্য পানওয়ালার চাঁদা ধার্য হ'য়েছিল পাঁচশ টাকা। না দিতে পারলেই হ'য়ে যেত সে দেশদ্রোহী।

আনসার-বাহিনী হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে বলত: কাল রাতে ছাদের ওপর থেকে ভারতীয় বোম্বারদের আলোর সংকেত দেখাচ্ছিল। ইনডিয়ান স্পাই। তারপর তার ওপর চলত পুলিশের অকথ্য নির্যাতন। রোজ হিন্দুদের এরকম অন্যায়ভাবে নির্যাতন ক'রতে দেখে ক্ষেপে গেল শহীদ। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে তীব্র ধিক্কারে আয়ুব ও আয়ুবের বশংবদ আনসার-বাহিনী এবং কর্মচারিদের মুখোস খুলে ফেলল। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনল। শহীদকে হাজতে না পুরলে তাদের সব কীর্তিকলাপ ফাঁস হ'য়ে যাবে। হিন্দুদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় ক'রে রাতারাতি ধনী হবার পথও বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাই তারা শহীদকে থাকতে দিল না বাইরে। কিন্তু শহীদের বক্তৃতায় ততোদিনে অনেকেরই চেতনা হ'য়েছে। হিন্দুদের ওপর এই অন্যায় নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে স্থরু ক'রেছে অনেকেই। এমন কি কনভেনশন মুসলিমলীগের তু'একজন সহৃদয় নেতাও ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ ক'রলেন।

থানার দারোগাদের তো বরাবর অত্যাচারী বলেই জানতাম। বিশেষ ক'রে হিন্দু হ'লে তো কথাই নেই। তাঁদের মধ্যেও শহীদের মতো ছেলে গড়ে উঠেছে শুনে অবাকই হ'লাম। ঘটনাটি আমার শুভ-র দাদার কাছেই শোনা। ঢাকা আর্ট কলেজের কৃতি ছাত্র শুভ। '৬৭ সালের দাঙ্গার পর চলে গিয়েছে কলকাতায়,

দাদার কাছে। শুভ-র দাদা অনেক আগে থেকেই কলকাতায় থাকে। শুভদের বাড়ি কুমিল্লাতে—মা-বাবা ওখানেই থাকেন। '৬৫ সেপ্টেম্বরে শুভর দাদার বিয়ে ঠিক হ'লো। পাসপোর্ট ক'রে শুভ আর শুভ-র দাদা এলো কুমিল্লায়। ওরা কুমিল্লায় পৌঁছতে-না-পৌঁছাতেই পাক-ভারত যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে রাতও কাটাতে পাবে নি, শুভ আর শুভ-র দাদাকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরল। কেননা ওরা হিন্দু, ভারতের নাগরিক। বছরখানেক আগেও শুভ ছিল পাকিস্তানেব নাগরিক। আর আর নিজের গাঁয়েই ভারতীয় নাগরিক বলে ধরে নিয়ে গেল ওকে ঢাকায়। শেষে অনেক ধরাধবি কবায় পুলিশ প্রহরায় বিয়েব অনুমতি দিলো কর্তৃপক্ষ। বিয়ে ক'বতে আসছে শুভ-ব দাদা কুমিল্লায়। সঙ্গে শুভ। দুজনেবই হাতে হাতকড়ি। শুভ-র দাদা খুব অনুনয় ক'রে বলল, 'দেখুন কুমিল্লায় আমাদের সবাই চেনে। তাছাড়া বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি, এ অবস্থায় হাতকড়ি দিয়ে নামালে মাথা কাটা যাবে।'

কিন্তু সেপাই দুটো শুভ-র দাদাব কথায় কানও দিলো না! হাতকড়ি দিয়েই নিয়ে চলল বিয়ে-বাড়ি।

পুলিশ প্রহবায় বিয়ে হ'লো। বিয়েব পরেই আবার হাতকড়ি দিয়ে দু'জনকে নিয়ে এলো ঢাকায়। তেজগাঁ প্ল্যাটফরমে নামাব আগে সেপাই দু'টিকে আবাবও অনুনয় ক'রল হাতকড়ি খুলে দেওয়াব জন্য শুভ-র দাদা। শুভও বলল, 'আমাদের পরিচিত বন্ধু এখানে অনেক। দেখলে লজ্জার সীমা থাকবে না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

হাতকড়ি দিয়েই নিয়ে চলল ওদেব থানায়। হাজির ক'রল দারোগার সামনে। দারোগাটির বয়স অল্প, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর দেখতে। শুভ আর শুভ-র দাদাকে হাতকড়ি অবস্থায় দেখে রাগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে টেবিলের ওপর একটা ঘুঁসি বসিয়ে দাড়িওয়ালা সেপাই দু'টিকে

বললেন তিনি, 'এই শূয়রের বাচ্চা। এঁরা চোর না ডাকাত—এঁদের হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে নিয়ে এসেছিস কেন ? হারামির বাচ্চারা—লাথি মেরে তোদের 'প্যাটা গালব'। উল্লুকের বাচ্চারা শীগ্‌গীর হ্যাণ্ডকাপ খোল্।'

হতভম্ব সেপাই দু'টি তাড়াতাড়ি শুভ আর শুভ-র দাদার হ্যাণ্ডকাপ খুলে দিল।

দারোগা তখন স্বর একেবারে নরম ক'রে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না। বসুন।' তারপর হাঁক দিতেই একটি সেপাই এসে ঘরে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। দারোগাসাহেব বললেন, 'যা শীগ্‌গীর বাবুদের জন্য চা আর ভালো দেখে কেক নিয়ে আয়।'

পূর্ববাঙলার শহরে শহরে—গ্রামে, গঞ্জে এমনি আরো অনেক দারোগা, সরকারি কর্মচারি আজ তৈরি হ'চ্ছেন, জন্ম নিচ্ছে শহীদের মতো হাজার হাজার ছেলে। সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে কায়েমী শাসকদের স্বার্থসিদ্ধির দিন গত প্রায়। আগামী দিনের পূর্ববাঙলার উজ্জ্বল ছবি আজ দেখতে পাচ্ছি। যেদিন সেখানে থাকবে না হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টানে ভেদাভেদ ; সবাই সেখানে বাঙালী—সুখী সমৃদ্ধ এক জাতি।

রণেশদা মানে 'সংবাদ' এর সহকারি সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত তখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু ক'রেছেন : চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। কলকাতার একটা সাহিত্য আসরে আমরা প্রায়ই যেতাম। আমাদের ঢাকাইয়া এক কবি-বন্ধুর ধার ঘেঁসে লাজুক এক কিশোর এসে বসত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে জেনে নিত ঢাকার কথা, বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-মেঘনার কথা, জিজ্ঞেস ক'রত গ্রামবাঙলার কতো কথা! বাঙলার নদ-নদী, ধানক্ষেত, পাখি, হিজল অশ্বত্থের কথা। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত সে। আনন্দে তাঁর দু'চোখে সোনার কুচির মতো আলো ঝিকমিক ক'রে উঠত।

ঢাকা থেকে আমরা তখন 'প্রতিরোধ' নামে একটা কাগজ বের ক'রতাম। 'প্রতিরোধে'-এর সম্পাদকীয় দফতরে আমিও ছিলাম।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে একটা খাম এলো। ভিতরে ছুটো কবিতা। একটির নাম 'অবাক পৃথিবী'; অপবটির নাম 'বনস্পতি'। কবির নাম লেখা রয়েছে—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বনস্পতির প্রথম ছত্র পড়েই আমরা স্তম্ভিত: 'ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই, জানি আমি ভাবি বনস্পতি।' লেখা পেলেই আমাদের তখন কলম চালাবার অভ্যেস ছিল। কিন্তু আমাদেব সকলের সম্পাদকীয় বিদ্যেবুদ্ধি জড়ো ক'রেও কবিতা ছুটোতে কলম চালাতে পারলাম না। কে এই সুকান্ত ভট্টাচার্য? সঙ্গের চিঠিটা পড়ে পরিচয় জানতে পারলাম—কলকাতার সাহিত্য-আসরের লাজুক কিশোরটি সেই। ওই টুকুন ছেলের এই রকম বিস্ময়কর রচনা! 'প্রতিরোধ'-এ 'বনস্পতি' কবিতাটা ছাপলাম। 'অবাক পৃথিবী' ছাপলাম 'ক্রান্তি সাহিত্য-সংকলনে'।'

একটু থেমে রণেশদা আবার সুরু ক'রলেন, 'সুকান্ত মানবতার পতাকা নিয়ে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি মিছিলের শরিক হ'য়েছিল। তার সামনে রানারের পথের মতো একটি পায়ে চলার পথের বেখা ভবিষ্যতের দিকে উধাও হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এসব কথা গুছিয়ে বলে যাবার সময় সে পায় নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজটা করার দায়িত্ব যে আজকের তরুণ-তরুণীদেরই।'

রণেশদাব পরে একটি লিখিত রচনা পাঠ ক'রলেন ফেরদৌস আরা। ফেরদৌস আরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সভার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হঠাৎ-ই সুরু ক'রলো, 'স্নিগ্ধ সবুজ এক দেশ। যে দেশের বুক চিরে বয়ে গেছে রুপোলি নদী। আম জাম কাঁঠালের সবুজ পাতার আড়ালে দোয়েল, শ্যামা, বেনে-বউ প্রথম ভোরের গান শুনিয়ে যায়। সে-দেশে জুঁই ফুলের মতো বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর শব্দে। কলকাতার হালদার স্ট্রীটের ভাঙাচোরা দোতলার জানলায় বসে একটি ছেলে এসব ভাবতো আর ভালোবাসত। দেশকে ভালোবেসে সে লিখল:

'যে দেশের গাছের ছবি ছায়া
ফেলে নীল গাঙে.
একলা তুপুর যেথা বয়ে যায়
আনমনে—
অনেক অনেক পাখি যেথায় গায় নির্জনে
সে-দেশ আমার।'

সে-দেশের ছবি দেখে খুশি হ'লো, হাসলো সে। আর হাসতে হাসতেই হঠাৎ চমকে উঠলো দেশের আর-এক রূপ দেখে। সে-দেশের মেঘলা আকাশে কান্নাচাপা হাসি বিজলির ঝলকে ধার শানায়। তুপুরের লাল সূর্যের রৌদ্র জ্বালা ছড়ায়। দেখল, তার চারপাশে তুঃখ, মহামারী আর যুদ্ধের বিভীষিকা। দেখল, না খেতে-পাওয়া মানুষের কান্না। দেখে চমকে উঠলো সে, থমকে গেল মুখের হাসি; অবাক হ'তে হ'তে কাঁদতে গেল ভুলে। লিখল, অবাক পৃথিবী অবাক যে বার বার দেখি এই দেশে মৃত্যুব কাববার। সেই কিশোর ছেলেটির তুই গভীর কালো চোখের জমাটমেঘে হঠাৎ চলকে-ওঠা বিত্যুৎ শিখা জ্বলে উঠলো। তাকালো সে নীল আকাশের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল অনেক কথা। দেশের মানুষ ওর চিন্তা—চেতনায় এক হ'য়ে গেল। মানুষের প্রতি মমতায, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় ওর সমস্ত মন ভরে উঠল। কলমে এলো সূর্যের জ্বালা। বুকের ব্যথারা ওর ইচ্ছের ফুল হ'য়ে আগুনের ফুল্‌কি ছড়ালো।

'বলতে পারো বড়ো মানুষ মোটব
কেন চড়বে ?
গরিব কেন সেই মোটরেব তলায়
চাপা পড়বে ?'

লেখনীর ঝড় তুলল সে। কৃষ্ণচূড়ার কান্না রক্ত হ'য়ে ঝরল। কেঁপে উঠল অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আব তাদের সাঙাতরা।

তার অক্ষব বারুদের আগুনের মতো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। সারা দেশের মানুষের আপনার হ'য়ে গেল সেই ছেলে। নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় হ'য়ে রইল তাঁর নাম। সে ৪২ মহিম হালদার স্ট্রীটের সেই কিশোরটি—নাম যার সুকান্ত।'

করতালিতে ফেরদৌস আরাকে অভিনন্দন জানালো শ্রোতারা। তখনো হলের দেওয়ালে দেওয়ালে শুনছি ফেরদৌস আরার টসটসে মিষ্টি কণ্ঠের জ্বালা ধরানো কথার অনুরণন। খানসাহেবের দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি ভাবনার পাথারে ডুব দিয়েছে সে। দু'চোখে আশ্চর্য দীপ্তি। মাইকে ঘোষণা শোনা গেল: এবারে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন শহীদ খান। আমি গায়ে ঠেলা দিতেই তাঁর চমক ভাঙলো। এগিয়ে গেলেন মাইকের কাছে। বলিষ্ঠকণ্ঠে আবৃত্তি ক'রলেন:

'বলুক যে যা, আমার জানা
কোথায় ছিল তার ঠিকানা,
তার ঠিকানা।
সে ছিল ওই সৌরলোকের,
স্বর্ণ-স্বপন অগ্নি-চোখের
অগ্নি-চোখের!
সে ছিল আর এই ভূলোকের
স্বর্গ-গড়ার রিক্ত লোকের
নিশান,
নিশান ছিল লাল শপথের,
মুক্তিকামীর চলার পথেব
বিষাণ!
রক্ত মাখা তার জীবনের সাধ
নিপাত করো জুলুম-জল্লাদ।'

খানসাহেব নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। তখনো করতালিতে সভা মুখরিত হ'চ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে পলাশি হ'য়ে নিউ মার্কেটের রাস্তা ধবে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল খানসাহেবের সঙ্গে। অনেক কথা, এলোমেলো রাজনীতি থেকে ব্যক্তিগত। শ্রাবণের আকাশটা বৃষ্টি-ধোয়া-পরিষ্কার। বেলা শেষের আলো এসে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে। ভিজাঘাস থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে।

তারপর এক সময় বাসে উঠলাম। আবার হুট্ ক'রে নেমেও পড়লাম মিটফোর্ডের কাছাকাছি। খানসাহেব নিয়ে গেলেন মাটির নিচের সেই দোকানটায়—মুর্গি মুসল্লম খাওয়াতে। মুর্গি মুসল্লম খেতে খানসাহেব বড়ো ভালোবাসেন। ঢাকায় এলেই এখানে আসেন। এর আগে খানসাহেবের সঙ্গে অনেকবার এখানে এসেছি। ওপরটা অপরিচ্ছন্ন। ঘিঞ্জি। কিন্তু দোকানের ভিতরটা পরিষ্কার। টেবিলগুলোও পরিচ্ছন্ন। দোকানে ঢুকলেই দেখা যায় ধোপারা যে-রকম কাপড় ভাটি দেয়, তেমনি বিরাট একটা উনুনে একটা পাত্রে কাটা মুর্গি ডাঁই ক'রে রেখেছে—সেদ্ধ হ'চ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে খানসাহেবের পিছু পিছু নিচে নেমে গেলাম। খানসাহেব তখন রাজনীতি থেকে লিলিব প্রসঙ্গে এসে গেছেন। সামনের অঘ্রাণেই নাকি তাঁদের বিয়ে।

কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট। সিগন্যাল মেস।

আজ আতোয়ারও রয়েছে সঙ্গে। চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী-লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমান সাক্ষ্য দেবেন। রাজসাক্ষী। ডকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের চৌধুরীর জিজ্ঞাসার উত্তরে ডাঃ সাইদুর রহমান বললেন, '১৯৬৬ সালের জুন মাসে পনের দিন অন্তর আমার বাসায় দুটো গোপন বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকটিতে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, এল. এস. সুলতানউদ্দীন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এ বি. খুরশিদ ছিলেন। দ্বিতীয় বৈঠকেও তাঁরাই ছিলেন। ওই বৈঠক দুটোতে বিপ্লবদলের সদস্যদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ওইসব বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের ওপর তাঁরা জোর দেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বৈঠকে দলীয় কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পেশ ক'রেন। তাতে তিনি বলেছিলেন কোথায় কত নতুন লোক রিক্রুট হ'য়েছে, সামরিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে কতোটা যোগাযোগ ক'রতে পরেছেন। সেখানে আন্দোলন চালনার ভবিষ্যত কর্মপন্থা এবং অর্থ-সংগ্রহের বিষয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা চলে। আলোচনা চলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল নিয়ে। বৈঠকের সকলেই লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের সঙ্গে একমত হই যে, সশস্ত্র-বিপ্লব ছাড়া পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তানের আওতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়েও লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটির বাসায় প্রায়ই যেতাম এবং আন্দোলনের অগ্রগতিও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতাম। অনেক সময় সে

আলোচনায় এ. বি. চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন ও থাকতেন।

ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত জুলাই মাসে মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী পি. এন. ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রে একটা অস্ত্র-তালিকা দিয়ে আসতে বলেন। তালিকাটি মাণিক চৌধুরীরই দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গত মে মাসের ২১ তারিখে প্রতিরক্ষা আইনে সে গ্রেপ্তার হ'য়েছে। মাণিক চৌধুরীর সঙ্গে আগে দু' একবার আমি পি. এন. ওঝার কাছে গিয়েছি।

'৬৬ সালে ৮ জুন তারিখে শেখ মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার হবার পর আওয়ামীলীগের জরুরি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে আমি আর মাণিক চৌধুরী ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেই সময়ই ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন অফিসে মাণিক মিস্টার ওঝার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ করিয়ে দেয়। সে-সময়টায় আমার পক্ষে আর মিস্টার ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নি। কারণ, মুজিবর রহমানের ৬-দফা প্রকাশ হওয়ার পর আওয়ামীলীগের কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার সুরু ক'রে দিয়েছে। জুলাই-এর শেষাশেষি একদিন হঠাৎ ক'রে চট্টগ্রামে আমার বাসায় মিস্টার ওঝা নিজেই এসে হাজির হন। প্রথমেই তিনি মাণিক চৌধুরীর খোঁজ খবর নেন। তিনি পরদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি দিয়ে আসতে বলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর কাছে আমি অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌছে দিই। এ-সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনার জন্য তিনি আমায় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঢাকায় তাঁর ওখানে যত শীঘ্র নিয়ে যেতে বললেন।

মিস্টার ওঝা আমায় জানালেন, ঢাকায় গিয়ে কোনো পাবলিক ফোন থেকে আমি যেন সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিই। ফোনে বললেই হবে, আমি সাঈদ বলছি, ভিসার ব্যাপারে মিস্টার ওঝার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাই।

আগস্টের প্রথমে আমি মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে ঢাকায় যাই। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঢাকায় গিয়ে পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী মিস্টার ওঝার সঙ্গে কথা বলে বৈঠকের দিনক্ষণ এবং স্থান ঠিক ক'রে নিই। চট্টগ্রাম থেকে মোয়াজ্জেম হোসেনের হিলম্যান গাড়িতে আমরা ঢাকায় আসি। পথে মোয়াজ্জেম হোসেন এক বাড়িতে যান। তিনি বাড়ির কর্তা ক্যাপটেন এস. আলমের সঙ্গে আমাব পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে-সময় মিস্টার আলমের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। ঢাকায় আমি গ্রীন হোটেলে উঠি। আর লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ধানমণ্ডীতে তাঁর আত্মীয় ডাঃ খালেকের বাসায় ওঠেন।

মিস্টার ওঝার সঙ্গে যোগাযোগের পর 'সাকুরা'র সামনে আমরা অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ বাদেই একটা গাড়ি নিয়ে মিস্টার ওঝা আসেন। আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যান ধানমণ্ডীর এক বাসায়। মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে মিস্টার ওঝার আমি পরিচয় কবিয়ে দিলাম। অস্ত্রের-তালিকা নিয়ে অনেকক্ষণ মিস্টার ওঝার সঙ্গে মোয়াজ্জেম হোসেনের আলোচনা হ'লো। মিস্টার ওঝা আশ্বাস দিলেন ভারত-সবকারের অনুমোদনের জন্য তালিকাটি পাঠানো হবে। মিস্টার ওঝাব কাছে টাকাপয়সার সাহায্যও আমরা চেয়েছিলাম। সে-সময় তিনি ওই ব্যাপারে তাঁদের অপারগতার কথা জানান। তবে অস্ত্রসাহায্য সম্পর্কে মাসখানেক বাদে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে বলেন। বৈঠক শেষে দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে গাড়ি থেকে তিনি আমাদের নামিয়ে দিলেন।

মিস্টার ওঝার নির্দেশ মতো অস্ত্রসাহায্যের ব্যাপারে আমরা সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁর সঙ্গে ঢাকায় এসে পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলি। এবারে বলি, সাদেক বলছি। মিস্টার ওঝার তাই নির্দেশ ছিল। রাত ন'টায় সেরিমনিয়াল আর্চ-এর সামনে

অপেক্ষা ক'রতে বললেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি আমাকে আর লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর বাসায় চলে গেলেন। সেখানে তিনি আমাদের জানালেন, ভারত-সরকার আমাদের অস্ত্র-সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'য়েছে। তবে সকলেই এখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বড়ো ব্যস্ত। কখন, কোথায়, কীভাবে অস্ত্র সরবরাহ ক'রব নির্বাচনের পর ঠিক হবে।' একটানা কথাগুলো বলে ডাঃ সাইদুর রহমান থামলেন। দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন আদালতকক্ষে। সামনের দিকেই বসে রয়েছেন আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান। পরিষদ-সদস্য ডক্টর আলিম-আল-রাজি, বিরোধীপক্ষের প্রধান কৌসুলী আবদুস সালাম খান এবং ঢাকার আরও নামী নামী আইনজীবি এবং রাজনৈতিক নেতা।

তাঁর দিকে তাকিয়ে চাপাকণ্ঠে আতোয়ার বলে উঠল, 'বেঈমান।'

আমি আতোয়ারের হাতে চাপ দিলাম। চুপ ক'রে গেল সে।

ডাক্তার সাইদুর রহমান আবার বলতে সুরু ক'রলেন, '১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে মাণিক চৌধুরী মুক্তি পেলো। মোয়াজ্জেম হোসেনও ওই সময় চট্টগ্রামে ছিলেন। মার্চ মাসে তিনি সেখান থেকে বরিশালে বদলি হ'য়ে গেলেন। সেই সময় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার বাসায় এসে একদিন জানালেন, আমি যেন মাণিক চৌধুরীকে নিয়ে শীগ্‌গীরই ঢাকায় গিয়ে মিস্টার ওঝার সঙ্গে দেখা করি এবং অস্ত্র-সাহায্যের ব্যাপারটা পাকাপাকি ক'রে ফেলি। নির্দেশ অনুযায়ী ৮ মার্চ আমি ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেলে উঠলাম। মাণিক চৌধুরীও আমার সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। তিনি পরদিন বিমানে ঢাকায় এসেছিলেন। ১০ মার্চ রাত নটার দিকে সাকুরা হোটেলের সেরিমনিয়াল আর্চের কাছ থেকে মিস্টার ওঝা তাঁর গাড়িতে আমাদের তুলে নিয়ে তাঁর বাসভবনে এলেন। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমও ছিলেন সে সময় আমাদের সঙ্গে। তিনি তখন ঢাকায়ই ছিলেন। মিস্টার ওঝা আমাদের শ্রীমতী

ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বের নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে বললেন। তারপর মাণিক চৌধুরীকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। হোটেলে ফিরে আমি সে-কথা জানতে পারি। প্রথমে তো টাকা দিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন, পরে কবে আবার অর্থসাহায্যে মিস্টার ওঝা সম্মত হ'য়েছেন আমি জানি না।

৩. মার্চ আমরা তিনজন আবার মিস্টার ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রলাম। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ততদিনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হ'য়ে গেছেন।

মিস্টার ওঝা আমাদের জানালেন, তাঁর সরকার 'স্বাধীন পূর্ব-বাঙলা' গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। এ ব্যাপারে পাকা কথার জন্য ভারতের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারি এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসা প্রয়োজন। আগরতলায় বসবে সেই বৈঠক।

আগরতলা বৈঠকে গিয়েছিল স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং মিস্টার আলী রেজা। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে পরে জানিয়েছিলেন, আগরতলা বৈঠক সফল হ'য়েছে। মাণিক চৌধুরী আগের পাঁচ হাজার টাকা ছাড়াও মিস্টার ওঝার কাছ থেকে আরও দশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সবটাই তিনি লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে তুলে দিয়েছেন। মাণিক চৌধুরী নিজেই আমায় ওই কথা জানিয়েছিলেন।'

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি খানবাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহাম্মদের এক প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার সাইদুর রহমান জানান যে, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে নিজের বাসা থেকেই তাঁকে রাত দুটোর সময় গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে পাঠান হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তারপর ১৮ জানুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে স্থানান্তরিত করে।

কৌঁসুলি সালাম খান তখন উঠে বললেন, 'আপনি আটক

অবস্থায় ১৫ ডিসেম্বর, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলেন—তাতে বলেছেন, আই. জি. স্পেশাল ব্যাঞ্চ অফিসে নিয়ে গিয়ে আপনাকে একটা কুঠরিতে আটকে রাখে, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনাকে চেয়ারের হাতল দিয়ে মারে, চপেটাঘাত ক'রে এবং ঘুঁসি মেরে শরীরের নানান জায়গা জখম ক'রে দেয়। জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত আপনার ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। একনাগাড়ে তিন দিন ধরে এমনি ভাবে আপনার ওপর নির্যাতন চালায় পুলিশ এবং জোর ক'রে আপনাকে ডিক্‌টেশন দিয়ে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।'

ডাক্তার সাইহুর রহমান বললেন, 'দরখাস্ত আমি লিখেছি ঠিকই, তবে আপনি যা বললেন, তা সত্যি নয়।'

তখন আবহুস সালাম খান দরখাস্তটির একটি কপি সাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে জোরে জোরে পড়তে বললেন।

সাক্ষী বললেন, 'স্যার, আমি বড়ো ক্লান্ত, আজ আর পড়তে পারব না।'

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তখন বলে উঠলেন, 'না না আপনি ওটা এখনি পড়ুন।'

ডাক্তার সাইহুর রহমান আমতা আমতা ক'রে মৃহুস্বরে স্থানে স্থানে বাদ দিয়ে দরখাস্তটা পড়ে গেলেন। পড়া শেষ হ'লে বললেন, কিন্তু যা লেখা হ'য়েছে তা সত্যি নয়।'

এরপর সরকার পক্ষের কৌঁসুলির কথায় তিনি অভিযুক্ত মাণিক চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এ. বি. খুরশিদ, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ এবং শেখ মুজিবর রহমানকে সঠিক ভাবে সনাক্ত করেন।

তারপর জেরা ক'রতে উঠে দাঁড়ালেন বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি আবহুস সালাম খান। তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনি আওয়ামী লীগে কতোদিন আছেন?'

'প্রায় সৃষ্টির পর থেকেই।'

'মুজিবর রহমানেব ৬-দফা সম্বলিত পুস্তিকা কি আপনি পড়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচার ক'রেছিলেন ?'

'ক'রেছি।'

'আপনি কি স্বীকাব করেন ওই ৬-দফার পুস্তিকার মোদ্দা বক্তব্য ছিল—পূর্বপাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা।

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ৬-দফার দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশিত হ'য়েছে। তাতে দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রীয়-সরকারেব হাতে রাখার প্রস্তাব করা হ'য়েছে। বাকি বিষয় সমূহ স্টেট বা প্রদেশের হাতে থাকবে। একই দফায় বলা হ'য়েছে, দুইটি পৃথক্ অথচ অবাধ বিনিময় মুদ্রা চালু করা কিংবা বর্তমানের মতোই সারা দেশে একই মুদ্রা চালু রাখা যেতে পারে। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমপাকিস্তানে মুদ্রা পাচার হ'তে না পারে। আর তার জন্যে পূর্বপাকিস্তানের আলাদা রিজারভ ব্যাঙ্ক গঠন করা প্রয়োজন।'

'জ্বী হ্যাঁ, এসব আমি পড়েছি।'

'পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্কে বলা হ'য়েছে, কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গ রাজ্যগুলিই সমহারে মিটাবে এবং তাতে আরও বলা হ'য়েছে, অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলে কোনো রকম বাধা নিষেধ থাকবে না ?'

ঘাড় নেড়ে সালাম খানের কথায় সায় দিলেন সাক্ষী।

সালাম খান পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের কথা বলা হ'য়েছে। আঞ্চলিক সংহতি ও

শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যই যে পূর্বপাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি গঠনের প্রয়োজন তাও উল্লেখ করা হ'য়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'১৯৬৫ সালে লাহোরে শেখ মুজিবব রহমান এই ৬-দফা ঘোষণা ক'রেছিলেন আপনি তা জানেন কি ?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

আপনি জানেন কি '৬-দফা কর্মসূচী প্রকাশেব পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ৬-দফা আদায়ের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত ক'বে বলেন, এই আন্দোলন দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং তাকে দমানোর জন্যে অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হ'য়ে পড়বে।'

'আমার স্মরণ নেই।'

'জানেন ৬-দফা ঘোষণার পর বহু আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় ?'

'১৯৬৬ সালের মে মাসে সাবা পূর্বপাকিস্তান থেকে বহু আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তাব করা হয়।'

'আপনি কি জানেন যে, শেখ মুজিবব রহমান পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গার বহু জনসভায় ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন ?'

'চট্টগ্রামে একটি জনসভায় ৬-দফাব কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'বে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। অন্য জায়গাব কথা আমি জানি না।'

'১৯৬৫ সালে ভাবতেব সঙ্গে যুদ্ধেব পর পূর্বপাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবি তুলেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান ?'

'হ্যাঁ।'

'চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপনেব দাবি উঠেছিল, পূর্বপাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমি এবং অরডিন্যান্স ফ্যাক্টরি স্থাপনের দাবিও তুলেছিলেন তিনি— জানেন কি ?'

জ্বী হ্যাঁ।'

'সে সব দাবি কি মেনে নেওয়া হ'য়েছে?'

'না, তবে শুনেছি জয়দেবপুরে একটি অরডিন্যান্স ফ্যাক্টরি তৈরি হ'চ্ছে।'

'আপনি কি জানেন চট্টগ্রামে সমুদ্রের পানি থেকে ঘরে ঘরে যে-লবণ উৎপাদন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার তাতে শুল্ক বসিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পশ্চিমপাকিস্তান থেকে যাতে পূর্বপাকিস্তানে লবণ আমদানি বন্ধ না হয় তার জন্যই কি এই শুল্ক আরোপ করা হ'য়েছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

এই সময় সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি মঞ্জুর কাদের দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কি ক'রেছেন না ক'রেছেন, এক্ষেত্রে তা অপ্রাসঙ্গিক।'

সালাম খান মৃদু হেসে বললেন, 'প্রাসঙ্গিক যে তাই প্রমাণ ক'রছি।'

বিচারপতি এস. এ. রহমান বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আপনি জেরা করুন।'

আবদুস সালাম খান আবার জেরা সুরু ক'রলেন। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি কি জানেন চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্যের দাবি এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?'

'আমি বলতে পারছি না।'

'ভারতীয় হাই কমিশনের পি. এন. ওঝার সঙ্গে আপনাদের যোগ-সাজসের কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পিত: আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যা সাম্যের দাবিকে বানচাল করার জন্যই এ-কাহিনী ফাঁদা হ'য়েছে?'

'আমি সত্যি কথাই বলেছি।'

এরপর সালাম খান তাঁকে মাণিক চৌধুরীর প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন করেন। জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি বলেছেন ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে মাণিক চৌধুরী আপনাকে বলেছিলেন যে শক্তি প্রয়োগে প্রাদেশিক সরকার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। আপনি কি ক'রে বিশ্বাস ক'রলেন যে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে?'

'মাণিক চৌধুরী আমায় বুঝিয়েছিলেন যে, সামরিক বাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানের কর্মচারিরা বিদ্রোহ ক'রবে এবং তারা সব সামরিক ছাউনি দখল ক'রে পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে।'

'সেনাবাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানীদের সংখ্যা কতো?'

'বলতে পারছি না।'

'আপনি কি জানেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্বপাকিস্তানী জোয়ানের সংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র এবং প্রতি ৯০ জন অফিসারের একজনও পূর্বপাকিস্তানী নয়?'

'আমি জানি না।'

এরপর সালাম খান সাক্ষী ডাক্তার সাইদুর রহমানকে ১৯৬৬ সালের মে থেকে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ঢাকা আগমন এবং মিস্টার ওঝার সম্পর্কে জেরা ক'রতে লাগলেন।

'ঢাকায় এসে আপনি কি আরজু হোটেলে ছিলেন?'

'হ্যাঁ!'

'কয় দিন ছিলেন?'

'তিন দিন।'

'হোটেল রেজিস্টারে আপনি নাম এনট্রি ক'রেছিলেন কি?'

'ক'রেছিলাম।'

'আপনি কবে ঢাকায় এসেছিলেন?'

'১৯ মে, ১৯৬৬।'

সালাম খান হোটেলের রেজিস্টারটি নিয়ে সাক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন, 'কোথায় আপনার নাম এনট্রি রয়েছে দয়া ক'রে একটু দেখিয়ে দিন।'

অনেকক্ষণ ধরে রেজিস্ট্রী দেখে সাক্ষী আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'আমার নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা চট্টগ্রাম থেকে আপনি যে মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে কার-এ ক'রে ঢাকায় এসেছিলেন ওঝার সঙ্গে দেখা ক'রতে—সেই মোটরগাড়িটি কি দুই দরজাওয়লা অথবা চার দরজাওলা?'

'আমার মনে নেই।'

'আপনি বলেছেন, গাড়িটি ছিল হিলম্যান।'

'হবেও বা।'

'হিলম্যান গাড়ির কয় দরজা আপনি বুঝি জানেন না?'

'না।'

'সেবার গ্রীন হোটেলে উঠে কি নাম এনট্রি ক'রেছিলেন?'

'জানি না।'

'আমি বলছি '৬৬ সালের ১৯ মে আপনি আদৌ ঢাকায় আসেন নি, বা হোটেল গ্রীনেও থাকেন নি।'

'তা সত্যি নয়।'

'তাহ'লে হোটেল রেজিস্টারে আপনার নাম এনট্রি নেই কেন?'

'মিস্টার পি. এন. ওঝার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে চেয়েছিলাম বলেই হোটেল রেজিস্টারে নাম রেকর্ড করি নি।'

'কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৮ মার্চ মিস্টার ওঝার সঙ্গে যখন গোপনে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছিলেন তখন তো নাম রেজিস্ট্রী করিয়েছিলেন?'

এই প্রশ্নে সাক্ষী চুপ ক'রে থাকেন।

'আচ্ছা হোটেল সাকুরার লাগোয়া সেরিমনিয়াল আর্চ থেকে কোন্ পথে মিস্টার ওঝার বাড়িতে যেতে হয়?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত সভাশেষে শেখ মুজিবর রহমান কি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ'

'তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলেন ?'

'মাণিক চৌধুরী।'

'আপনার বাড়িতে সেই সময় আর কেউ ছিলেন ?'

'না।'

'মুজিবর রহমান আর মাণিক চৌধুরী ফিরেছিলেন কীসে ?'

'মাণিক চৌধুরীর কারে।'

'মাণিক চৌধুরীর কোনো 'কার' নেই ?'

'আছে। আমি বহুবার সেই 'কারে' ঘুরেছি।'

'গাড়ির নাম কি ?'

'মনে নেই।'

'তার নম্বর কতো ?'

'তাও মনে নেই।'

'আমি বলছি, শেখ মুজিবর রহমানকে 'ষড়যন্ত্র মামলায় 'জড়ানোর জন্যই এই কথা বলছেন। শেখ মুজিবর রহমান আপনার বাড়িতে কখনো যান নি।'

'না। একথা ঠিক নয়।'

'১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামীলীগ প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকা ও প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে সেদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হ'য়েছিল কি ?'

'হ্যাঁ।'

'এই হরতালের দিন বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি

চালিয়েছিল, তাতে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। এটা কি সত্যি ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'১৯৬৭ সালের আগস্টে কি আপনি ঢাকায় এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। ২৯ কি ৩০ আগস্ট আমি ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেলে উঠেছিলাম। মাণিক চৌধুরীও আমাব সঙ্গে ছিল।'

'মাণিক চৌধুবী কি গ্রীন হোটেলেই উঠেছিলেন ?'

'না, তিনি উঠেছিলেন হোটেল ক্যাসেরিনায়।'

এই সময় আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে হোটেল ক্যাসেরিনার রেজিস্টার তুলে দিয়ে মাণিক চৌধুরীর নাম বের ক'রতে বললেন।

সাক্ষী তাতে মাণিক চৌধুরীর নাম খুঁজে পেলেন না।

'আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন ওই সময় আপনি আর মাণিক চৌধুবী একই হোটেলে অর্থাৎ গ্রীন হোটেলে ছিলেন।'

'না, তা ঠিক নয়।'

আবদুস সালাম খান আব প্রশ্ন ক'বলেন না। তারপর উঠে দাঁড়ালেন পূর্বপাকিস্তানেব সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগ নেতা আতাউব বহমান খান। দর্শকদেব গ্যালারী পরিপূর্ণ একটু গুঞ্জন উঠছিল। আতাউব বহমান খান উঠে দাঁড়াতেই গুঞ্জন থেমে গেল। তিনি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'বলেন, 'আপনি কি আওয়ামীলীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, না পিছনে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্য ছিল ?'

'না, আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়েই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্রে যে-সব দাবি-দাওয়ার উল্লেখ রযেছে—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তাতে পূর্বপাকিস্তানের বেশির ভাগ লোকের মনোভাব ব্যক্ত হ'য়েছে ?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

'সে সব দাবি কি পূরণ হ'য়েছে ?'

'না।'

'আপনি আপনার দলের ওপর এবং লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের ওপর কেন আস্থা হারিয়ে ফেলেন ?'

'আমি যখন জানতে পারি, মোয়াজ্জেম হোসেন পার্টির তহবিল তছরুপ ক'রেছেন এবং বরিশাল বদলির পর পার্টির কাজ কিছুই করেন নি তখন থেকেই আমি পার্টির কাজে আস্থা হারিয়ে ফেলি।

'আপনাকে রাজসাক্ষী হ'তে প্রথম বলেন কে ?'

'স্বীকারোক্তি দানের পর মেজর নাসের এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি রাজসাক্ষী হ'তে চাই কিনা।'

'মিস্টার ওঝার বাড়ি কি রকম ?'

'দোতলাবাড়ি।'

'সেটা রাস্তার কোন্ পাশে ?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'আপনি তাঁর বাড়িতে ক'বার গিয়েছেন ?'

'যতদূর মনে পড়ে, ছয়বার।'

'আপনারা কোথায় বসতেন ?'

'দোতলার ড্রয়িংরুমে।'

'মিস্টার ওঝার মাথায় কি টিকি ছিল ?'

'আমি লক্ষ্য করি নি।'

'আচ্ছা, ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাওয়ার পথে কোথাও কোনো ব্রিজ পড়েছিল ?'

'মনে নেই।'

'কুদ আদায়ের জন্যে টঙ্গীর সেতুতে আপনাদের গাড়ি থামিয়েছিল কি ?'

'আমি মনে ক'রতে পারছি না।'

আতাউর রহমান খান বসতে-না-বসতেই বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি

জুলমত আলী খান হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন, '১৯৬৬ সালের ১৮ মে থেকে ২২ মে আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ি সীতাকুণ্ডে ছিলেন ?

'আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই ক'রতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমাদের। আপনি এখন যেতে পারেন।'

এর পর সাক্ষ্য দিতে ওঠেন মির্জা রমিজ! ডকে উঠে আদালত-গৃহের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলতে স্নুরু ক'রলেন, 'তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নুরুজ্জামানের সঙ্গে এক সভায় 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন প্রসঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওই বছরই অন্য একটি গোপন সভায় কে. এম. এস. রহমান সি. এস. পির সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। দু'একবার আমার বাড়িতেও এসেছিলেন তিনি। এক সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম পূর্বপাকিস্তান আলাদা হ'য়ে কি টিকতে পাববে ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হঁ্যা। তারপর যুক্তি দিয়ে তাঁর কারণও ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন। সেপ্টেম্বরের দিকে আমার ঢাকার ফ্ল্যাটে একটা গোপন সভা হয়। তাতে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপটেন আলম, ক্যাপটেন আলীম, ক্যাপটেন হুদা, ক্যাপটেন মুতালেব, লীডিং সীম্যান স্নুলতানউদ্দীন আহাম্মদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।'

এই সময় লীডিং সীম্যান স্নুলতানউদ্দীন আহাম্মদকে সনাক্ত ক'রতে বলা হ'লো। সাক্ষী বার বার ক'রে দৃষ্টি বুলালেন সকলের ওপর। শেষে নূর মোহাম্মদকে দেখিয়ে বললেন, উনি স্নুলতান-উদ্দীন আহাম্মদ। দর্শকদের গ্যালারিতে মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠলো। সাক্ষী বুঝতে পারলেন তাঁর সনাক্তকরণ ঠিক হয় নি। বেশ বিব্রত

দেখাল তাঁকে। তিনি তাড়াতাড়ি আবার বলতে সুরু ক'রলেন, 'সভায় লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন জানালেন, ভারত অস্ত্রসাহায্য ক'রতে রাজী হ'য়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব কে ক'রবেন—এই নিয়েও সভায় আলোচনা হ'লো। কেউ বললেন কোনো সি. এস. পি অফিসারের হাতে, কেউ-বা সামরিক অফিসার, আবার কেউ-কেউ বললেন রাজনৈতিক নেতার হাতেই আন্দোলন পরিচালনার ভার থাকা উচিত। এ-ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্য সেদিন হ'লো না। সভায় আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হ'লে তাকে কি অন্যান্য রাষ্ট্র সমর্থন জানাবে? কে. এম. এস. রহমান বললেন, ভারতের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলাপ হ'য়ে গেছে। ভারত এবং তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বীকৃতি দেবে। বললাম, পরে যদি ভারত আমাদের আক্রমণ ক'রে। রহমান সাহেবই জবাব দিলেন, এ-যুগে তা সম্ভব নয়। অনেক আন্তর্জাতিক বাধানিষেধ রয়েছে। ওই সভায়ই লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপটেন মুতালিবের ওপর প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করার এবং অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়ার ভার দিলেন।

'অক্টোবরে একদিন বিকেল চারটে নাগাদ লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর 'মস্কোভীচ' গাড়ি ক'রে চিটাগাং ক্যাণ্টনমেণ্টে নিয়ে গেলেন আমায়। সেখানে কর্নেল ওসমানী ও কর্নেল শেখের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা তখন ই. পি আর. সি.-এর অফিসার মেসের মধ্যকার রাস্তায় পায়চারি ক'রছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক বাহিনীতে আমাদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া যাচাই করা।

'১৯৬৭ সালের মার্চের দিকে লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বরিশাল থেকে ঢাকায় আমার বাসায় এসে দেখা ক'রলেন। বরিশালে বদলি হ'য়ে মোয়াজ্জেম হোসেনের পদোন্নতি হ'য়েছে। আমার বাসায়ই এক বৈঠক হ'লো। মোয়াজ্জেম হোসেন সেখানে

বললেন, মিস্টার ওঝার কাছ থেকে আমরা অনেক অর্থ সাহায্য পাচ্ছি। রহুল কুদ্দুস এবং আহাম্মদ ফজলুল রহমান সাহেবও অনেক অর্থ সংগ্রহ ক'রছেন। আবও টাকার প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপাতত আমাদের হাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে যদি একটা বাড়ি ভাড়া নিই এবং ব্যবসা করি, তাহ'লে দুটো সুবিধে হবে। দলের সম্পদও বাড়বে এবং দলেব কর্মীদেব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেব কর্মী বলেও চালানো যাবে।'

এই সময় বাদীপক্ষের কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো মিস্টাব বমিজ এই টেলিগ্রামটা চিনতে পাবেন কিনা?'

টেলিগ্রামটা দেখে নিয়ে সাক্ষী মির্জা মোহাম্মদ রমিজ জবাব দিলেন, '১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ কমাণ্ডাব মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর ঢাকা আসাব সংবাদ জানিয়ে আমাব কাছে টেলিগ্রামটি করেন। আমায়ও ঢাকা যেতে বলেন। ঢাকায় আমাব ফ্ল্যাটেই সভা হ'লো। ওই সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়াড মুজিবব বহমান ছাড়াও সাবেক করপোরাল সামাদ, কে এম শামসুব বহমান, ক্যাপটেন মুত্তালিবও ছিলেন। সভায় ওয়ারলেস সেট সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা হ'লো। আমার হাতে পঁচিশ হাজাব টাকা দেওয়া হ'লো ব্যবসা ও বাড়ি ভাড়া করার জন্য। এপ্রিলেই ১৩ গ্রীন স্কোয়ারে একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম। প্রায়ই ওখানে আমাদেব গোপন সভা বসত। ওইসব সভায় নতুন সদস্য সংগ্রহ, অস্ত্র জোগাড় কবা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'তো। এব মে মাসেই ছয়-সাতটি সভা হয় ওই বাড়িতে। প্রাক্তন নায়েব সুবেদাব জে. ইউ. আহাম্মদ, প্রাক্তন করপোরাল সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, হাবিলদার দলিলউদ্দীন এবং লুৎফর হুদা ওই বাড়িতেই বাস ক'রতেন। ওই বাড়িতেই এক সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন আলা রেজার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এক সভায় আগরতলায় ভারতীয়

সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে যোগদানের জন্য যে প্রতিনিধি দল যাবে তাঁর সদস্যদের নামও ঠিক করা হ'লো। আরও ঠিক হ'লো যে, ফেণী হয়ে তাঁরা আগরতলা যাবেন।

১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই ফেণী থেকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান্ টাঙ্ককল ক'রলেন আমায়। ফেণীতে যেতে বললেন। আগেই ঠিক হ'য়েছিল প্রতিনিধিদলটি ফেণী 'ডেনোফা' হোটেলে থাকবেন। পি. আই. এ-র স্টাফকার 'ডজডার্ট' নিয়ে চাটগাঁ থেকে ফেণী গেলাম। ডজডার্টটা আমিই বেশি ব্যবহার ক'রতাম। ফেণী থেকে ফিরতে রাত হ'তে পারে ভেবে পি. আই. এ-র আনোয়ার হোসেনকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় আগেই প্রতিনিধি-দলটিকে ফেণী সীমান্ত বেলুনিয়ায় পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিকেল ৬টা নাগাদ পৌঁছলাম আমি ফেণী। 'ডেনোফা হোটেল'-এ গিয়ে দেখলাম স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, প্রাক্তন নায়েব সুবেদার জে. ইউ. আহাম্মদ, আলী রেজা, প্রাক্তন করপোরাল সামাদ আর হাবিলদার দলিলউদ্দীন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। ঠিক হ'লো, প্রতিনিধিদল ভোর্ চারটেয় সীমান্ত অতিক্রম ক'রবে। নির্দিষ্ট সময়ে আমার 'ডজডার্ট' করে বেলুনিয়ায় পৌঁছে দিলাম তাঁদের। সীমান্তের অপর পারে অদৃশ্য না-হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি সেখানে যে-গাড়িটা দিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিলাম তার নম্বর ছিল কে. এ. ই. ৩১৯৪। যাবার সময় চাঁটগাঁ-ফেণী সড়কের ওপর একটা পুলে থেমেছিলাম 'কুদ' দেওয়ার জন্য। সীমান্তঘাঁটির রক্ষীদের ওপর নায়েব জে. ইউ. আহাম্মদ তাঁর প্রভাব খাটিয়েছিলেন। তাই সীমান্ত পেরুতে কোনো অসুবিধাই হয় নি। আগরতলার বৈঠকে শেষে ফিরে এসে আলী রেজা আমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি সীমান্তে একজন ভারতীয় ক্যাপটেন তাদের সাদরে গাড়ি ক'রে আগরতলা নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধিত্ব ক'রেছিলেন একজন কর্নেল এবং একজন মেজর। আমাদের

প্রতিনিধিদল তাঁদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রসস্ত্রের একটা তালিকা দিয়েছে। মেসিনগান, সাব-মেসিনগান, হাতবোমা প্রভৃতি সেই তালিকায় ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিরা জানালেন, তাঁরা তালিকার অস্ত্রসস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন এবং শীগ্‌গীরই সে-খবর ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনের মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে। আগরতলা থেকে দু'লাখ টাকাও পাওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের মারফতই টাকাটা পাঠাবেন বলে জানালেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা।'

বাদীপক্ষের কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'টাকাটা কি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন ?'

সাক্ষী বললেন, 'আমি পরে মোয়াজ্জেম হোসেনকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ক'রেছি। কিন্তু জবাব পাই নি। আমার এই কৌতূহলে তিনি বিরক্ত হন। পার্টির টাকায় আমরা একটা হিলম্যান এবং একটা ফিয়াট গাড়ি কিনেছিলাম। পার্টির অন্য সব কাজের জন্যও কিস্তিতে কিস্তিতে আমাকে কয়েক হাজার টাকা দেওয়া হ'য়েছিল। তাতেই মনে হয় টাকাটা পেয়েছিল।'

জবানবন্দী শেষ হ'লো।

এবার বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি আবদুস সালাম খান উঠে দাঁড়িয়ে জেরা ক'রতে সুরু ক'রলেন। 'আপনার হাতে পার্টির কাজের জন্য কতো টাকা দেওয়া হ'য়েছিল ?'

'পঁচিশ হাজার টাকা।'

'তা থেকে নিজের জন্য আপনি কতো টাকা খরচ ক'রেছিলেন ?'

'৬ হাজার টাকা।'

'স্কুটার কিনতে কয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন ?'

'দু'হাজার টাকা।'

'টাকাটা কি নগদ দিয়েছিলেন ?'

'না, চেকে।'

'কী চেক—বেয়ারার না ক্রস ?'

'ক্রস-চেক।'

'গুপ্তকাজের জন্য কি ক্রস চেক উপযোগী ?'

সাক্ষী নীরব রইলেন।

'আচ্ছা, আপনি তো পি. আই. এ -তে কাজ করেন, মাসে কতো বেতন পান ?'

'১২০০ শ টাকা।'

'আপনি বলেছেন যে, '৬৭ সালের মে মাসে গ্রীন স্কোয়ারের বাড়িতে অনেকগুলি মীটিং হয়, ক্যাপটেন মোতালিবও সে-সব সভায় থাকতেন, আচ্ছা, ওই বছর এপ্রিল মাসে ক্যাপটেন মোতালিব কোথায় ছিলেন জানেন কি ? কোনো হাসপাতালে ছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ। মার্চের শেষ ভাগে ঢাকা হাসপাতালে এবং এপ্রিলে কুমিল্লা হাসপাতালে ছিলেন।'

'কিন্তু আমি যদি বলি তিনি '৬৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট হাসপাতালে ছিলেন ?'

'হ'তে পারে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

' '৬৭ সালের জুন মাসে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ করাচিতে ছিলেন এটা কি ঠিক ?'

সাক্ষী বললেন, 'জানি না। তবে ওই মাসে তিনি ঢাকায় আমার ওখানে এক মীটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন।'

'যদি বলি সুলতানউদ্দীন সারা জুন মাসই করাচিতে ছিলেন ?'

'আমি তা জানি না।'

'ঢাকায় মে ও জুন মাসে যে মীটিং হ'য়েছিল তার তারিখ বলতে পারেন ?'

'না।'

'মে মাসের মীটিংগুলো কয় দিন পর পর হ'য়েছে ?'

'কখনো পর পর দুই দিন, কখনো-বা সাত-আট-দশ দিন পরেও হ'য়েছে।'

'আপনি যে-আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে 'ডজডার্টে' ক'রে ফেনী সীমান্তে গিয়েছিলেন সে কে?'

'পি. আই. এ.-র একজন টেলিফোন অপারেটর।'

'আপনি পি. আই. এ.-র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার। আপনার সঙ্গে একজন টেলিফোন অপারেটরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কি ক'রে থাকে?'

'আনোয়ার হোসেন ছিলেন পি. আই. এ.-র এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সেকরেটারী। সেই সূত্রে পরিচয়।'

'আপনি কি জানেন যে তিনিও রাজসাক্ষী?'

'না।'

'আচ্ছা, আলী আহম্মদ কে?'

'একসময় আমার ড্রাইভার ছিল।'

'আপনি আহাম্মদ ফজলুর রহমানকে চেনেন?'

'নাম শুনেছি।'

'আপনি জানেন কি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কি কাজ করতেন?'

'তিনি নৌ-বাহিনীর একটা অফিসাস মেসে কাজ করতেন।'

'তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতোটুকু?'

'আমি জানি না।'

'আমরা তো জানি, স্টুয়ার্ড মানে যে খাবার এনে দেয়। এমন একটি লোককে কেন ভারতের প্রতিনিধি দলভুক্ত ক'রলেন?'

'মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় বলেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বেশ জ্ঞান আছে।'

'কেন, আপনাদের দলে তো কয়েকজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপটেনও ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা অস্ত্রসস্ত্র সম্পর্কে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান থেকে বেশি যোগ্য। তবু কেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে

পাঠানো হ'লো সেখানে? আর আলী রেজারই-বা যাওয়ার কারণ কি? তিনিও তো অস্ত্রবিশারদ নন।'

'আমি বলতে পারছি না, মোয়াজ্জেম হোসেন জানেন।'

'আগরতলা সীমান্তে প্রতিনিধিদের পৌঁছে দেবার দিন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে যে-ট্রাঙ্ককল পান সেটা কখন?'

'ওই দিন তিনটের কাছাকাছি।'

'কতক্ষণ বাদে রওনা হন?'

'কিছুক্ষণ বাদেই।'

'ডজ গাড়ি ঘণ্টায় কতো মাইল যায়?'

'৫০ থেকে ৬০ মাইল।'

'চট্টগ্রাম থেকে ফেণীর দূরত্ব কতো?'

'৬৫ মাইল।'

আমি যদি বলি ওইদিন বিকেল ৩টে থেকে ৫টার মধ্যে আপনি কোনো ট্রাঙ্ককল পান নি।'

'এ কথা ঠিক নয়।'

'আপনি ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কতোদিন যুক্ত ছিলেন?'

'গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনি কি একথা বলেন নি যে, মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার পর আর পার্টির সঙ্গে আপনার কোনো সংশ্রব ছিল না?'

'কী বলেছি আমার মনে নেই।'

আবদুস সালাম খান একটা দলিল দেখছেন। আদালতকক্ষে থম থমে নীরবতা। হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন ক'রলেন তিনি, 'কর্নেল শেখ কি বাংলাভাষী?'

'জী না।' হাল্কাকণ্ঠে জবাব দিলেন রাজসাক্ষী মির্জা মোহাম্মদ রমিজ।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানালেন যে, স্বাধীন পূর্ববাঙলার জন্য পতাকার পরিকল্পনাও করা হ'য়েছিল। সবুজ আর সোনালি—ছুই রঙের পতাকা। সবুজ পূর্ববাঙলার সবুজাভ প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীক আর সোনালি হচ্ছে পাটের প্রতীক।

সালাম খান এবারে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন যে, স্বাধীন পূর্ববাঙলায় সব সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। পৃথিবীর আর কোনো দেশ সম্পত্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ক'রছে বলে আপনি শুনেছেন?'

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ক'রেছে।'

'সভায় যে পরিকল্পিত পতাকাটি পেশ করা হ'য়েছিল তা কিসের তৈরি ছিল?'

'কাপড়ের।'

'ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে কি আপনি বলেছিলেন যে পতাকায় পাটের ছবি আঁকা আছে?'

সাক্ষী উত্তর দিলেন, 'আমার মনে নেই।'

'ক্ষমতা দখলের দিন অর্থাৎ ডি-ডের কোনো তারিখ ঠিক হয়েছিল কি?'

'না।'

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী মির্জা মোহাম্মদ রমিজ বললেন যে, কমাণ্ডো স্টাইলে পূর্বপাকিস্তানের ক্যাণ্টনমেণ্ট সমূহ দখলের পর কি হবে ক্যাপটেন আলমের বাড়িতে সে-সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় নি।

সালাম খান জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'দলে রিক্রুট করার জন্য আপনি কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রেছিলেন?'

'কে. এম. শামসুর রহমান ছাড়া আমি আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করি নি।'

'শামস্থর রহমান সম্পর্কে আপনি কতোটুকু জানেন ?'

'শামস্থর রহমান সাহেব সি. এস. পি. পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'য়েছিলেন। খুব মেধাবী ছাত্র।'

'পূর্বপাকিস্তানের কোনো বাঙালী সামরিক অফিসারকে কি আপনি চেনেন ?'

'কয়েকজনকে চিনি। তাঁরা হ'লেন কর্নেল রব, কর্নেল জাব্বার, কর্নেল রহমান, এবং লে. কর্নেল মাশকুরুল হক।'

'তাঁদের দলে আনার চেষ্টা ক'রেছিলেন কি ?'

'না।'

'ওসমানীর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাওয়ার সময় ক্যান্টনমেন্টের গেটে আপনার চোখে কি কি পড়েছিল ?'

'একটা বাঁশের ফাঁড়ি, একজন সেন্ট্রি ও একটি সাইনবোর্ড।'

'আচ্ছা ওয়ারলেস সেটের আকৃতি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে কি ?'

'ওয়ারলেস সেট ছুই বাই এক ফুট বা তারও ছোটো হ'তে পারে।'

'এ-ধরণের যন্ত্রে কতো দূরের খবরাখবর আদানপ্রদান করা যায় ?'

'জানি না।'

'ট্র্যান্সমিটার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?'

'একটি রেডিও সেটে কিছু পার্টস সংযোজন ক'রলেই তাকে ট্র্যান্সমিটার সেটে পরিণত করা চলে।'

'ওয়ারলেস সেট সম্পর্কে আপনাদের সভায় কি কোনো আলোচনা হ'য়েছিল ?'

'হ'য়েছিল। মোয়াজ্জেম হোসেনই জানিয়ে ছিলেন, আমাদের ৫টি স্লেভ সেট এবং একটি মাস্টার সেটের প্রয়োজন। স্লেভ সেটগুলো মাস্টার-সেটের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।'

সালাম খান জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'বলতে পারেন—একটি ট্র্যানজিস-টারাইজড এবং একটি ওয়ারলেস সেটের মধ্যে পার্থক্য কি ?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনাদের দলের কেউ ওয়ারলেস সেট ব্যবহার ক'রতে জানতেন কি?'

'যতটুকু জানি—কেউ জানতেন না।'

'আপনি কি জানেন যে করপোরাল সামাদ ওয়ারলেস ইন্সপেক্টর ছিলেন?'

'আমি জানি না।'

এরপর সালাম খান বসে পড়লেন। এবারে উঠে দাঁড়ালেন পূর্বপাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট আইনজীবি আতাউর রহমান খান। তিনি জেরার গোড়াতেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনার প্রকৃত নাম কি?'

সাক্ষী একটু নীরব থেকে উত্তর দিলেন, 'রমিজউদ্দীন মোল্লা। ১৯৫৩ সালে বিমানবাহিনীতে চাকুরি নেওয়ার সময় আমি আমার নাম পরিবর্তন করি।'

'আপনি কি বোধাই মণ্ডলকে চেনেন?'

একটু ইতস্তত ক'রে সাক্ষী জবাব দিলেন, 'জী হ্যাঁ। তিনি আমার প্রপিতামহ। আমার পিতার নাম আলিমউদ্দীন।'

'রোজিয়া বিবিকে চেনেন?'

সাক্ষীকে এবার একটু ক্রুদ্ধ মনে হ'লো। বলল, 'না, চিনি না।'

'আতাউর রহমান একটু হেসে বললেন, 'সে কি! নিজের খালাকে চেনেন না!'

সাক্ষী নীরব রইলেন। আতাউর রহমান সাহেব মুচকি হেসে বসে পড়লেন। তারপর আরও কয়েকজন দু'চারটি প্রশ্ন করার পর মির্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা শেষ হ'লো। কয়েক দিনের জন্য অধিবেশনও মূলতবী রইল।

বেরুবার মুখে কামালউদ্দীন সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে রয়েছে বড়ো মেয়ে। হেসে আদাব জানালেন। পাল্টা আদাব

জানিয়ে আমিও হেসে বললাম, 'দুশ্চিন্তা এখন কিছুটা দূর হ'য়েছে তো?'

তিনি নীরবে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলেন।

আতোয়ার আর আমিও ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এলাম। বেলা শেষের আলো তখন আমগাছের মাথায়। গাঢ় নীল আকাশে সাদা সাদা হালকা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কি এক ভাবনায় যেন তলিয়ে রয়েছে আতোয়ার। কথা বলছিল না। বললাম, 'কিরে, কি ভাবছিস?'

'উঁ!' আতোয়ার মুখ তুলতে তুলতে বলল, 'ভাবছিলাম, আয়ুব-মোনেম দেখছি বেশ আঁটঘাট বেঁধেই 'ষড়যন্ত্র-মামলা' সাজিয়েছে। ভেবে অবাক হচ্ছি এতগুলো মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় ক'রল কি ক'রে? এসব জেরা-ফেরাতে কিছু হবে না। অন্য দাওয়াইয়ের প্রয়োজন।'

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, 'কি দাওয়াই?'

উত্তর দিল, 'ক'দিন বাদেই দেখতে পাবি।'

আর কথা না বাড়িয়ে অফিসের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আতোয়ারও এসে উঠল। কি এক ভাবনায় তলিয়ে গেছে ও। দৃষ্টি দূরমনস্ক।

'কিউই' জাহাজের ডেকে বসে আলাপ ক'রছিলাম আমি, আতোয়ার আর শফিভাই। সৃষ্টি থেকেই ন্যাপের একনিষ্ঠ কর্মী শফিভাই। শুনেছি, শফিভাই নাকি একসময় খুব দুর্ধর্ষ ছিলেন, পাণ্ডা ছিলেন মুসলিমলীগের। জানি না কোন্ জাদুস্পর্শে আমূল বদলে গেছেন শফিভাই। এখন কম্যুনিজমে তিনি বিশ্বাস করেন; বিশ্বাস করেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং মানবতায়। আওয়ামীলীগ খণ্ডিত হয়ে ভাসানী যখন নতুন দল গড়লেন, হাজারো বাধা এসেছিল। সেই দুর্দিনে যে-কয়জন আদর্শবাদী যুবক মৌলানা ভাসানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, শফিভাই তাঁদের একজন। রূপমহল সিনেমাহলে প্রতিনিধি সম্মেলনে যখন 'ন্যাপ'-এর জন্ম হ'লো, হামলা চালিয়েছিল গুণ্ডারা। এককালের দুর্ধর্ষ শফিভাইকে সেদিন স্বমূর্তিতে দেখেছিলাম। জনাকয়েক ছেলে নিয়ে শফিভাই সেদিন ঠেকিয়েছিলেন ঢাকার নাম-করা সব গুণ্ডাদের। আউটার স্টেডিয়ামের মীটিং-এও গুণ্ডাদের হামলা থেকে বাঁচিয়েছেন মিয়া ইফতেখারউদ্দীন আর গফ্ফার খানকে। শফিভাইয়ের লাঠির আঘাতে সেদিন কতো গুণ্ডা যে ঘায়েল হ'য়েছিল ঠিক নেই। গফ্ফার খানের কথায় শেষে নিরস্ত্র হ'য়েছিলেন শফিভাই। '৫৮ সালে মার্শাল ল জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন শফিভাই। তখন তিনি নারায়ণগঞ্জ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সেক্রেটারি। জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন বছর দুই বাদে। জনগণের চাপে আয়ুব বাধ্য হ'য়েছিলেন শফিভাইকে মুক্তি দিতে। '৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে গিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে ন্যাপের আরও অনেকেই গিয়েছিলেন। গফ্ফার খানের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন সীমান্তের গ্রামের পর গ্রাম। কথায় কথায় ওখানকার কথাই উঠল।

কথা বলার ফাঁকে আচমকা শফিভাই জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আজ কতো তারিখ বল্‌ তো ?'

আমিই বললাম, '৩১ আগস্ট।'

আমার দু'চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নিজের অজান্তেই যেন তিনি আমার কথার পুনরাবৃত্তি ক'রলেন, '৩১ আগস্ট!' তারপর দৃষ্টি হ'লো তাঁর দূরমনস্ক। সন্ধ্যে গড়িয়ে এসেছিল। নদীর ওপারের খেয়াঘাট, পাটের গুদাম তখন আবছায়ায় ডুব দিয়েছে। মিটিমিটি জ্বলছে নৌকোর আলো। শফিভাই গাঢ়স্বরে বললেন, আফগানিস্তানে আজ 'পাখতুনিস্তান দিবস' উদ্‌যাপিত হ'চ্ছে। কয়েক বছর ধরেই হ'চ্ছে। গত বছরও কাবুলের গাজী স্টেডিয়ামে 'পাখতুনিস্তান দিবস' উদ্‌যাপিত হ'য়েছিল। পাশাপাশি আফগান আর পাখতুন নিশানে সাজানো হ'য়েছিল স্টেডিয়াম। কাবুলের পাখতুন স্কোয়ারও সাজানো হ'য়েছিল আফগান আর পাখতুন নিশানে। পঞ্চাশ হাজার জনতার মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনির মধ্যে স্টেডিয়ামের মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন আশী বছরের বৃদ্ধ সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্‌ফার খান। স্তব্ধ হ'লো জনতা। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পশতু ভাষায় দৃঢ়কণ্ঠে গফ্‌ফার খান বললেন, 'বন্ধুগণ, স্বাধীন পাখতুনিস্তান আন্দোলনে আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য পাকিস্তানের সোয়া কোটি পাখতুনের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' একটু থামলেন তিনি। দৃষ্টি বুলালেন অর্ধলক্ষ জনতার ওপর। তারপর আবার সুরু ক'রলেন, 'ভারত দ্বিখণ্ডিত হোক—এ আমি চাই নি। তীব্রকণ্ঠে ভারত দ্বিখণ্ডকরণের প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু রুখতে পারি নি ভারতের অঙ্গচ্ছেদন। ভারত কেটে জন্ম নিলো দুটো রাষ্ট্র—ভারত আর পাকিস্তান। দেশ যখন খণ্ডিতই হ'লো তখন আমরা—সীমান্তের পাখতুনরা, আলাদা রাষ্ট্রের দাবি জানালাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের সোয়া কোটি পশতু-ভাষীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বৈষয়িক উন্নতির জন্য প্রয়োজন পৃথক্

একটি রাষ্ট্রের। কিন্তু মেনে নিল না আমাদের দাবি। স্বাধীন 'পাখতুনিস্তান' দেওয়া দূরের কথা ১৯৫৫ সালে পশ্চিমপাকিস্তানকে একটা ইউনিটে করা হ'লো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ আর বেলুচিস্তানকে জুড়ে দেওয়া হ'লো পাঞ্জাবের সঙ্গে। পাঞ্জাবিদের তাঁবেতে গিয়ে পড়লাম এবার। আজও এই এক ইউনিটের বিরুদ্ধে। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। পাখতুনদের জন্য অন্ততঃ একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য স্থাপনের জন্যেই চলেছে আমাদের সংগ্রাম। গড়ে তুলেছি 'খোদাই খিদতগার সম্প্রদায়'। কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ মির্জা আয়ুবের সৈন্যরা নিরস্ত্র পাখতুনদের ওপর বোমা ফেলে, নির্যাতন ক'রে, জেলে পুরে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে, বেতনটেব আঘাতে জর্জরিত ক'রে বাব বার বানচাল ক'রতে চেয়েছেন সে আন্দোলন, পারেন নি। আমাদের আন্দোলন 'স্বাধীন পাখতুনিস্তান' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সীমান্তের ৩৮ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা—পশতু-ভাষীরা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ চাই। বেলুচিস্তান থেকে চিত্রল পর্যন্ত সমস্ত পাখতুনদের আমি একত্র করতে চাই—মেলাতে চাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। দাবি আদায়ের এ-সংগ্রামে আমি আমার পাখতুন ভাইদের জন্য আমি শহীদ হ'তে চাই।'

থামলেন তিনি।

মুহুর্মুহু 'ফকির-ই-আফগান জিন্দাবাদ', 'পাখতুনিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে সর্দার খান আসন গ্রহণ ক'রলেন। ঠিক এই ধ্বনি দিয়েই ১৯৬৪ সালের কাবুল এয়ারপোর্টে আফগানরা সীমান্তগান্ধী গফ্ফার খানকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। ওই বছর জানুয়ারিতেই অসুস্থতার জন্য আয়ুব তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন জেল থেকে। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল 'ডেরা ইসমাইল খান' থেকে আয়ুব তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী আশী বছরের বৃদ্ধ নেতা গফ্ফার খানের ত্রিশটি বছরই কেটেছে বৃটিশ আর

পাকিস্তানের জেলে জেলে। পাকিস্তানেই তিনি জেল খেটেছেন ১৭ বছর। কয়টা দিনই-বা তিনি বাইরে থাকতে পেরেছেন, মিশতে পেরেছেন পাঠানদের সঙ্গে, ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন সীমান্তের গ্রামগুলি। তবু সেখানে তাঁর যে কি জনপ্রিয়তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। সীমান্তের লোকদের কাছে গফ্‌ফার খান শুধু একজন নেতা নন, দেবতা। তাঁর সামনে কেউ ধূমপান পর্যন্ত করে না। তাঁর সামান্য নির্দেশে লহমায় হাজার হাজার পাখতুন বিলিয়ে দিতে পারে তাদের প্রাণ।' শফিভাই থামলেন।

বাটলার ফলের সরবত নিয়ে এসেছে তিন গ্লাস। আনারস, কলা, আমের টুকরো আর সেই সঙ্গে পেস্তা-বাদাম মিশিয়ে সরবতটা ক'রেছে। বেশ গরম পড়েছিল আজ। ডেকের মৃদু জলো বাতাসে গরম ততটা লাগছিল না তখন। তবু ভিতরটা তৃষ্ণার্ত হ'য়ে উঠেছিল। গ্লাসে স্ট্র ডুবিয়ে মুহূর্তে চুমুক দিলাম। আঃ কি যে ভালো লাগছে! নদীর ওপারে বড়ো বড়ো পাটের গুদামগুলোর আড়াল থেকে চাঁদ উঠছে। বড়ো চাঁদ। দিন-তিনেক আগে গেছে রাখি-পূর্ণিমা। চাঁদের ধবধবে আলো এসে পড়েছে নদীর ওপর। এপারে ওপারে একটা আলোর সেতু তৈরি হ'য়ে গেছে। সেই ফালি আলোতে ঢেউগুলি চিকমিক ক'রছে। মাঝে মাঝে দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে দু'-একটি কচুরি পানার ঝাঁক। আতোয়ার নীরবতা ভঙ্গ ক'রে শফিভাইকে বলল, '১৯৬১ সালে তো আপনি গফ্‌ফার খানের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। ওখানকার কথা বলুন।'

শফিভাই-এর গ্লাসের সরবত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। স্ট্র থেকে মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, বলছি।' একটু নীরব থেকে সুরু ক'রলেন শফিভাই, 'সেবার সীমান্তপ্রদেশে গিয়েই বুঝেছি গফ্‌ফার খানকে। দেখেছি সীমান্তের মানুষের হৃদয়ের কোথায় তাঁর আসন। মিয়া ইখতেখারুউদ্দীন জীপ দিয়েছিলেন কয়েকটা। সেই জীপে ঘুরে

বেড়াচ্ছি পাহাড়ি পথে। ছু'ধারে খাদ। একটু এদিক-ওদিক হ'লেই একেবারে খাদের গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে যাব। হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাদ জীপের ঠিক নিচেই। ভয়ে নিচেই তাকাচ্ছি না তাই। আমাদের গাড়িটা চালাচ্ছিল ইফতেখারসাহেবের এক সেকরেটারি। ইয়ং ছোকরা। ভারি আমুদে। খাদ দেখে যে আমরা ভয় পেয়েছি সে বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ একটা সরু বাঁকের কাছে এসে ষ্টীয়ারিং থেকে একটা হাত ছেড়ে খাদের নিচে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'শফিসাহাব উ দেখিয়ে। দো-তিন রোজ আগারি ইসমে একঠো গাড়ি গির গিয়া। পাতা হি নেহি মিলা উসকো।'

শুনে ভয়ে মাথা ঘোরাতে সুরু ক'রল। তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের অবস্থা দেখে ও মিটি মিটি হাসছে! ছুই চোখে কৌতুক ঝরে পড়ছে। খেঁকিয়ে উঠে বললাম, 'ব্যাটা খোট্টা, আমাদের দেশে ডিঙি করে মাঝ-পদ্মায় নিয়ে যদি দোল দিই হাসি বেরিয়ে যাবে।'

ড্রাইভ ক'রতে ক'রতে পিছন ফিরে সে বলল, 'হোয়াট পদ্মা।'

বললাম, 'পদ্মা জানো না? নদী! বিশাল নদী। বিরাট বিরাট ঢেউ! নৌকো ডুবলে আর ডাঙায় ফিরতে হবে না। কুমির এসে মুহূর্তে গিলে ফেলবে গপাৎ ক'রে।'

কথা শেষ না হ'তেই সে বলে উঠল. 'ও, দি বিগ রিভার অব ইস্ট পাকিস্তান? ইফতেখারসাহেবের সঙ্গে যখন পূর্বপাকিস্তানে গিয়েছিলাম, দেখেছি। বাপ্‌স! মুঝে দশ হাজার রুপেয়া ভি দেনে ছে 'বোট' কর্ ওহ্ রিভার মে নেহি জাউঙ্গা।'

'আর বক্ বক্ ক'রতে হবে না। সামনের দিকে তাকাও তো বাপু। তারপর ব্যাটা গিয়ে পড়বে খাদে।' আমি বললাম।

তাচ্ছিল্যের স্বরে সে জবাব দিল, 'আরে, শফিসাহাব ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

ভেলির ওপর দিয়ে যখন যেতাম হাজার হাজার পাঠান হাত নেড়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। জীপে করে যেতে যেতে

আঙুর ঝোপ থেকে আঙুরের থোকা ছিড়ে নিতাম। ঢাকাইয়াদের আঙুর খাওয়া দেখে ইফতেখারসাহেবের প্রাইভেট সেকরেটারি হেসে বলল, 'শফিসাহাব একটু রয়ে-সয়ে খাও। না হ'লে পেট কিন্তু সামলাতে পারবে না।'

'তাই নাকি!' ভয়ে ভয়ে আঙুর খাওয়া কমালাম।

ওখানে লোকবসতি ঘন নয়। দূরে দূরে এক-একটা গ্রাম। কিন্তু গফ্ফার খানের বক্তৃতা শোনার জন্য, তাঁকে এক নজর দেখার জন্য দূর দূর গ্রাম থেকে মাইলের পর মাইল হেঁটে সভায় এসে হাজির হ'য়েছে পাখতুনরা। আগের দিন রওনা দিয়ে পরের দিন এসে পৌছেছে এমন বহু লোক আমি বাজাউরে দেখেছি। সেই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাদের সম্বল শুধু রুটি আর দেশি বন্দুক। মাথায় পাগড়ি, কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত জড়ানো চাদর। পায়ে ঘাস বা চামরার সেণ্ডেল। দীর্ঘদেহী। বাজাউরের মসজিদে এসে দুপুর থেকেই জমেছে তাঁরা। খানসাহেবকে নিয়ে বিকেল নাগাদ গিয়ে পৌছলাম আমরা সেখানে। হাজার হাজার পাঠানের উল্লাসধ্বনিতে প্রকম্পিত হ'লো বাজাউরের ভেলি। জনতার সামনে দাঁড়িয়ে গফ্ফার খান বললেন: 'আল্লাহ্ মেহেরবান। তিনি আমাদের অনেক দিয়েছেন। এ-দেশের—সীমান্তের এই উপত্যকা, উপত্যকার মাটি আর পাথরের নিচে লুকানো রয়েছে অনেক সম্পদ, সুখে বাঁচবার মতো অনেক রসদ। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে আমরা সেই জমি থেকে কোনো উপকার পাই না। তোমরা হয়তো জানো না, তোমাদের দেশের সম্পদ শুষে অন্যেরা লাভবান হ'চ্ছে, অথচ তোমরা তার কিছুই পাচ্ছ না। ফলে তোমরা আজ খেতে পাচ্ছ না, শিক্ষা পাচ্ছ না। খাদ্যের অন্বেষণে এই যে তোমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ—এটা গোলাম মোহম্মদ, মির্জা আর আয়ুবের চক্রান্তেই হ'য়েছে। যদি তোমরা দেশকে ভালবাসো, দেশের মাটিতে ঘর বাঁধতে চাও, শান্তিতে বাঁচতে চাও,

তাহ'লে তোমাদের অর্থাৎ সোয়া কোটি পাখতুনকে সংঘবদ্ধ হ'তে হবে। খোদা অত্যাচারীকে কখনোই ক্ষমা ক'রবেন না।'

রাতটা কাটল ওই গ্রামেই এক মোড়লের বাড়িতে। প্রচুর সমাদার ক'রেছিল তাঁরা আমাদের। ওপরটা কঠোর দেখালেও পাঠানদের মনটা বড়ো নরম। দু'বেলা খিচুরি কিংবা রুটি আর রাতে নাচের আসর বসাতে পেলেই ওরা খুশি। জোগাড়যন্ত্র তেমন ছিল না। সেদিন রাতে আমাদের খিচুরিই খেতে দিল। গৃহকর্তা বার বার তার জন্য আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে গেলেন। আমরা কিন্তু পেট পুরেই সে রাতে খিচুরি খেয়েছিলাম। চমৎকার হ'য়েছিল খেতে। নানান তরিতরকারি মিশিয়ে খিচুরিটা ক'রেছিল। খানসাহেব খিচুরি খেলেন না। এখন আর এসব সহ্য হয় না। বয়স হ'য়েছে। তাছাড়া মার্শাল ল-এর পর জেলে গিয়ে শরীর ভেঙে গেছে তাঁর। দুধ আর কিছু ফল খেলেন শুধু তিনি।

পরের দিন গৃহকর্তা মাংসের আয়োজন ক'রলেন। রুটি মাংস দই দিয়ে খাওয়া সারলাম।

খুশাল খটকের সঙ্গে আমার ওখানেই আলাপ হ'য়েছিল। খুশাল খটক জনপ্রিয় পশতু কবি। তাঁর দেশপ্রেমের কবিতা আর গানে পাখতুনরা উদ্দীপ্ত হয়। ওদের ওপর যে কতো অত্যাচার ক'রেছেন আয়ুব ঠিক নেই। আয়ুবের বম্বার প্লেন সবচেয়ে বেশি আক্রমণ চালিয়েছে বাজাউরেই। খুশাল খটকের কাছে শুনেছিলাম তারই কিছু ঘটনা। খুশাল খটক বলেছিল, 'আয়ুবের সৈন্যরা আমাদের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তোমরা ভাবতেও পারবে না। কতোবার যে বোমা ফেলে গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। নারী শিশু নির্বিশেষে কতো পাঠানের রক্তে যে বাজাউর এবং সীমান্তের গ্রামগুলোর ধুলিমাটি সিক্ত হ'য়েছে অতো দূর থেকে তোমরা তা জানতেও পার না। গ্রামের পর গ্রাম, ঘরে ঘরে মিলিটারি ঢুকে মেয়েদের ওপর কতো অত্যাচার ক'রেছে, কতো পাঠান

যুবককে যে টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গেছে, জেলে পুরেছে কতো ছেলেকে, দুঃসহ নির্যাতনে কারাগারেই প্রাণ দিয়েছে যে কতোজনা কে তার খোঁজ রাখে। যাঁরাই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, আয়ুব তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রেছেন, উপোসী ক'রে মারতে চেয়েছেন। কিন্তু আয়ুবের কোনো নির্যাতনই আমাদের দমাতে পারবে না। স্বাধীন পাখতুনিস্তানের জন্য আমরা লড়ে যাবই। শোষক আর অত্যাচারীর সঙ্গে আমাদের আপোস নেই।' শফিভাই একটু থামলেন। বাটলার এসে সরবতের খালি গ্লাসগুলো নিয়ে গেল, পয়সা নিলো না। আতোয়ার সঙ্গে রয়েছে যে! জাহাজের প্রতিটি শ্রমিক আতোয়ারকে খুব খাতির করে। আতোয়ার ওদের নেতা। এমন নিঃস্বার্থ নেতা ওরা বড়ো একটা দেখে নি। আতোয়ারকে তারা ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আতোয়ারের মুখের কথায় ওরা ..র্তে নদীর মাঝখানে জাহাজ অচল ক'রে বসে থাকে।

চাঁদটা অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। ডেকেও খানিকটা রুপোলি আলো এসে প'ড়েছে। আমার মনে তখন প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চলেছে খুশাল খটকের কথা ক'টি। খাইবার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সারা দেশের দশ কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষ আজ রোষে ফুঁসছে। আয়ুবের কায়েমী তখত উল্টে ফেলার জন্য তৈরি হ'চ্ছে সকলে।

শফিভাই আবার বলতে সুরু ক'রলেন, 'বাজাউরের বক্তৃতার পর বেশি দিন আর খানসাহেব বাইরে থাকতে পারলেন না। আয়ুবের রোষে পড়ে আবার গ্রেপ্তার হ'লেন। ১২ এপ্রিল, ডেরা ইসমাইলখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। গফ্‌ফার খানের ভাই ডাক্তার খান সাহেবকে আয়ুব লোভের টোপ গিলিয়ে কবজা ক'রেছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও আবদুল গফ্‌ফার খানকে তাঁর পথ থেকে একচুল নড়াতে পারেন নি। বাদশা খানের কাছে গিয়ে আয়ুব বার বার বলেছেন, 'চাচা, আপনি শুধু আমায় সমর্থন করুন। যা বলবেন আপনি তাই করব। স্বায়ত্তশাসন ছাড়া যা চান তাই দেব।'

কিন্তু বাদশা খান তাঁর দাবি ছাড়লেন না। স্বাধীন পাখতুনিস্তান অথবা দেশরক্ষা ও মুদ্রা ছাড়া সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন না-দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি আপোস ক'রবেন না। তার জন্য বার বার জেলে যেতে হয়, সেও ভালো।

'৬১ সালে জেলে গিয়ে বাদশা খানের শরীর খুবই ভেঙে পড়ল। '৬৩ সালের শেষাশেষি আশঙ্কাজনকভাবে অবনতি ঘটল তাঁর শরীরের। সারা পাকিস্তানের মানুষ গফ্‌ফার খানের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হ'য়ে উঠল। '৬৪ সালের ৩০ জানুয়ারি হরিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। জেল থেকে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু অন্তরীণ করে রাখা হ'লো তাঁকে গৃহে। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসার জন্য শেষে সেপ্টেম্বর মাসে আয়ুব বাদশা খানকে গ্রেট ব্রিটেন যাওয়ার অনুমতি দিলেন। খানসাহেবকে বলা হ'য়েছিল, আফগানিস্তান এবং ভাবত ছাড়া তিনি সব দেশেই যেতে পারবেন। খানসাহেব সুযোগের অপেক্ষা ক'রলেন। শেষে কায়রো থেকে ভিসা পেয়ে গেলেন আফগানিস্তানের। পাকিস্তানের কায়রো দূতাবাস বাধা দিয়েছিল, সুবিধা ক'রতে পারে নি। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে কাবুল বিমান-বন্দরে গিয়ে যখন নামলেন তিনি হাজার হাজার আফগান 'ফকির-ই-আফগান জিন্দাবাদ', 'পাখতুনিস্তান জিন্দাবাদ' বলে অভিনন্দন জানালো গফ্‌ফার খানকে। বাদশা খান এখন আফগানিস্তানের জনগণের—আফগান-সরকারের মহামান্য অতিথি। এসব তো তোমাদের জানা-ই।' বলে আমাদের দিকে তাকালেন শফিভাই।

বললাম, 'হোক, তবু আপনি বলুন।'

শফিভাই বলতে লাগলেন, 'কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু আফগানিস্তান গিয়েছিল। ন্যাপের কর্মী। দেখা ক'রেছিল সে গফ্‌ফার খানের সঙ্গে। দার-উল-আমানে গাছ-গাছালিতে ছাওয়া এক সুন্দর ভিলাতে থাকেন এখন গফ্‌ফার খান। বন্ধুটির কাছেই

শোনা, বাড়িটা বেশ বড়োসড়ো এবং সাজানো-গোছানো। চাকর-বাকর থেকে সুরু ক'রে সুখ-সুবিধার যাবতীয় জিনিসই র'য়েছে সেখানে। লনে একটা চেয়ারে পাশাপাশি বসে গফ্ফার খানের সঙ্গে তার কথা হ'য়েছিল। খানসাহেবের পরনে ছিল আগেকার মতোই হাল্কা নীল খদ্দরের পাজামা এবং পাঞ্জাবি। মাথা ন্যাড়া। সকালে বিকেলে হাঁটেন। ভোর চারটেয় উঠে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েন গাড়ি নিয়ে। আফগান-সরকার একটা গাড়িও তাঁকে দিয়েছেন। কোনো কোনো দিন-বা লনেই বেড়িয়ে নেন। সাড়ে সাতটায় জলখাবার খান—ডিম, রুটি আর চা। দুপুরে কিছু সেদ্ধ সব্জী, দই, কিছু ফল আর নান খান। রাতে এক গ্লাস দুধ শুধু। ন'টা থেকে দুপুরে খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লোকের সঙ্গে দেখা করেন। সীমান্তের ওপার থেকে পাখতুন ভাইদের সঙ্গে ভবিষ্যত 'খোদা-ই-খিদমতগার' আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করেন। তাঁর এই আন্দোলন হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন। আলাপ করেন ট্রাইবাল চীফদের সঙ্গে। রাতে ঘুমানোর আগে পর্দানশীন মেয়েরা জিয়ারত করে যান বাদশা খানকে। একজন চেকোস্লোভ ডাক্তার রোজই তাঁকে একবার দেখে যান।' একটু থামলেন শফিভাই।

মনে হ'চ্ছিল, দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের, দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের সাড়ে আরো কোটি জনতার যে, মানবতার মূর্ত প্রতীক বাদশাখানের মতো মহান নেতাও দেশে থাকতে পারলেন না!

আতোয়ার শফিভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'বাদশা খান পাখতুন আন্দোলন সম্পর্কে কি এখন কিছু ভাবছেন?'

'নিশ্চয়ই। বাদশা খান দেশ-ছাড়া হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাখতুন আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার তিনি তাদের জাগিয়ে তুলবেন। আবার আন্দোলন সুরু হবে।' বললেন শফিভাই।

পাখতুন আন্দোলন সুরু হ'তে-না-হ'তেই তো আয়ুবের বোমারু

বিমান সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এ মাসেরই ৫ তারিখে বাগতি-বরা অঞ্চলে এক নাগাড়ে তিন দিন ধরে বোমা বর্ষণ ক'রেছে আয়ুবের সৈন্যরা। তিনটা গ্রাম একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। জানি না কতো লোক মরেছে! কতো মানুষের আর্তনাদে সেখানকার আকাশ বাতাস ভারি হ'য়ে গেছে। ৫০০শর বেশি দেশপ্রেমিক বালুচকে ধরে নিয়ে গেছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কতো সানঝের-খেলকে যে আবার 'টর্চার চেম্বারে' নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে আয়ুবের সৈন্যরা জানি না। জানি না হাজার হাজার আহত, নিহত আর ধৃতদের মধ্যে আহম্মদজাইও আছে কি না। কোনো খবর আমরা পাচ্ছি না। যতটুকু পাচ্ছি কাবুল রেডিও থেকে।

দেখলাম, আতোয়ারের দৃষ্টি দূরমনস্ক; জ্যোৎস্না-মাখা লক্ষ্যার জলের ওপর স্থির নিবদ্ধ। শফিভাইও নীরব। হাতে জ্বলে চলেছে সিগারটা। ধোঁয়ার সরু রেখা আলপনা এঁকে যাচ্ছে শূন্যে।

সিগন্যাল মেসে পৌঁছতে আমার সেদিন একটু দেরি হ'য়ে গেছিল। ঢুকেই দেখলাম বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি আবদুস সালাম খান ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপটেন আবদুল আলীম ভূঁইয়াকে জেরা ক'রে চলেছেন।

সালাম খান বলছেন, 'আপনি কি এর আগে কোনো রাজনৈতিক দলে ছিলেন?'

'না।'

'তাহ'লে কীভাবে স্বাধীন পূর্ববাঙলা আন্দোলনে জড়িত হ'লেন?'

'ক্যাপটেন হুদাই প্রথম আমায় এ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে তার উল্লেখ ক'রলেন। তারপর 'স্বাধীন পূর্ববাঙলার' পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য এবং কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেন। অবশ্য রাজনীতি না ক'রলেও পাকিস্তানের দুই অংশের নানান বৈষম্যের কথা আমিও জানতাম। অর্থনীতির ছাত্র আমি।'

সাক্ষীকে এই সময় থামিয়ে দিয়ে সালাম খান বললেন, 'আচ্ছা, দুই অঞ্চলের বৈষম্যের দু-একটা নজির আপনি দেখাতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি। এই যেমন ধরুন রূপপুর আণবিক পরিকল্পনা রূপায়ণে গড়িমসি, এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানার কথা আমি—আমি কেন, বোধ হয় সকলেই জানেন।'

'পিণ্ডিতে সামরিক হেফাজতে নিয়ে যাবার পর কি আপনাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হ'য়েছিল এবং ৫ জানুয়ারি রাতে খোলা জায়গায় শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল?'

'না, একথা সত্যি নয়।'

'রাওয়ালপিণ্ডির জিজ্ঞাসাবাদ-কেন্দ্রে আপনি কতোদিন ছিলেন ?'

'ঠিক মনে পড়ছে না কতোদিন ছিলাম। তবে দিন পনেরোর ওপরে নয়। আর, জিজ্ঞাসাবাদ-কেন্দ্রে আমি কখনো থাকি নি। প্রত্যেক দিন অফিসার্স মেস থেকে আমাকে নিয়ে যেত সেখানে।'

'আপনি স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন কবে ?'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী করার দিন দশ-বারো আগে। স্বীকারোক্তি করার জন্য লেফটেন্যান্ট শরীফ আমায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনি কি জানতেন না যে, স্বীকারোক্তির ফলে আপনারও শাস্তি হ'তে পারে ?'

'না, আগে জানতাম না। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে জানতে পারি।'

'আপনি কবে রাজসাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন ?'

' '৬৮ সালের মে মাসের গোড়ায়।'

'আচ্ছা ক্যাপটেন হুদার সঙ্গে কখন আপনার প্রথম আলাপ হয় ?'

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়। সলিমুল্লাহ্ হলেই আমাদের পরিচয়। সম্ভবত সেটা ১৯৫৮ সাল। হুদা মাস কয়েক সলিমুল্লাহ্-হলে ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তেন তিনি; আমার কিছুটা সিনিয়র।'

'ক্যাপটেন নুরুজ্জামানের সঙ্গে কবে থেকে আপনার আলাপ ?'

'সলিমুল্লাহ্ হলে থাকা কালেই নুরুজ্জামান ক্রীড়াসম্পাদকের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন একবার। জিতেও ছিলেন।'

'সামরিক হেফাজতে থাকাকালে ক্যাপটেন মুতালেব ও ক্যাপেটেন হুদাকে ইলেকট্রিক শক দেয় এবং খোলা জায়গায় অন্তর্বাস পরিয়ে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখে। এখবর আপনি জানেন কি ?'

'না, আমি জানি না।'

'রাজসাক্ষী না হ'লে আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে হাজির করানো হবে বলে কি হুমকি দেওয়া হ'য়েছিল ?'

'না। আটক অবস্থায় ক্যাপটেন হুদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। ক্যাপটেন শওকত ছিলেন আমার সঙ্গে।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে যাওয়ার আগে মেজর হাসান আপনাকে কি একটা লিখিত জবানবন্দী দিয়েছিলেন ?'

'না। মেজর হাসানের ওপর আমার দেখাশোনার ভার ছিল। কিন্তু মামলা নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে আমার কোনো আলোচনা হয় নি।'

'মেজর হাসান কি আপনাকে বলেন নি যে ডিকটেশন অনুযায়ী যদি আপনি জবানবন্দী ক'রেন, তাহ'লে আপনাকে রাজসাক্ষী করা হবে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে।'

'না, একথা সত্যি নয়।'

'আপনি কি জানেন যে, ১৯৬৫ সালে এক দুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে রাওয়ালপিণ্ডির কম্বাইণ্ড মিলিটারি হাসপাতালে তিনি ছিলেন ?'

'হ্যাঁ। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি আঘাত পান।'

'অথচ পুলিশের কাছে বিবৃতিতে আপনি বলেছেন নাজমুল হুদা সি. এস. পি. দুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে কম্বাইণ্ড মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হন ?'

'আমার স্মরণ নেই।'

'ক্যাপটেন হুদার গৃহে যে-সভা হয় তাতে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত ছিলেন—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দীতে আপনি তা উল্লেখ করেন নি।'

'আমার মনে ছিল না।'

'এখন রাজসাক্ষী রমিজের বক্তব্য সমর্থনের জন্যই লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম উল্লেখ ক'রছেন ?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'আচ্ছা, ক্যাপটেন রমিজের ঢাকা ফ্ল্যাটে কয়েকটা সভাতেই তো আপনি গিয়েছিলেন ? মিস্টার রমিজের ফ্ল্যাটটা কোথায় ? দেখতে কী রকম ?'

'ক্যাপটেন রমিজের ফ্ল্যাটটা ছিল মোহাম্মদপুর কলোনীতে। বেশ বড়োসড়ো ফ্ল্যাট। বাড়িটা সম্ভবতঃ তেতলা।'

'রমিজের বাসায় যে-সব সভা হ'য়েছিল তাতে আপনি কখনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করেন নি ?'

'না।'

'এই সময় সভায় কি সাধারণ কর্মীদের ডাকা হ'তো ?'

'না। বিশেষ নেতৃস্থানীয় লোকদেরই ডাকা হ'তো।'

'তার মানে আপনি দলের বিশেষ সদস্যের পর্যায়েই পড়েন। আন্দোলন সম্পর্কিত নানান বিষয়ে আলোচনা এবং পরামর্শের জন্যই নিশ্চয়ই আপনাদের ডাকা হ'তো। অথচ আপনি কোনো আলোচনাই করেন নি এটা কি বিশ্বাস যোগ্য ?'

'সেরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় নি বলেই আলোচনা করি নি।'

'দাউদকান্দির সভায় যোগ দিতে কিসে ক'রে গিয়েছিলেন।'

'ক্যাপটেন হুদার স্ট্যাম্প কার-এ ক'রে। ঢাকা থেকে দাউদকান্দি যেতে তিনটে ফেরী পার হ'তে হয়। তার একটিতে 'কুদ' দিতে হয়।

'দাউদকান্দির কোথায় আপনাদের গোপন সভা হয় ?'

'সেখানকার ডাকবাংলোতে।'

'কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা হ'য়েছিল সে-সভায় ?'

'সভায় নেতৃত্বের প্রশ্ন, অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার, সদস্যদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স এবং আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।'

'সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ কি সে সভায় ছিলেন ?'

'আমার মনে নেই।'

'আপনি কখন জানতে পারেন যে, গোয়েন্দা-বিভাগের কাছে বিপ্লবীসংস্থার কার্যকলাপ ফাঁস হ'য়ে গেছে?'

'১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।'

'আপনার বন্ধুদের কি আপনি সেকথা জানিয়েছিলেন?'

'না।'

'আমি যদি বলি, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং আদালতে আপনি যা বলেছেন তা বানানো।'

'না, তা ঠিক নয়।'

সাক্ষী আবদুল আলীম ভূঁইয়াকে জেরা শেষ ক'রে সালাম খান বসে পড়লেন। তারপর জেরা ক'রতে উঠলেন বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলি ফজলুল করিম। মিস্টার করিম দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনাদের যে-সব সভা হয়, তাতে কি বিপ্লবের পর প্রথম ক'বছর দেশে সামরিক আইন চালু রাখা হবে—সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা হ'য়েছিল?'

'না।'

'স্বাধীন পূর্ববাঙলার কাঠামো সম্পর্কেও কোনো আলোচনা হয় নি?'

'অন্ততঃ আমি যে-ক'টা সভায় উপস্থিত ছিলাম তাতে হয় নি।'

'সিন্ধু অববাহিকা উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও ফরাক্কা বাঁধ—এই দুইটির কোনটির ওপর কেন্দ্রীয় সরকার বেশি গুরুত্ব আরোপ ক'রেছে সে-সম্পর্কে কোনো আলোচনা হ'য়েছে কি?'

'না।'

'ভারত এবং ভারত সমর্থক রাষ্ট্ররা স্বাধীন পূর্ববাঙলা রাষ্ট্রে কেন আক্রমণ ক'রবে না—সে সম্পর্কে কি কিছু আলোচনা হ'য়েছিল?

'না।'

মিস্টার করিমের জেরা শেষ হ'লো।

এর পর উঠে দাঁড়ালেন বিরোধী পক্ষের আর-একজন কৌঁসুলি

বদরুল হায়দার চৌধুরী। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু ক'রলেন তিনি। 'আপনি 'কমাণ্ডো স্টাইল' অপারেশন বলতে কী বোঝেন?'

'চাতুরীর সাহায্যে হঠাৎ আক্রমণ করার নাম কমাণ্ডো স্টাইল অপারেশন।'

'সেনাবাহিনীর সবাই কি এটা জানে?'

'সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'ক্যাপটেন শওকতের কি মেজরের পদে উন্নীত হওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার ক'রে আপনাকে পিণ্ডি নিয়ে যাবার সময় সঙ্গে কে ছিলেন?'

'পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের মেজর নাসির।'

'রাওয়ালপিণ্ডিতে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রটি কোথায় ছিল?'

'কম্বাইণ্ড মিলিটারি হাসপাতালে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

ডক থেকে নেমে গেলেন ক্যাপটেন আবদুল আলীম ভুঁইয়া।

এবারে সাক্ষ্য দিতে উঠেছেন কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম। রাজসাক্ষী। সালাম খান ছাড়াও ওই দিন সাক্ষীকে আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, ডক্টর আলীম-আল-রাজী, জুলমত আলী, বদরুল হায়দার চৌধুরী এবং ফজলুল করিম জেরা করেন। প্রথমেই সালাম খান উঠে সাক্ষীকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি বলেছেন, জুন মাসে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ্‌র বাসায় এক বৈঠক হয়।'

'আমার স্মরণ নেই।'

'যদি বলি জুন মাসে জনাব মফিজুল্লাহ্‌ আবিসিনিয়া লাইনে ছিলেন না?'

সাক্ষী চুপ ক'রে রইলেন।

'আচ্ছা, সার্জেণ্ট জলিলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে হাতবোম দেখানো হ'য়েছিল বলে তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উল্লেখ্ ক'রেছেন ?'

'আমি মনে করতে পারছি না।'

'আপনাকে প্রথম দলে ভিড়িয়েছিল কে ?'

'কর্পোরাল আফতাব।'

'স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে আপনার প্রথম কবে, কোথায় আলাপ হয় ?'

'সুলতানউদ্দীনের বাসায়। সম্ভবত সেটা চট্টগ্রাম যাওয়ার আগে।'

'আপনার মাতৃভাষা কী ?'

'বাংলা।'

'তবে ইংরেজিতে জবানবন্দী দিলেন যে !'

'ভাবলাম, জবানবন্দী বোধ হয় ইংরেজিতেই দিতে হয়।'

'কেন, যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁদের বুঝি আর জবানবন্দী হয় না !'

'না, হয়।'

'আমি যদি বলি আগে থেকেই স্টেটমেণ্টটা তৈরি ছিল এবং আগে থেকেই তৈরি করে আপনার কাছে দিয়েছিল সরকার-পক্ষের লোক।

'একথা সত্যি নয়।'

'জবানবন্দী দিতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনাকে প্রথম কে নিয়ে যান ?'

'লেফটেন্যাণ্ট শরীফ।'

আবদুস সালাম খান তখন আতাউর রহমান খান, বদরুল হায়দার চৌধুরী, ফজলুল করিম প্রমুখের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আপনারা জেরা করতে পারেন।'

অন্যান্য কৌসুলিরা একে একে রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করলেন। জেরা চলল দুপুরের বিরতি পর্যন্ত।

বিরতিতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। শাহাবউদ্দীন যে দর্শকদের গ্যালারিতে ছিল জানতাম না। বাইরে এসে দেখা হ'য়ে গেল। শাহাবউদ্দীনই বলল, 'চল্, অফিসার্স মেসে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'

লাল সুরকি ঢালা পথ ধরে এগিয়ে গেলাম মিলিটারি অফিসার্স মেসের দিকে। একটু ঢুকেই একফালি মাঠ। মাঠে সবুজ মখমলের মতো বিছানো ঘাস। চারপাশে লিচু আর আমের গাছ। মাঠের একধারে রয়েছে সিমেন্টের অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি স্তম্ভ। শাহাবউদ্দীনের সেই অফিসার বন্ধু মিস্টার আক্তার পরে বলেছিলেন, ওটা সূর্য-ঘড়ি। সেই অর্ধচন্দ্রের গায় দাগ কাটা। শিকের ওপর সূর্যের আলো পড়লে তার ছায়া কাটা দাগে পড়ে সঠিক সময় নির্দেশ করে। রিস্টওয়াচের সঙ্গে সানডায়ালের সময় মিলিয়ে দেখলাম ঠিক সময় দিচ্ছে।

কফি খেতে খেতে মিস্টার আক্তারের সঙ্গে অনেক আলাপ হ'লো। শাহাবউদ্দীনকে খুব খাতির ক'রল মিস্টার আক্তার। বিরতির পর ট্রাইবুনালের অধিবেশন আবার সুরু হবার সময় হ'লো।

ফিরে এলাম সিগন্যাল মেসে।

সাক্ষ্য দিচ্ছেন মোহাম্মদ গোলাম আহাম্মদ। রাজসাক্ষী। ফরিদপুরের লোক। বছর পঁচিশেক বয়স। সরকারপক্ষের কৌসুলি মঞ্জুর কাদেরের কথায় সাক্ষী বলে চললেন: '৫৮ সালে রেটিং হিসাবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে আমি যোগ দিই। পরে করাচিতে গিয়ে 'পি. এন. এস. বাহাদুর'-এ ট্রেনিং নিই। '৬০ সালে আমাকে পি. এন. এস. টুগ্রীলে নিয়োগ করা হ'লো। '৬৬ সাল পর্যন্ত ওই জাহাজেই ছিলাম আমি। করাচি থাকা কালেই স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ এবং নূর মোহাম্মদের

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁরা প্রায়ই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেনাবাহিনীতে পশ্চিমপাকিস্তানী অফিসারের আধিক্য ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতেন। '৬৪-৬৫ সালের দিকে জাহাঙ্গীর রোডে 'ফরিদপুর সমিতি'র অফিসে প্রাক্তন কর্পোরাল আমির হোসেনের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আমার কোনো আলোচনা হয় নি। '৬৪-র শেষাশেষি কিংবা '৬৫ সালের গোড়ায় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমায় প্রথম বলেন, পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁরা একটা বিপ্লবী সংস্থা ক'রছেন। আমাকেও তিনি ওই সংস্থায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। '৬৬ সালে বেকার হ'য়ে পড়লে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমায় ঢাকা গ্রীন ভিউ পেট্রোলপাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রতে বলেন। পেট্রোলপাম্পেব ম্যানেজার আমায় ১০০/৩ আজিমপুর রোডের 'সাইকী' নামে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরে ওখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। তখন আমার কাজ হ'লো ঢাকায় সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিটগুলি থেকে খবর ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং চিঠি আদান-প্রদান করা। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জি. ও. সি. এবং এন. সি. ও.দের সম্পর্কে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে একটি লিখিত বিবরণ সরবরাহ করি। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে আমি ১৩ গ্রীন স্কোয়ারে উঠে যাই। সেখানে অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম।'

জবানবন্দী শেষ হ'লে আবদুস সালাম খান জেরা ক'রতে উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কবে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়?'

'৯ ডিসেম্বর। অসামরিক পুলিশ এসে সকালের দিকে আমাকে

গ্রেপ্তার করে ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে নিয়ে যায়। কয়েকদিন বাদে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রাজারবাগ নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

'আপনি কি ক্ষমা পাওয়ার জন্যই স্বীকারোক্তি ক'রেছেন ?'

'না। ধরা পড়ার পরই আমি ঠিক ক'রেছিলাম সবকিছু খুলে বলব।'

'আচ্ছা ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের জি. ও. সি. সম্পর্কে যে তথ্য আপনি সরবরাহ ক'রেছিলেন—আপনার মনে আছে কি ?'

'না।'

'অস্ত্রলাভের জন্য আগরতলায় যে একটি প্রতিনিধি দল যাবে কোনো সভায় সে-আলোচনা আপনি শুনেছিলেন কি ?'

'না। মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় সেকথা জানিয়েছিলেন ?'

'আপনি কি পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়েই সে-সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন না কোনো স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল।'

'স্বাধীন পূর্ববাঙলার' আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়েই আমি বিপ্লবী সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম।'

'হঠাৎ এই বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে ওঠার কারণ ?'

সাক্ষী নীরব রইলেন।

সালাম খান দু'-এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে বললেন, 'স্যার, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

কিছুদিনের জন্য মূলতবী রইল ট্রাইবুনালের অধিবেশন।

আনিস বাকার
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
২৮ নভেম্বর, ১৯৬৮
করাচি

ভাই হায়দার,

স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নিয়ে বাঁচার কথা তোমরাই আমাদের প্রথম শুনিয়েছ—শুনিয়েছ ঘুমভাঙার গান। পাকিস্তানে কায়েমীশাসক আর শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করার পথিকৃৎ তোমরা। এক ইউনিট বাতিল করা আর স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবি তোমরাই প্রথম তুলেছ; তোমরা আমাদের প্রেরণা। তোমাদেরই পথে এগিয়ে গেছে বালুচ আর পাখতুনরা। শ'য়ে শ'য়ে বালুচ আর পাখতুন প্রাণ দিয়েছে আয়ুবের বুলেট আর বোমার আঘাতে। পাখতুনরা ছাড়া সারা পশ্চিমপাকিস্তানের লোক ছিল এতদিন ঘুমিয়ে। আজ জেগে উঠেছে। দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানের ছাত্রসমাজ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনে। করাচি থেকে খাইবার সারা দেশের মানুষ আজ জেগে উঠেছে রুদ্ধ আক্রোশে। আয়ুবের নির্যাতনই আমাদের সংগ্রামী ক'রে তুলেছে, ঠেলে দিয়েছে আন্দোলনের পথে।

সান্ধিকোটাল থেকে ফিরে আসার পথে একদল ছাত্রকে পেশোয়ার পুলিশ অযথা নির্যাতন করে, মালপত্র কেড়ে নেয়। তারই প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর পিণ্ডির গর্ডন কলেজের ছাত্ররা এক সভায় নিন্দা করে পুলিশী জুলুমের। তারপর সেখান থেকেই একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি যাচ্ছিল হোটেল ইণ্টার

কন্টিনেণ্টালে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড্. এ. ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানাতে। কোনো অন্যায় করে নি। তবু সেই ছাত্র-মিছিলে চলল পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া! পুলিশের নির্যাতন কিন্তু ওখানেই শেষ হয় নি। নিরীহ ছাত্রদের ওপর গুলি পর্যন্ত চালাল পুলিশ নির্বিচারে। স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল পলিটেকনিক ইন্সটিট্যুটের সতের বছরের ছাত্র আব্দুল হামিদ! কিন্তু মাঝ-পথেই নীরব হ'য়ে গেছে তার কণ্ঠ। পুলিশের বুলেট পাঁজর ভেদ ক'রে চলে গেল তার। ফিনকি দিয়ে ছুটল লাল রক্ত। হামিদের তাজা রক্তে পিণ্ডির পথ রঞ্জিত হ'লো।

আর, করাচিতে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম ছাত্রদের বেতন কমানোর, কালাকানুন বাতিলের। রেহাই দেয় নি আয়ুবের পুলিশ আমাদেরও। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছোড়া আব লাঠি চালনার ব্যতিক্রম হয় নি এখানেও। আন্দোলন দমাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ক'রে দিয়েছে পিণ্ডি আর করাচির সমস্ত স্কুল-কলেজ। কিন্তু আমাদের আন্দোলন বন্ধ হয় নি। করাচি-পিণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে সে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে লাহোর, পাঞ্জাব, মূলতান— পশ্চিমপাকিস্তানের সর্বত্র। পুলিশে কুলোয় নি' পিণ্ডিতে তলব ক'রতে হ'য়েছে সেনাবাহিনী। কার্ফু জারি ক'রেছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সকালবেলায়ই শাহারা-ই-পাহলভীতে ছাত্র মিছিলে লাঠি আর বেঅনেট চার্জ ক'রেছে পুলিশ, ছুড়েছে টিয়ারগ্যাস, বুলেট। শাবিস্তান সিনেমা হলের সামনে ছাত্র আর পুলিশে ছোটোখাটো একটা লড়াই হ'য়েছিল ধরতে পার। জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের পিণ্ডির নেতা মমতাজ মেঘরী আর আব্দুল হাই বালুচকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। গ্রেপ্তার ক'রেছে শ্রমিকনেতা রানা আজাহার আলী খান আর মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে। ট্রাক বোঝাই করে গারদে নিয়ে পুরেছে আরও ১২০ জনকে।

কাশ্মীর ডাকে করাচির ছাত্রছাত্রীরাও সেদিন বেরিয়ে

এসেছিল পথে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ক'রে তুলেছিল করাচির রাজপথ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রমিছিল যখন নাজিমাবাদ আর বার্নস রোডে এসে পৌঁছল, পুলিশ আর মিলিটারি মুহূর্তে ঘিরে ফেলল আমাদের। তারপর চলল এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ। গুলিও ছুড়ল পুলিশ। বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল দু'জন। পিণ্ডির মতো করাচির রাজপথও শহীদের রক্তে পবিত্র হ'লো। বেঅনেট আর লাঠির আঘাতে স্কুলের কচি কচি ছেলেরা লুঠিয়ে পড়ল মাটিতে। তবু রেহাই নেই। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে তুলল প্রিজনভ্যানে। ৬০ জনের মতো ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল জাতীয় ছাত্রফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ডি. খান, জিন্নাহ্ কলেজের ছাত্রসংসদের প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, আর ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কাজমীকে। পুলিশভ্যানে যাবার আগ-মুহূর্তে কাজমী আমায় বলে গেল, আনিস তোর ওপরই আন্দোলনের ভার রইল। দেখিস্ এ-আন্দোলন যেন স্তব্ধ না হয়। আমাকে জেলে নিয়ে যাচ্ছে জালিম আয়ুব, কিন্তু আমার আত্মাকে ছুঁতে পারবে না। আমার আত্মা থাকবে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে। ভয় ক'রো না। এগিয়ে চলো।

হ্যাঁ, এগিয়ে চলেছি আমরা। এগিয়ে চলেছে বাহাওয়ালপুর, নওশেরা, লায়ালপুর, শিয়ালকোট—সারা পশ্চিমপাকিস্তানের ছাত্র আর জনসাধারণ। আমাদের আন্দোলন এতো দুর্বার হ'য়ে উঠেছে যে, টলে উঠেছে আয়ুবের কায়েমী সিংহাসন। আন্দোলন বানচাল করার জন্ত চাতুরির আশ্রয় নিতে হ'য়েছে তাঁকে। ১০ নভেম্বর পর পর দুবার গুলি ছুড়েও আঁততায়ী সামান্ত আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগাতে পারল না আয়ুবের গায়, এ হেন অভিনয়ে আর সবাই ভুলুক ছাত্রদের প্রতারিত করা যায় নি। আয়ুব বোধ হয় জানেন না যে, ছাত্রদের বুলেট ফসকায় না, লক্ষ্য ভেদ করে ঠিক ঠিক। একতাই আমাদের বুলেট। বুলেটের

হাত থেকে বাঁচলেও আমাদের দুর্বার আন্দোলনের তোড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন কি আয়ুব!

প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের তোড়ে দিশেহারা হ'য়ে আয়ুব আর মুসা নির্বিচাবে গ্রেপ্তার ক'রে চলেছেন ছাত্র আর রাজনৈতিক নেতাদের। ভুট্টো, গফ্ফার খানের ছেলে ওয়ালী খান এবং আরো অনেক নেতাকে নিয়ে পুরেছেন হাজতে। ব্যাপক ধরপাকড় চলছে এখনো। চলছে গুলি। করাচি পিণ্ডিতেই নয়, এবার নওশেরায়ও ছাত্র মিছিলের ওপর গুলি চালাল পুলিশ। ছাত্রনেতা জহির নক্ভী শহীদ হ'লো। কিন্তু কয়জন আবদুল হামিদ আর জহির নক্ভীকে ওরা মারবে? আয়ুব জানেন না যে, শহীদের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে আজ তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নির্ভীক আবদুল হামিদ আর জহির নক্ভী। মেয়েরাও আজ বোরখা খুলে বেরিয়ে এসেছে পথে। বেরিয়ে এসেছে আইনজীবি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, কেরানী সবাই। বীরকে আমরা পূজা করি, কিন্তু কাপুরুষকে? কয়েকজন কাপুরুষ আইনজীবিকে আমরা কিভাবে পুরস্কৃত ক'রেছি দিন-কয় আগে জানো কি? প্রত্যেকের জন্য এক প্যাকেট করে চুরি পাঠিয়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের আন্দোলন যতই দিন দিন তীব্র হ'য়ে উঠছে, আয়ুবের নগ্ন বর্বর রূপ্ ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কখনো শুনেছ কি কোনো সভ্যদেশে ছাত্রদের উলঙ্গ ক'রে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় আগে পিছে বেঅনেট উঁচিয়ে! পেশোয়ারে তাই হ'য়েছে। সদর রোড দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে স্কুল-কলেজের ছেলেকে ন্যাংটো ক'রে প্যারেড করিয়ে নিয়ে গেছে আয়ুবের বর্বর সৈন্য আর পুলিশেরা। অত্যাচারীর সঙ্গে তারপরেও কোনো আপোস চলে! বিক্ষোভের যে-আগুন ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলতে সুরু ক'রেছিল আজ তা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু যে-পূর্ববাঙলা গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পূর্ববাঙলার

যে-ছাত্ররা সারা দেশের নমস্ত তারা আজ নীরব কেন! আমাদের পাশে তোমরাও এসে দাঁড়াচ্ছ না কেন আজ? পশ্চিমপাকিস্তানের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে এই 'কেন'র জবাব চাইতেই তোমাকে এ-চিঠি লিখছি। ইতি।

তোমার
আনিস বাকার

ছাত্রনেতা আনোয়ার হায়দার কণ্ঠে আবেগ ঢেলে এক দমে পড়ে গেল চিঠিটা। অনুবাদ করে নয়, চিঠির ইংরেজি বয়ানটাই পড়ল হায়দার। টুঁ শব্দটি শোনা যায় নি এতক্ষণ। রুদ্ধশ্বাস হ'য়েছিল সবাই। চিঠি-পড়া শেষেও একটা অস্বাভাবিক নীরবতায় মধুর ক্যানটিনের পরিবেশটা থমথমে হ'য়ে উঠল। একটু-একটু শীত পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার পুকুরের পাতলা সিল্কের মতো জলে কুয়াসার আস্তরণ জমতে সুরু ক'রেছে। আমগাছটায় পাখির ডানার ঝটপটানি শোনা গেল। ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহাম্মদ মুখ খুলল প্রথমে। বলল, 'আনিস বাকারের এই চিঠির পরও যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি, তাহ'লে বরকত-সালাম-শফিকুরের আত্মা আমাদের ক্ষমা ক'রবে না, ক্ষমা ক'রবে না পূর্ব-বাঙলার ভাবী ছাত্রসমাজ। আয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে আজ আমাদেরও রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আমাদের সামনে আজ কঠোর দায়িত্ব। পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক দলগুলোকে এক ক'রতে হবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে। চালাতে হবে দুর্বার লড়াই। পশ্চিমপাকিস্তানী ছাত্রভাইদের ওপর নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে, নির্বিচারে গুলি ক'রে হত্যার যে তাণ্ডব সুরু ক'রেছেন প্রতিবাদ জানাতে হবে তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা আর স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য চালাতে হবে আন্দোলন; আন্দোলন চালাতে হবে অগ্নি-কন্যা মতিয়া চৌধুরি আর রাশেদ খান মেননের মুক্তির জন্যে। মুক্তি চাইতে হবে পূর্ববাঙলার

জনপ্রিয় নেতা মুজিবর রহমান, মনি সিং, আবদুল হালিম এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের। পূর্ববাঙলারই অর্থে পূর্ববাঙলার নেতা আর রাজনৈতিক কর্মীদের হেয় করার জন্য সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রহসন আর চলতে দেওয়া যায় না। এরই মধ্যে এই মামলার জন্যে পনের লক্ষ টাকা খরচা ক'রেছেন মোনেম খান। ২৪ নভেম্বর ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি যে-দাবি দিবসের ডাক দিয়েছে সারা দেশে দলমত নির্বিশেষে আমাদেরও তাতে যোগ দিতে হবে। সার্থক ক'রে তুলতে হবে দাবি-দিবস।' একটানা কথা বলে থামল তোফায়েল।

পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুদ্দিন আহাম্মদ মাণিকও তোফায়েলের কথা সমর্থন ক'রল। মধুর ক্যান্টিনে ঢাকার ছাত্ররা আবার একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল।

২৪ নভেম্বর।

কাতারে কাতারে মানুষ এসে জমছে বায়তুল মোকারমের সামনে। স্টেডিয়ামের ছাদে, কার্নিসেও মানুষের ভিড়। নানা মিছিল এসে মিশছে জনসমুদ্রে। হাতে তাদের ফেস্টুন, মুখে স্লোগান : 'রাজ-বন্দীদের মুক্তি চাই,' 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', 'পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দিতে হবে', 'পশ্চিমপাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল কর,' 'জরুরি অবস্থা বাতিল কর', 'রাজনৈতিক মামলা তুলে নিতে হবে', 'দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর', 'অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে', ইত্যাদি।

মোজাম্মেল স্টেডিয়ামের ছাদ থেকে একটা ফটো নিল ওয়াইড লেন্সে।

রুশপন্থী ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহাম্মদ মঞ্চে উঠলেন। দাঁড়ালেন এসে মাইকের সামনে। শ্রোতারা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দিত ক'রল অধ্যাপক আহাম্মদকে। হর্ষধ্বনি একটু কমলে মোজাফ্‌ফর আহাম্মদ বলতে সুরু ক'রলেন,

'ভাই সব, আজ কায়েমীশাসকের বিরুদ্ধে চরম লড়াইয়ের সময় এসেছে। দিন-কয়েক আগে সরকার সারা দেশে উন্নয়ন দশক পালন ক'রেছে। আয়ুব-মোনেম আর তাঁদের বশংবদরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার ক'রে চলেছেন, গত ১০ বছরে—আয়ুবের আমলে দেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে—টেলিভিসন এসেছে, সৈন্য বেড়েছে, শহরে শহরে আকাশচুম্বী বাড়ি উঠেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেশের অগণিত কৃষক-শ্রমিকের মুখে আজও দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না। কৃষক আর শ্রমিককে বঞ্চিত ক'রে যে-সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে আজ সেই সেনাবাহিনীই তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয়কোটি মানুষের ক্ষোভ আজকের নয়, দীর্ঘ দিনের। পশ্চিমপাকিস্তান এতদিন নীরব ছিল। আজ তারাও জেগে উঠেছে, বালুচ আর পাখতুনদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়ুবের স্বৈরাচারের প্রতিবাদে সারা পশ্চিমপাকিস্তানে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে। ছাত্ররা প্রাণ দিয়ে চলেছে আয়ুবের বুলেটের গুলিতে। আয়ুব মরিয়া হ'য়ে পুলিশ আর সৈন্যদের লেলিয়ে দিচ্ছে নিরীহ ছাত্র আর নাগরিকদের ওপর। লেলিয়ে দিচ্ছে গুণ্ডা। জানি না এইসব গুণ্ডাদলের নেতৃত্বে আয়ুব-তনয় সেই কুখ্যাত গওহর আয়ুবই আছে কি না। বাপের দৌলতে যে-আজ গান্ধারা ইণ্ডাস্ট্রীজের মালিক হ'য়ে গুণ্ডাদল পুষছে। যে-কুখ্যাত গওহর আয়ুব ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ভোট দেওয়ার অপরাধে করাচির পল্লীতে পল্লীতে অগ্নিসংযোগ আর ছুরিকাঘাতে নারকীয় উৎসব পালন ক'রেছে। কিন্তু জেনে রাখুক আয়ুব-মোনেম-গওহর খাইবার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ আজ ফুঁসে উঠেছে। সেই বিক্ষুব্ধ মানুষের অগ্নিনিশ্বাসে আয়ুবের সৈন্য আর গুণ্ডারা পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আজ আমরা আয়ুবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই—পশ্চিম-পাকিস্তানী ভাইদের পাশে পূর্ববাঙলার সড়ে ছয় কোটি মানুষও আছে। পশ্চিমপাকিস্তানী ভাইদের ওপর সামান্য নির্যাতনও আমরা

সহ্য ক'রব না। ভুট্টো, ওয়ালী খান, ওসমানী, আজমল খাটক, হাফিজ কোবেলী, বাকের শাহ্ সহ সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তি দিতে হবে পূর্ববাঙালার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের। মানতে হবে আমাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং অন্যান্য দাবি।' অধ্যাপক আহাম্মদ থামলেন।

মিনিট খানেক শুধু করতালিই শুনতে পেলাম। এরপর ন্যাপের আরও কয়েকজন নেতা এবং ছাত্রনেতা বক্তৃতা দিলেন। তারপর বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে সভার সেই বিশাল জনতা রমনার পথে এগিয়ে চলল কেন্দ্রীয় শহীদমিনারের দিকে। প্রেসক্লাব পেরিয়ে কার্জনহলের পাশ দিয়ে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে গিয়ে পৌঁছল। যতদূর দেখা যায় লোক আর লোক। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো এসে প'ড়েছে শহীদমিনারের কাঁচে। নানা বর্ণে বিচ্ছুরিত হ'য়ে সেই আলো শহীদমিনারটাকে অলৌকিক ক'রে তুলেছে। ওলি আহাদ ভাই শহীদ মিনারের চত্বরে উঠে জনতাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'শহীদদের পুণ্যবেদী স্পর্শ ক'রে আজ আমাদের শপথ নিতে হবে স্বৈরাচারীর বিনাশ না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই।'

সঙ্গে সঙ্গে অযুত জনতা গর্জে উঠল : চলবে—চলবে। মিনারের গায় সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরল : চলবে—চলবে।

১৩ ডিসেমবর।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—। টেলিফোনটার আওয়াজে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তখনো কুয়াসা ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়, বাগানে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের লাল আলোটা কুয়াসার আড়ালে ফুটি-ফুটি ক'রছে। পাশ ফিরে তুলে নিলাম ফোনটা। ওপাশ থেকে আনোয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে

এলো : 'কি রে তুই এখনো ঘুমুচ্ছিস, শীগ্‌গীর চলে আয়। শ্রমিক বিক্ষোভের এমন দৃশ্য আর কখনো দেখতে পাবি না।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কোত্থেকে কথা বলছিস তুই ?'

উত্তর এলো : 'আদমজী শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস থেকে।'

বললাম, 'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি, তুই থাকিস।'

আতোয়ার ফোন ছাড়তেই মোজাম্মেলকে ফোন ক'রলাম। চলে আসতে বললাম তাঁকে আদমজী মিলে। কোনো মতে মুখহাত ধুয়ে গায়ে টেরিউলের কোটটা চাপিয়ে একটা বেবিট্যাকসী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আদমজী মিলের উদ্দেশ্যে।

গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে সকালের নৈঃশব্দ্য খান খান করে ছুটে চলেছে বেবিট্যাকসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই ছাড়িয়ে গেলাম। ডান পাশে শীতলক্ষ্যায় ফ্ল্যাট, লঞ্চ এবং মালবাহী জাহাজগুলো কুয়াসার পাতলা চাদর গায় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। হু হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস এসে চোখে-মুখে ঝাপ্টা দিচ্ছে। মুহূর্তে নবীগঞ্জ খেয়াঘাট ডানে রেখে আই. টি. ই. স্কুল পিছনে ফেলে আদমজী রোডে গিয়ে পড়লাম। কংক্রিটে বাঁধানো সরু রাস্তাটা চলে গেছে সোজা। দু'পাশে জমি আর নালা। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আরও দ্রুত ছুটে চলল বেবিট্যাকসিটি। কিন্তু এগুতে পারলাম না বেশিদূর। চেয়ে দেখলাম, দূরে বাধভাঙা বন্যার জলের মতো ছুটে আসছে শ্রমিকদের মিছিল। সাগরের ঢেউয়ের মতো সামনে আছড়ে আছড়ে প'ড়ছে এসে সে মিছিল। হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল—কতো হাজার বলতে পারব না—ষাট, সত্তর আশি হাজারও হ'তে পারে। কণ্ঠে তাদের সাতশ রাক্ষসীর গর্জন। সে-গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে চলেছে আকাশে।

মুনলাইট সিনেমার সামনে দেখলাম শ'য়ে শ'য়ে পুলিশ। রাস্তা ব্যারিকেড...

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই শ্রমিকদের। তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছে ; কণ্ঠে স্লোগান : 'গণহত্যার বিচার চাই,' 'আয়ুবশাহী ধ্বংস হউক,' 'জরুরি আইন বাতিল কর,' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই,' 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই,' 'মতিয়া চৌধুরির মুক্তি চাই,' 'শ্রমিকনেতা আব্দুল মান্নাফের মুক্তি চাই,' 'আটদফা মানতে হবে,' 'চাল—ডাল—তেলের মূল্য কমাতে হবে'।

ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে মিছিলের ওপর। এলোপাথারি লাঠি চালাতে সুরু করে তারা শ্রমিক মিছিলের ওপর। ছুটোছুটি পড়ে যায়। প্রথম দলের ওপর লাঠি চার্জ করে তো দ্বিতীয় দল এসে পড়ে। মুখে স্লোগানের বিরাম নেই। বলে চলেছে : 'পুলিশী জুলুম চলবে না,' 'দুনিয়ার মজদুর এক হও,' 'স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে,' 'মণি সিংহের মুক্তি চাই', 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস ক'রো।'

আবার লাঠি চলে।

শ্রমিকরাও পাল্টা ঢিল ছুড়তে সুরু করে এবার। পুলিশে আর শ্রমিকে খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ওপর চলে সেই যুদ্ধ। মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ ক'রেই পুলিশ ক্ষান্ত হয় নি। হামলা ক'রেছে শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে, কুঠরিতে কুঠরিতে।

এই গণ্ডগোলে কোথায় পাব আতোয়ার আর মোজাম্মেলকে। সে চেষ্টাও করলাম না। ওখান থেকে সোজা অফিসে এলাম। দেখলাম, রিপোর্টাররা কেউ নেই ; বেরিয়ে পড়েছে সব। শুনলাম, মোজাম্মেল এসে গেছে। ডার্করুমে ঢুকেছে। রিপোর্টটা টাইপ ক'রে কে. জি. ভাইয়ের হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রেসক্লাবে ঢুকে দেখি একেবারে জমজমাট। রিপোর্টারদের অনেকেই দুপুরে বাড়ি ফিরছে না। খেয়ে নিচ্ছে ক্লাবেই। বয়কে খাবারের অর্ডার দিয়ে দোতলায় চলে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম কোণের এক টেবিলে শহীদভাই

আর রণেশদা কথা বলছে। সকালে কাগজ দেখার অবকাশ পাই নি। 'সংবাদ'টা হাতে নিয়ে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাইরে তাকালাম। সেক্রেটারিয়েট রোডটা খাঁ খাঁ ক'রছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি হ'য়েছে।

তিনটে বাজতে-না-বাজতেই ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে কাতারে কাতারে মানুষ এসে জমতে সুরু ক'রলো বায়তুল মোকারমের সামনে। স্টেডিয়ামের বারান্দায় মোতায়েন হ'য়েছে হাজার হাজার পুলিশ। ওয়ারলেসভ্যানে বসে লালবাগ হেডকোয়ারটারে খবর পাঠাচ্ছেন একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার।

চারটের দিকে রাজনৈতিক নেতারা আসতে সুরু ক'রলেন। বিমানবাহিনীর সাবেক চীফ এয়ারমার্শাল আসগর খান আসতেই জনতা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত ক'রে তুলল বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণ। বলা নেই, কওয়া নেই পুলিশ আক্রমণ সুরু ক'রল। লাঠি চার্জ আর সেই সঙ্গে সিয়াটোর রায়টকার থেকে হোসপাইপ দিয়ে লাল জল ছিটাতে সুরু ক'রল। সেই সঙ্গে চলল ধরপাকড়। ছুটোছুটি পড়ে গেল। আসগরখানও ভিজে গেলেন লাল জলে। গ্রেপ্তার ক'রল পুলিশ তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল। অফিসে চলে এলাম। রিপোরটারদের অনেকেই এসে গেছে। মতি আর সামাদ দ্রুত টাইপ ক'রে চলেছে। এবার প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি হ'য়েছে সামাদ। শহীদভাই প্রেসিডেন্ট।

নিউজডেস্কে ওয়াহিদুল হক সাহেবকে দেখলাম খুব ব্যস্ত। মুসাভাই তখনো এসে পৌঁছয় নি। টেলিগ্রাম আর টেলিপ্রিন্টারের ম্যাসেজে টেবিল স্তূপাকৃত।

রিপোর্টগুলো দেখছিলাম। চট্টগ্রামের ফৌজদার হাট, আগ্রাবাদ, পাহাড়তলিতে গুলি ছুড়েছে পুলিশ। ২৭ জনের মতো আহত হ'য়েছে তাতে। টেলিগ্রাম এসেছে ময়মনসিংহ, যশোর, দিনাজপুর,

ঝিনাইদহ, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া সব জায়গা থেকে। চৌমুহনীতেও গুলি চালিয়েছে পুলিশ। অনেক রাতে পূর্বপাকিস্তানের পুলিশ হেডকোয়ারটারে ফোন ক'রে জানতে পারলাম, সকাল থেকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হ'য়েছে ৭০৩ জন। তবু টেলিপ্রিণ্টার নীরব নেই। ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ তুলে একটার পর একটা খবর দিয়েই চলেছে।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

দশটা বেজে গেছে। মোজাম্মেলকে নিয়ে প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কার্জনহলের ভিতব দিয়ে কোণাকুণি পাড়ি দিলাম ইউনিভারসিটির দিকে। কুয়সা-ভেজা মখমলের মতো সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছি। পা ভিজে ভিজে যাচ্ছে। লাল নীল সাদা হলদে—নানা রঙের সীজন ফ্লাওয়ারে ভরে গেছে প্রাঙ্গণটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে অনেকগুলো পলাশগাছ। আগুন-রঙা লালপলাশে ছেয়ে গেছে গাছগুলি। ইউনিভারসিটির দিকে পা চালালাম। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ'য়ে শ'য়ে হেলমেটধারী পুলিশ। হাতে লাঠি আর রাইফেল। সূর্যের আলো পড়ে রাইফেলের ডগায় লাগানো বেঅনেটগুলি চক চক ক'রছে। কিন্তু ছাত্রদের ভ্রুক্ষেপ নেই। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে গিয়ে জমায়েত হ'চ্ছে কলাভবনের মাঠে। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ডাকে চলে এসেছে সবাই! মধুর ক্যান্টিনে ঢুকে আতোয়ারকে দেখলাম ; ছাত্রনেতা জামাল হায়দারের সঙ্গে একান্তে কথা বলছে। অন্য একটা টেবিল ঘিরে বসেছে তোফায়েল আহাম্মদ, আবদুর রউফ, খালেদ মাহমুদ, সাইফুদ্দিন আহাম্মদ মাণিক, সামছুজ্জোহা, এবং মাহবুবউল্লাহ্। কী এক জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত। আবদুর রউফ আর খালেদ মাহমুদ ছাড়া বাকি সবাই এম. এ. পাশ ক'রে সাংবাদিকতা পড়ছে। আবদুর রউফ ইংরাজিতে এম. এ. পাশ করে আবার ইতিহাস নিয়ে পড়ছে ; আর খালেদ মাহমুদ পড়ছে বাংলা নিয়ে এম. এ.। পূর্ববাঙলার সাড়ে

ছয় কোটি মানুষ আজ ওদেরই দিকে চেয়ে আছে। ওরাই যে আগামী দিনের পূর্ববাঙলার ভাগ্যনিয়ন্তা। ওলি আহাদ, তোয়াহাভাই, গাজিউল হকের উত্তরসূরী ওরা; উত্তরসূরী রাশেদ খান আর মতিয়া চৌধুরীর। রাশেদ আর মতিয়া দুজনেই এখন জেলে। আতোয়ারের টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে বসতে জামাল হায়দারকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'তোমাদের সভা কখন সুরু হ'চ্ছে?' জবাব দিলো, 'এই দু'চার মিনিটের মধ্যেই সুরু হবে। কালোভাই আসে নি?'

বললাম, 'এসেছে। সভার দিকে গেছে।'

তারপর দু'একটা কথা বলে উঠে পড়ল হায়দার। তোফায়েলরাও উঠল। এগিয়ে গেল সভার দিকে। আতোয়ারকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি রে, হালচাল কী?'

ছোট্ট ক'রে জবাব দিল, 'ফোরটি ফোর ব্রেক ক'রবে।'

বললাম, 'চল, রিপোর্টটা নিয়ে আসি।'

আতোয়ার বলল, 'তুই যা, আমাকে এখানেই অপেক্ষা ক'রতে হবে। দরকার আছে।'

'তাহলে বোস। আমি আসছি।' বলে সভার দিকে এগিয়ে গেলাম।

হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এসে জমেছে কলাভবনের প্রাঙ্গণে। সভা বসেছে বটতলায়। সভাপতি তোফায়েল। সভা সুরু হ'লো পূর্ববাঙলার অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীকে লেখা একটা কবিতা আবৃত্তি দিয়ে। রেবেকা বানু পড়ছেন তাঁর স্বরচিত কবিতা। সূর্যের তাতে ফর্সা মুখ ওঁর তেতে উঠেছে। আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে ওঁর কণ্ঠ:

> 'তোমারে যে আমি কখনো দেখি নি বোন,
> তবুও যখনি প্রভাতের মায়া
> পৃথিবী জড়ায়ে রাখে,
> অসীমের স্নেহ সীমার বাঁধনে আসে,
> সূর্যের আলো আঁচল বিছায় মানুষের ঘরে ঘরে,

ব্যাধেরা ক'রে দেওয়ালের লিখন পাঠ,
তখন তোমারে হৃদয়ের কাছে পাই,
ছোট বোন হেনার হাসিভরা ঠোঁটে
তোমার হাসিটি দেখি।
....
মানুষের হাঁকে কারার কপাট
ব্যাধের নির্মম শাসন,
পড়বেই ভেঙে
হাতের শৃঙ্খল
পায়ের লৌহবেড়ি।
তোমার বেদনা
ফুলের হাসিতে হবে স্বর্ণের কুঁড়ি।
তখন হেমন্ত মাঠের শীর্ণ গাছে গাছে,
খেলে যাবে বসন্তের উজ্জ্বল যৌবন,
ডানা মেলে গান গাবে সোনালী রোদ্দুর,
অনেক মরণে মরা বাঙলার পাখি হবে কাকলি মুখর।'

হাজারো হাতের তালিতে অভিনন্দিত হ'লেন কবি। এবার উঠে দাঁড়ালো পূর্বপাকিস্তানের মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুদ্দিন আহাম্মদ মাণিক। গায়ের ফুলহাতা সোয়েটারটা তখনো খোলার অবসর পায় নি। বোধ হয় খেয়ালই নেই খোলার। সাইফুদ্দিন একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ছাত্রছাত্রীদের ওপর। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রছে সবাই। তারপর হঠাৎই সুরু ক'রলো, 'একদিন রমনার কালো পিচের সড়কে তাজা রক্ত ঝরিয়ে ছিল মুসলীমলীগ সরকার, আবার ঝরাল আয়ুব। ঝরিয়েছে পিণ্ডিতে, পেশোয়ারে, করাচিতে। আয়ুবের বুলেট বুক চিরে দিয়েছে সতেরো বছরের ছাত্র আবদুল হামিদের। রক্ত ঝরেছে আরো—আরও। কতো মায়ের বুক খালি ক'রে দিয়েছে জালিম আয়ুব! ধরে নিয়ে গেছে

কতোজনাকে। পিণ্ডি-করাচি-নওশেরার পথে পথে ছাত্রদের বুকের তাজা টকটকে রক্তে হোলি খেলছে আয়ুবের সৈন্যরা। খুনেদের ধিক্কার জানাতে খাইবার থেকে করাচির পথে পথে বেরিয়ে পড়েছে মায়েরা, বোনেরা। আমরা কি এখনো বসে থাকব? বসে থাকব বরকত-সালাম-শফিক-জাব্বারের উত্তরসূরীরা? পথে পথে বেরিয়ে পড়ার ডাক এসেছে। পাকিস্তানেব সাড়ে এগারো কোটি মানুষ চেয়ে আছে ঢাকার ছাত্রদের দিকে। আমরা কি তারপরেও নীরব থাকব? অত্যাচারীর তাসের প্রাসাদ মশালের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবো না!' একটু থামল সাইফুদ্দিন। তাকালো গেটের দিকে। ই. পি. আর. বাহিনীর বেঅনেটগুলি চকচক ক'রছে সূর্যের কিরণে। থম থম ক'রছে ছাত্রছাত্রীদের মুখ। তাদের চোখ জ্বলছে দুরন্ত আক্রোশে। সাইফুদ্দিন ইউনিভারসিটির বাইরে দাঁড়ানো পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলল, 'তোমরা শোনো, তোমাদের বেঅনেট আর বুলেটকে ঢাকার ছাত্ররা ভয় পায় না। আমাদের এক-এক জনের বুকের রক্ত থেকে জন্ম নেবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বরকত-সালাম-আবদুল হামিদ। কতো মারবে তোমরা? দিন তোমাদের ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব আমরা। দেখি, কে জেতে—আয়ুব, না পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ।' তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা আওয়াজ তুলুন, ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ, এগারো দফা মানতে হবে, জালিম আয়ুব নিপাত যাও।'

হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কণ্ঠচিরে মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হ'লো সাইফুদ্দিনের কথাগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘরে ঘরে আঘাত হানতে লাগল সেই আওয়াজ। বাইরে দাঁড়ানো পুলিশেরা সচকিত হ'য়ে উঠল। ওয়ারলেসে সে খবর গিয়ে পৌঁছল লালবাগে।

তোফায়েল উঠে দাঁড়ালো এবার। বলিষ্ঠ দেহ। একমাথা

কোঁকড়ানো চুল। বিশাল বুক। পরনে সাদা ফুলসার্ট আর কালো প্যাণ্ট। তোফায়েলের কণ্ঠে সর্বনাশা আহ্বান। সে আহ্বানে ছাত্রছাত্রীরা বুলেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ভয় পায় না। তোফায়েল বলছে: 'আপনারা শুনেছেন কি পিণ্ডিতে সৈন্যরা সদর রাস্তা দিয়ে দিনের আলোয় শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রকে ন্যাংটো ক'রে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে! আজ পিণ্ডিতে হ'য়েছে, কাল ঢাকায় হবে। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে আমাদের।

'আয়ুব-মোনেম আটকে রেখেছে মতিয়া চৌধুরীকে, আটকে রেখেছে রাশেদ আর পঙ্কজকে। কেননা ওরা দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীতার মামলা দাঁড় করিয়েছেন বাঙলার বন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে। ওঁরা যদি দেশদ্রোহী তবে দেশপ্রেমিক কে? ময়মনসিংহের বটতলার উকিল মোনেম আর বৃটিশের পদলেহী আয়ুব? দেশটা যে আয়ুব-মোনেমের নয়, সাড়ে এগারো কোটি মানুষের—আজ তা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। সময় হ'য়েছে রক্ত দেওয়ার"। বেঅনেট আর বুলেটে আয়ুব-মোনেম কণ্ঠরোধ ক'রবে আমাদের! চুয়াল্লিশ ধারা দিয়ে রুখবে আমাদের এগিয়ে চলা? ভুল ক'রেছে। বাঙলার অগ্নিশিশু ছাত্রদের ওরা চিনতে পারে নি। 'ডাক' আজ 'দাবিদিবস' পালনের ডাক দিয়েছে। এই দাবি-দিবস পালনের মধ্য দিয়েই পূর্ববাঙলার সংগ্রামী ছাত্রদের যাত্রা হোক সুরু। একটু থেমে দৃষ্টি বুলালো হাজারো ছাত্রছাত্রীদের দিকে। তারপর বলল, 'যাঁরা মরতে ভয় পান, হাত তুলন। পৌঁছে দেব বাড়ি।' কণ্ঠে তার তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে।

কেউ হাত তোলে না। মুহূর্তে প্রচণ্ড গর্জনে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে তোফায়েল বলে, 'তাহ'লে চলুন পুলিশের কর্ডন ভেঙে দুর্বার বেগে বেড়িয়ে পড়ি। আওয়াজ তুলুন, মরতে আমরা পাই না ভয়, কে আমাদের রুখবে জয়। মানি না—মানি না চুয়াল্লিশ ধারা মানি না।'

প্রচণ্ড আওয়াজে স্লোগান দিতে দিতে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ছুটে চলল গেটের দিকে। বেলা তখন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। মাথার ওপর সূর্য গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে। মুহূর্মুহু টিয়ারগ্যাস শেল ফাটল। ধোঁয়ায় ভরে গেল বিশ্ববিত্যালয়ের গেটের সামনেটা। ভয়ার্তস্বরে পাখিরা গাছের শান্তনীড় ছেড়ে আকাশে ডানা মেলল। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো ছাত্ররা। পুলিশকে লক্ষ্য ক'রে ছুড়ল রাশি রাশি ঢিল। তারই মধ্যে চোখে রুমাল আর ওড়না চেপে দলে দলে ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে পড়ল। লাঠি চলল। তবু ভেঙে পড়ল পুলিশের কর্ডন। এগিয়ে চলল ছাত্ররা নীলক্ষেতের দিকে। একজনকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ ট্রাকে তুলছে তো দশজন কর্ডন ভেদ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। বেঅনেট, লাঠি আর টিয়ারগ্যাস রুখতে পারছে না ছাত্রদের গতি। রাশি রাশি ধোয়ার সামনে পুলিশরাও বিপর্যস্ত।

সিয়াটো থেকে সদ্য পাওয়া পুলিশের 'রায়ট কার' থেকে হোস পাইপ দিয়ে ছাত্রদের ওপর ছিটিয়ে দিচ্ছে লাল জল। উদ্দেশ্য, এখন চিহ্নিত করে রাখা এবং পরে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু ছাত্ররা দমল না। এগিয়ে চলল তারা মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়ে শহীদমিনারের সামনে দিয়ে নীলক্ষেতের দিকে। মেডিকেল কলেজেরও অনেক ছাত্রছাত্রী এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। দেওয়াল টপকে মেডিকেল কলেজের ভিতর দিয়ে শেলি এগিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় মোজাম্মেলের চোখ লাল। জল পড়ছে। তাকাতে পারছে না। মধুর ক্যান্টিনে এসে জল ছিটালাম ওঁর চোখে। আতোয়ার কোথায় গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'পুলিশ ইউনিভারসিটির ভিতর ঢুকে পড়েছে।'

আতোয়ার আমি আর মোজাম্মেল আর্টস বিল্ডিং-এর দোতলায় চলে এলাম। ছাত্রদের ওপর এলোপাথাড়ি লাঠি চালাচ্ছে পুলিশ। ছাত্রীরাও ঢুকে পড়েছে কলাভবনে। লড়াই চলছে ছাত্র আর পুলিশে।

ছটো পর্যন্ত চলল এমনি সংঘর্ষ। তারপর পুলিশ হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেল।

অফিসে এসে শুনলাম দেড়টার সময় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-পরিষদের নেতা ও কর্মীরা বায়তুল মোকারম থেকে তিন জন তিন জন ক'রে মিছিল ক'রেছিল। তাতে চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করা হয় না। তবু পুলিশ লাঠি চার্জ ক'রেছে। সিয়াটোর সেই লাল গাড়িটা থেকে লাল জল ছিটিয়েছে। কিন্তু মিছিলের গতিরোধ ক'রতে পারে নি পুলিশ। এগিয়ে গেছে হাজার মানুষের মিছিল নবাবপুর রোড ধরে বার লাইব্রেরির দিকে। মিছিল থেকে পুলিশ ডাক-এর কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। ইউনিভারসিটি থেকে গ্রেপ্তার ক'রেছে ২৫ জন ছাত্রকে। নীলক্ষেত আর পাবলিক লাইবেরিতেও পুলিশ ছাত্রদের লাঠি চার্জ ক'রেছে। বার লাইবেরি হলের সভায় 'ডাক' সিদ্ধান্ত নিল : ৫ ফেবরুয়ারি সারা দেশে হরতালের ডাক দেবে।

রাত্রে অফিসে একমনে বসে রিপোর্ট টাইপ করছি। বেশ শীত পড়েছে। বাড়ি ফেরার তাড়া থাকলেও দ্রুত টাইপ ক'রতে পারছি না। শীতে আঙুল আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, সাইফুদ্দিন আর জামাল হায়দার। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

সাইফুদ্দিন বলল, 'আমাদের একটা বিবৃতি আছে।'

'দাও।' বলে বিবৃতিটা নিয়ে দেখলাম ছাত্রনির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে কাল ধর্মঘট ডেকেছে। এগারোটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা।

বিবৃতিটা টাইপ করে কি. জি. ভাইয়ের হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল চোখেমুখে। বায়তুল মোকারম পিছনে ফেলে জিন্নাহ এভিনিউ ধরে হনহন্ ক'রে হেঁটে চললাম।

পরদিন ইউনিভারসিটিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম দেখি জামাল

হায়দার[illegible] আগুন ছড়াচ্ছে বটতলায় দাঁড়িয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কায়েদ-ই-আজম কলেজ, সেন্ট্রাল কলেজ, ঢাকা কলেজ, ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুল—ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ভেঙে পড়েছে কলাভবনের প্রাঙ্গণে। ওদের চোখে আগুন, বুকে আগুন। সেই আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিতে চায় আয়ুবশাহী। বাইরে আগের দিনের মতোই পুলিশের কর্ডন। তবে আজ সংখ্যায় অনেক বেশি। মনে হচ্ছে ঢাকার গোটা রাইফেল বাহিনী আর টিয়ারগ্যাস স্কোয়াড এনে মোতায়েন ক'রেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটায়। জামাল হায়দারের পুলিশী নির্যাতনের ধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে হাজারো কণ্ঠের 'শেম-শেম' ধ্বনিতে চমকিত হ'চ্ছে পুলিশবাহিনী। জামাল বলে চলেছে: সূর্য-সেনের উত্তরসূরী পূর্ববাঙলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ভয় পায় না আয়ুব-মোনেমের রক্তচক্ষুকে। ভয় পায় না পুলিশের গুলি, টিয়ার-গ্যাস, বেঅনেট আর লাঠিচার্জকে। পুলিশ ই. পি. আর. আর বাহিনীকে আমরা সাবধান ক'রে দিতে চাই, সাবধান ক'রে দিতে চাই মোনেমের পদলেহী ডি. সি. কে, কালকের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশবাহিনী ঢুকলে আমরা তার বদলা নেব। রমনার বুকে রক্তের হোলি হবে। আয়ুব-মোনেম তোমরা জেনে রাখ, আমরা ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দিনেশ, মাস্টারদা আর নির্মল সেনের উত্তরসূরী। আমাদেরই পাশে রয়েছে প্রীতিলতা কল্পনা দত্ত বীণা দাসের মতো হাজার হাজার তেজস্বিনী বোন। কয়জন মতিয়া চৌধুরীকে তোমরা আটকে রাখবে? অগ্নি-কন্যা প্রসবনী পূর্ববাঙলার ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে হাজার হাজার মতিয়া চৌধুরী। মশাল হাতে দাঁড়িয়েছে ওরা আমাদের পাশে। পূর্ববাঙলার এই সব দামাল ছেলেমেয়েদের মশালের আগুনে আয়ুবশাহী ছাই হ'য়ে যাবে। আয়ুবের দালালরা জেনে রাখ, সেই দিনের আর দেরি নেই।

লীগ্‌লীগই 'আমাদের
শ্রম, আমাদের ত্যাগ,
আমাদের নিষ্ঠা, আমাদের
কষ্ট, আমাদের প্রত্যয়,
আমাদের সংগ্রাম, আমাদের রক্ত
ইত্যাদির সিমেণ্ট দিয়ে
ইট পাথর সাজিয়ে
আমরা গড়বো স্মৃতিসৌধ
কমরেড সূর্য সেন, অমর সেনদের নামে
আমাদের দেশে, এই ধানসিঁড়ি জলসিঁড়ির দেশে।'

জামাল নেমে আসে বক্তৃতার বেদী থেকে। উত্তেজনায় রাগে ঘৃণায় ওর দুচোখ জ্বলছে, দপ্‌দপ্‌ করছে মুখ। কথা নয় তো যেন, এক-একটা আগুনের হল্‌কা। সে হল্‌কা শ্রোতাদের শিরায় শিরায় অসহ্য উত্তেজনা আর জ্বালার তরলস্রোত ছড়িয়ে দিয়েছে।

তোফায়েল উঠে দাঁড়ালো। তারও দু'চোখ থেকে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। সে বলল, 'জাগো পূর্ববাঙলার সংগ্রামী ছাত্রজনতা। বরকত-সালাম-শফিকের নামে শপথ নাও, বেরিয়ে পড় রাস্তায়—এগিয়ে চলো বেঅনেট আর বুলেটের সামনে। জানি রমনার কালো পথ আবার লাল হবে, ঝরবে লাল শিমূল-পলাশ—কিন্তু আমাদের সংগ্রাম থামবে না।'

তোফায়েলের কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি '৫২ সালের গাজিউল, তোয়াহাভাই, ওলি আহাদের তোজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

তোফায়েল বলে চলেছে, 'উন্নয়নের নামে পূর্ববাঙলার মানুষের সঙ্গে ধোঁকাবাজি আর চলবে না। জঙ্গী আয়ুব শুনে রাখ, আমাদেরকে আর শোষণ ক'রতে দেব না—রুখবই রুখব তোমাদের হিংস্র কদর্য লোলুপ হাত। আমরা স্বাধিকার চাই। ১১-দফা অদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই। আয়ুবের বুলেট

বেঅনেট টিয়ারগ্যাসকে পূর্ববাঙলার নির্ভীক ছাত্রসমাজ ভয় পায় না। মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। আসুন পুলিশের কর্ডন ভেঙে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। আওয়াজ তুলুন, মানি না মানি না ১৪৪ ধারা মানি না।'

উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে চলল গেটের দিকে। মুখে স্লোগান : 'মানি না মানি না চুয়াল্লিশ ধারা মানি না', 'খতম কর, খতম কর, আয়ুবশাহী খতম কর', 'সংগ্রাম চলছে চলবে', '১১-দফা মানতে হবে', 'স্বাধিকার দিতে হবে'……।

হাজারো কণ্ঠের চীৎকারে রমনার দুপুরের নির্জনতা ভেঙে খান খান হ'লো। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়ল অদূরে। এগিয়ে এলো একদল লাঠিধারী পুলিশ। পিছনেই পুলিশের টিয়ারগ্যাস স্কোয়াড। আকাশ থেকে সূর্য গনগনে আঁচ ছড়াচ্ছে। এগিয়ে চলেছে ছাত্রছাত্রীর দল।

অদূরে ভ্যানের সামনে দাঁড়ানো পুলিশের আই জি. নিজে বলে চলেছেন মাইকে : 'আপনারা বেরুবেন না। ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রবেন না।'

কিন্তু মুহূর্মুহূ স্লোগানের প্রচণ্ড আওয়াজে ডুবে গেল সে কথা।

'এক—দুই—তিন—চার্জ।'

পলকে লাঠি চলল ছাত্রছাত্রীদের ওপর। এলোপাথাড়ি লাঠি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে একজনের পর একজন। তবু পিটোচ্ছে পুলিশ উন্মাদের মতো। ছাত্ররাও সুরু ক'রল ঢিল ছোড়া। রাশি রাশি ঢিল।

সাগরের ঢেউয়ের মতো মুহূর্তে ছাত্রদের পরের দলটি এগিয়ে যায়। কয় জনের ওপর লাঠি চালাবে? পুলিশ কর্ডন ভেঙে বেরিয়ে গেল একদল ছাত্র। রাশি রাশি ঢিলের মুখে পুলিশরাও শেষে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

ফাটল টিয়ারগ্যাস শেল। একটা—দুটো—তিনটে····কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়ায় গেটের কাছটা ঢেকে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে

না, শোনা যাচ্ছে শুধু স্লোগান আর চীৎকার। কাঁদানে গ্যাসে জ্বলছে চোখ। মধুর দোকানে গ্লাসের জলে ভিজিয়ে নিলাম রুমালটা। ছুটছে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিতরের পুকুরের দিকে। জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে রুমাল, সার্ট, ওড়না।

হঠাৎ দেখলাম, আতোয়ার আর শাহাবউদ্দীন একজন ছেলেকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসছে। দেখতে পাইনি এতক্ষণ ওদের। কাছে আসতেই দেখলাম, ওরা যাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসেছে সে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ। লাঠি লেগেছে মাথায়। অনেকটা জায়গা ফেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। মাটিতে শোয়ানো হ'লো ওকে। একটি মেয়ে ছুটে গেল পুকুরে। ওড়না জলে ভিজিয়ে নিয়ে এসে সযত্নে মুছিয়ে দিল মাথার রক্ত। তারপর ওড়না ছিড়ে পট্টি বেঁধে দিল মাথায়। রউফ আহত হ'য়েছে শুনে ছুটে এলো তোফায়েল। টিয়ারগ্যাসে সবারই চোখ লাল। আতোয়ার আর শাহাবউদ্দীনের অবস্থা আরও খারাপ। আমি বললাম, 'এই তোরা যা, চোখে জল দিয়ে আয় শীগ্‌গীরই।' আতোয়ার রুমাল আনে নি। আমারটা দিলাম। রউফকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছাত্রনেতারা। একটু বাদে কয়েকটি ছেলে ছাত্র ইউনিয়নের মুকুল আর পূর্বপাকিস্তান ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো। লাঠির ঘায়ে মুকুলেরও মাথা ফেটেছে। খালেদ অতিরিক্ত টিয়ারগ্যাসে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। আতিকভাই এসে ওদের তাড়াতাড়ি ক'রে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান আতিকুজ্জামান খানকে আমরা আতিকভাই বলি। তোফায়েল রউফ এইসব ছাত্রনেতারা তাঁরই হাতে গড়া ছেলে।

পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও। ছাত্ররা পিছু হটছে ক্রমশ। আতিকভাই বললেন, 'তোমরা এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো পুলিশ কর্ডন ভেঙে। আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। চলো—এগিয়ে চলো।'

আতিক তায়ের পাশে এগিয়ে চলল দীপা—দীপা দত্ত। পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদিকা। উত্তেজনায় আর রাগে ফুঁসছে সে। কাছে এসে বলল, 'চলুন স্যার। কর্ডন আমরা ভাঙবই। এগিয়ে আসে সামসুদ্দোহা আর আবদুল মান্নান।

ছাত্ররা আবার নতুন উদ্দীপনা পেল। দীপা আর আতিক-তায়ের নেতৃত্বে একটা দল এগিয়ে গেল। মুখে তাদের স্লোগান: আয়ুবশাহী ধ্বংস হউক, ১১-দফা মানতে হবে।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান, এস. এম. হলের সহ-সভাপতি সৈয়দ নুরুন্নবী, ইডেন গার্লস কলেজের সাধারণ সম্পাদিকা হোসনে আরা দিলু, তোফায়েল, জামাল হায়দার সাইফুদ্দীন মাণিক ওরা মধুর ক্যান্টিনে জরুরি মীটিং-এ বসেছে। অতঃপর কর্তব্য কী? শোনা যাচ্ছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে ই. পি. আর বাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে। ঠিক হ'লো, তার আগেই কর্ডন ভাঙতে হবে।

এগিয়ে গেল ওরা। মুহুর্মুহু স্লোগানে কাঁপিয়ে তুলল বিশ্ব-বিদ্যালয় এলাকা। ছাত্ররা ঢিল ছুড়ল রাশি রাশি। সেই প্রচণ্ড খোয়ার তোড়ে পুলিশরা পিছু হটতে সুরু ক'রল। দীপাদের দলটি ততক্ষণে পুলিশের কর্ডন ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় ভালো দেখা যাচ্ছে না ওদের। একটু আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের সামনে ই. পি. আর. টির একটা দোতলাবাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ছাত্ররা। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে বাসটা! কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া ওপরে উঠে কালো করে দিচ্ছে লাল শিমূলগুলো। আগুনের আঁচে পলাশফুলগুলি দেখাচ্ছে আরও উজ্জ্বল—তাজা রক্তের মতো।

একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে ডি. সি.র কাছে পাঠানো হ'লো। ছাত্রদের তরফ থেকে বলা হ'লো যে, ছাত্রদের ক্ষোভ পুলিশের বিরুদ্ধে নয়। ডি. সি. তাদের নির্বিঘ্নে শোভাযাত্রা ক'রতে দিলে কোনো গোলমালই হবে না। ডি. সি. বললেন, 'একশ চুয়াল্লিশ

ধারা রয়েছে। আমি আপনাদের শোভাযাত্রা বের করতে দিতে পারি না। আই য়্যাম হেল্‌পলেস।' ছাত্রপ্রতিনিধি ফিরে এলো।

ছাত্ররা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, শোভাযাত্রা বেরুবেই।

নাজিম কামরান আর আতোয়ারের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিল বেরুলো। চলল কাঁদানে গ্যাসের শেল বিস্ফোরণ আর ধরপাকড়। কিন্তু কয়জনকে আর ধরবে? স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেল ছাত্র মিছিলটি শহীদমিনারের দিকে। মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলের ওপর লাঠি চালাল পুলিশ। ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ছাত্রছাত্রীরা ঢুকে পড়ল মেডিকেল কলেজে।

রেলিং টপকে মেডিকেল কলেজে চলে এলাম। ইমারজেন্সিতে নার্সরা ছাত্রছাত্রীদের চোখে ড্রপার দিয়ে প্যারাফিন ঢালছে। ঠিক সেই বায়ান্ন সালের ভাষা-আন্দোলনের দৃশ্য। শ'য়ে শ'য়ে আহত ছাত্রছাত্রীকে ফার্স্টএইড দেওয়া হ'চ্ছে। অনেকের অবস্থা গুরুতর। বেডে শুয়ে রয়েছে। রউফ, মকুল আর খালেদ মোহাম্মদের অবস্থা গুরুতর না হ'লেও ডাক্তাররা ছাড়েন নি। বেডে শুইয়ে রেখেছেন। ছাড়লেই আবার সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে পুলিশের লাঠি আর টিয়ারগ্যাসের সামনে গিয়ে পড়বে। আঘাতের ওপর আঘাত লাগলে অবস্থা গুরুতর হবে। ওদিকে ইউনিভারসিটির ভিতরে ই. পি. আর. বাহিনী ঢুকে পড়েছে। খবর পেলাম হলগুলোতেও ঢুকে পড়েছে পূর্বপাকিস্তান রাইফেল বাহিনী।

সারাটা রমনা যেন যুদ্ধফ্রণ্টে পরিণত হ'য়েছে। ছাত্র আর ই. পি. আর বাহিনীর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলল এখানে ওখানে—বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

অফিসে এসে শুনলাম, জিন্নাহ্‌হল, জগন্নাথহল, মোহসিন-হল, ইকবালহল, রোকেয়াহলে ই. পি. আর বাহিনী রুমে রুমে ঢুকে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে ছাত্রদের ওপর। বইপত্তর, বিছানা সব তছনচ ক'রে ফেলেছে। রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে শুইয়ে দিয়েছে অনেককে মাটিতে। চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে হিঁচড়ে

নিয়ে তুলেছে প্রিজনভ্যানে। রোকেয়াহলে মেয়েদের লাঞ্ছনা করেছে ই. পি. আর বাহিনী। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে।

অনেক রাতে লালবাগ থেকে জানতে পারলাম, দু'শো রাউণ্ড টিয়ারগ্যাস শেল ফাটিয়েছে পুলিশ ওই দিন। আর ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রেছে। রাতে নাজিম কামরান এসে ছাত্রদের বিবৃতি দিয়ে গেল। তাতে ঢাকার সব ছাত্রনেতার স্বাক্ষর রয়েছে। আগামী কাল অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের আর ২৬ জানুয়ারি সারাদেশের মানুষকে হরতাল পালনের ডাক দিয়েছে ছাত্ররা। নিন্দা ক'রেছে পুলিশী নির্যাতনের।

দেশের মানুষ সাড়া দিল ছাত্রদের ডাকে। অচল হ'লো সবকিছু। পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় সেনাবাহিনী তলব করা হ'লো। ২৫ তারিখে কার্ফু জারি হ'লো। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে গুলি চলল। কাওরানবাজারে চার মাসের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন জনৈকা মা। ঘরের বেড়া ফুটো করে গুলি লাগল তার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজের ছাত্ররা জমায়েত হ'য়েছিল কলেজ-প্রাঙ্গণে গায়েরী জানাজায়। চলল টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, ধরপাকড়। গ্রেপ্তার হ'লেন চারজন অধ্যাপক আর পাঁচজন ছাত্র। গুলি চলল আদমজী নগরে। দু'জন মারা গেল ঘটনাস্থলেই। গুলি চলল তেজগাঁ ফার্মগেটের কাছে। পলিটেকনিকের ছাত্র লতিফ প্রাণ দিলে সেই গুলিতে। চারদিক থেকে আসতে লাগল, বিক্ষোভ, গুলিচালনা আর হত্যার খবর। খবরের পর খবর। প্রেসকারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছি এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। মোড়ে মোড়ে ব্রেনগান আর রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে সৈন্যরা। থম্‌থম্ ক'রছে সারাটা শহর।

২৭ জানুয়ারি।

একটানা কার্ফু চলেছে দুদিন ধরে। নারায়ণগঞ্জের ঘরে ঘরে বিক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য টগবগ ক'রছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারিভ্যান টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। থমথমে ভাবটা আরও ভয়াল হ'য়ে উঠল সেদিন। গুলি চলল আদমজীর শিল্পাঞ্চলে। চোদ্দ জন বুলেট বিদ্ধ হ'লো। তার মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা গেল দু'জন শ্রমিক। খবর এলো ময়মনসিং থেকে। শোক মিছিলের ওপর কাঁদানেগ্যাস প্রয়োগ ক'রেছে। গ্রেপ্তার ক'রেছে ৮৪ জনকে। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ময়মনসিং নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র মনসুর প্রাণ দিয়েছে। তাঁরই লাশ দাফন ক'রতে যাচ্ছিল হাজার হাজার ছাত্র আর সাধারণ মানুষ।

তুরখাম থেকে টেকনাফ—সারা পাকিস্তানে জ্বলে উঠেছে বিক্ষোভের আগুন। জেগে উঠেছে পূর্ব-পশ্চিম দুই অঞ্চলের সংগ্রামী জনতা। করাচি লাহোর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পেশোয়ার গুজরানওয়ালা—একের পর এক বড়ো বড়ো শহরগুলোতে সেনাবাহিনী তলব ক'রতে হ'য়েছে। জারি ক'রতে হ'য়েছে কার্ফু। চলেছে গুলি। শহীদের রক্ত থেকে রোজ জন্ম নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা; প্রাণ দিতে এগিয়ে আসছে; ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। দিন দিন বেড়ে চলল নিহত আর আহতের তালিকা। একের পর এক গ্রেপ্তার হ'তে থাকলেন নেতারা। গ্রেপ্তার হ'লেন পূর্বপাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহম্মদ, সাধারণ-সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সহ-সভাপতি দেওয়ান মাহবুব আলী আরো অনেকে। রোজ শ'য়ে শ'য়ে নেতা গ্রেপ্তার হ'চ্ছেন বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিং কুষ্টিয়া, পাবনা, সিলেট সর্বত্র।

সাড়ে এগারো কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ আওয়াজে আয়ুবের কায়েমী তখত্ টলে উঠেছে। দিন দিন মিইয়ে আসছে আয়ুব-মোনেমের কণ্ঠস্বর।

২৮ জানুয়ারি।

সিগন্যাল মেস।

দর্শকদের গ্যালারি আজ লোকারণ্য। আদালত গৃহের বাইরেও অপেক্ষা ক'রছে হাজার হাজার মানুষ। শেখ মুজিবর রহমান, লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহাম্মদ প্রমুখরা তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযোগের উত্তর দেবেন আজ।

তখন দশটা বেজে পনেরো মিনিট। শেখ মুজিবর এসে দাঁড়ালেন আসামীর ডকে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। বলিষ্ঠ চেহারায় দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট। আদালতকক্ষে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলতে সুরু ক'রলেন, 'আগেও বলেছি, এখনো বলছি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। পূর্বপাকিস্তানকে শোষণ করার বিরুদ্ধে আমৃত্যু আমার আন্দোলন চলবে। কোনো বুলেট বেঅনেটের সাধ্য নেই সেই আন্দোলন রোখে। ৬-দফা আদায়ের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাবই। প্রতিরক্ষার দিক থেকে পূর্বপাকিস্তানকে আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছি। দেশের কল্যাণের জন্যই আমি তা ক'রেছি; পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য করি নি। বিশ্বভ্রাতৃত্বে আমি বিশ্বাসী। তাই তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন ক'রেছি। আমাকে, আমার পার্টিকে পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে হেয় ক'রবার জন্যই কায়েমী শাসক আর শোষকেরা এই মামলা সাজিয়েছে। এক মুজিবর যাবে, লক্ষ মুজিবর জন্ম নেবে পূর্ববাঙলায়; স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এগিয়ে যাবে রাইফেলের মুখে।' শেখ মুজিবরের গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে শিরায় শিরায় আগুন

ধরাল। বার বার গ্রেপ্তার হ'য়েছেন তিনি। জনতার চাপে বার বার মুক্তি পেয়েছেন। মুজিবসাহেব এবার সরাসরি ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পূর্ববাঙলা শোষিত হ'চ্ছে, চাকরি-বাকরি, উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রেই পূর্বপাকিস্তানীদের প্রতি যে বৈষম্য চলেছে তা বলা কি দেশদ্রোহীতা? ডিকটরের কাছে হ'তে পারে—কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নয়। গণ-আদালতে আমি নির্দোষ। আমার আর-কিছু বলার নেই।' বলে নেমে এলেন তিনি আসামীর ডক থেকে।

এবার উঠলেন ২নং আসামী লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'গ্রেপ্তারের পর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি মুজিবর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এস. এম. মোর্শেদ, সি. এস. পি অফিসার এ. এফ. রহমান, শামসুর রহমান এবং আরও অনেক নাম বলে গেলো, তাঁদের চিনি। বলি, তাঁরা সকলে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বিবৃতিতে যেন আরও উল্লেখ করি কমাণ্ডো স্টাইলে বিপ্লব করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান সৈনিকদের সংঘবদ্ধ ক'রতে বলেন আমাকে; বলি, ভারত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে মিস্টার ওঝার মারফত।

আমি এই ধরণের মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল আমির ঘুঁসি মেরে আমার একটি দাঁত ভেঙে দেন।' এই বলে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন আদালতে একটি ভাঙা দাঁত দাখিল ক'রলেন এবং বলতে লাগলেন, 'তারা আমায় আরও বললেন, আমি যদি তাঁদের কথানুযায়ী বিবৃতি দিই তাহ'লে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হবে এবং পেনসন দেওয়া হবে। অন্যথায় শেখ মুজিবরের সঙ্গে আমাকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবে। কর্নেল আমির বললেন, তুমি সহযোগিতা না ক'রলেও অনেকেই ক'রবে। বেসামরিক আদালতে যদি শেখ মুজিব রেহাই পায়-ও, সামরিক

আদালতে তার মুক্তিলাভের কোনো চান্স নেই। মুজিবকে আমরা শেষ ক'রবই। আয়ুব খানের বড়ো শত্রু সে।

প্রলোভন এবং ভীতি সত্ত্বেও শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হ'লাম না। শেখ মুজিব কখনো দেশদ্রোহী হ'তে পারেন না, তিনি দেশপ্রেমিক। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের নেতা তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ্ আমায় ক্ষমা ক'রবেন না। বিবৃতি দিতে রাজী হই নি বলেই আক্রোশ বশতঃ আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন সরকার। আমি নির্দোষ।' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ পৃষ্ঠার একটি লিখিত বিবৃতিও আদালতে দাখিল ক'রলেন তিনি।

লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের পর আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর ওপর যে-নৃশংস নির্যাতন হ'য়েছে মর্মস্পর্শী ভাষায় তার বিবরণ দিতে থাকেন। তিনি বলেন, '১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেমবর ঢাকা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে প্রথমে রাজারবাগ, পরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়।

১১ ডিসেম্বর আবার আমাকে রাজারবাগ নিয়ে গেল। আমি একটা কক্ষে বসে আছি, একটু বাদে কয়েক সীট টাইপ করা কাগজ হাতে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট শরীফ। তিনি কাছে এসে টাইপ-করা সীটগুলো পড়ে গেলেন। তাতে বহু আর্মি অফিসার সি. এস. পি অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল, তাঁরা কীভাবে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' গঠন ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন। লেফটেন্যান্ট শরীফ আমাকে ওই তৈরি স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দিতে বললেন। বলতে বললেন, অমি তাঁদের চিনি এবং ওই দলে ছিলাম।

এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার ক'রলাম আমি। তখন একটা নির্জনকক্ষে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর সুরু হ'লো

নির্যাতন। নখের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিল। রুল দিয়ে পিটোতে লাগল একটা লোক। জামাকাপড় রক্তে সপসপে হ'য়ে উঠল। নাক মুখ মাথা দিয়ে রক্ত গড়াল আমার। জ্ঞান হারালাম। বিকেল চারটের দিকে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মেজর নাসের ঘরে ঢুকছেন। তিনিও আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওই মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বললেন। আমি 'পারব না' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চড় কষালেন তিনি আমার গালে। মারপিটে আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকটা দিন মারপিট বন্ধ রাখল।

১৮ ডিসেম্বর আবার সুরু হ'লো অত্যাচার। ন্যাংটো ক'রে আমাকে বরফের মধ্যে শুইয়ে রাখল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দশ মিনিটে শরীর জমে গেল। তখন কম্বলে জড়িয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

পনেরো-ষোলো বারেরও বেশি মেজর নাসের, কর্নেল শরীফ আমাকে মিথ্যা বিবৃতি দিতে চাপ দেন। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বারবার আমার ওপর ওমনি নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। বিবৃতি দিতে অস্বীকার করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হ'য়েছে।'

এমন সময় বাইরে স্লোগান ওঠে : 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'মিথ্যা মামলা তুলে নাও', 'আয়ুবশাহী ধ্বংস হউক'। গ্যালারির ভিতর থেকেও একদল ছাত্র 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে এসে দেখি মিলিটারির প্রহরায় শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাণ্টনমেণ্ট জেলে। জনতা স্লোগান দিচ্ছে তখনো। মিলিটারিরা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চার্জ সুরু করে। জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়। শেখ মুজিবকে নিয়ে মিলিটারিরা চলে গেল।

সেদিনকার মতো অধিবেশন মুলতবী রইল।

আরব সাগর-রাভী-ঝিলামের তীরে গত নভেম্বরে যে-বিক্ষোভ জেগেছে ক্রমে ক্রমে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে কর্ণফুলি-বুড়িগঙ্গা-লক্ষ্যার তটে। জেগে উঠেছে তুরখাম থেকে টেকনাফ্—পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষ; ঘর-মাঠ-কল-কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—পুলিশ মিলিটারির বুলেট আর বেঅনেটের সামনে। কণ্ঠে তাদের ফেটে পড়েছে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। পাকিস্তানের তখত তো গোলাম মোহাম্মদ-মির্জা-আয়ুবই কায়েমী ক'রে রেখেছেন। সাধারণের স্থান কোথায় সেখানে! পাকিস্তানের তখতে সত্যিকারের গণপ্রতিনিধি আজো আসেন নি। জনসাধারণের বিক্ষোভ এই সব কায়েমী শাসকদের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ শোষক আর শোষণের বিরুদ্ধে। কৃষক-শ্রমিকের রক্ত শুষে জড়ো ক'রছে যারা দেশের সমস্ত সম্পদ এই বিক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের মানুষ আর নির্বাচনের ভাঁওতায় ভুলতে নারাজ। এই বুনিয়াদী নির্বাচনে আয়ুবকে হটানো যাবে না কিছুতেই। মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার বুনিয়াদী গণতন্ত্রী সাড়ে এগারো কোটি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হ'তে পারে না। শাসন-ক্ষমতা কায়েমী ক'রে রাখার চক্র হ'লো এই বুনিয়াদীগণতন্ত্রী নির্বাচন প্রথা। এ-চক্র ভেদ ক'রে আয়ুবকে হটানো দুঃসাধ্য। '৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পিছনে দাঁড়িয়েছিল সাড়ে দশ কোটি মানুষ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আজম খান তাঁর 'চাষীভাই, জেলে ভাইদের' কাছে ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। তবু ফাতেমা জিন্নাহ্ জিততে পারেন নি। তাই পাকিস্তানের মানুষের আজ প্রধান দাবি—প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচন, পার্লামেণ্টারি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। কায়েমীশাসনের অবসান ঘটাতে আজ

পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ আওয়াজ তুলছে, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। রক্তে লেগেছে সর্বনাশের মাতন। নভেমবর ডিসেমবর জানুয়ারি—একটার পর একটা মাস যে কখন পেরিয়ে গেছে ভালো ক'রে জানতেও পারি নি। এসেছে শুধু খবরের পর খবর—মিছিল বিক্ষোভ সৈন্যতলব কার্ফু মৃত্যু। কোন্ খবর রেখে কোনটাকে যে ফাস্ট ব্যানার ক'রবেন ভাবতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছেন মুসাভাই। দিনের পর দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেরিয়েছি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রাস্তায়—বায়তুল মোকারম, মধুর ক্যান্টিন আর পল্টন ময়দানে। ছুটে গেছি বরিশাল। দেখেছি, গণ-জাগরণের আর-এক রূপ। মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের স্মৃতি-জড়িত বরিশাল টাউন-হলের নামকরণ করা হ'য়েছিল আয়ুব-হল। সাদা পাথরের বুকে কালো হরফে খোদাই ক'রেছিল সে নাম, কিন্তু বরিশালের সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে নি তা। মুছে দিতে পারে নি তাদের হৃদয় থেকে মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম! বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল টাউন হলের ফটক থেকে আয়ুবের নাম মুছে দিয়ে লিখতে গেছে মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম। বাধা দিয়েছে পুলিশ। জনতা আর পুলিশে চলেছে লড়াই। টিয়ারগ্যাস লাঠিচার্জ—কিছুই রুখতে পারে নি হ'জার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের অগ্রগতি। মিছিলের পর মিছিল এসে ভেঙে পড়েছে টাউন হলে। কতো লোক জানি না, বিশ—ত্রিশ হাজারও হ'তে পারে। পুলিশ গুলি ছুড়েছে। রক্ত ঝরেছে। তাজা রক্ত। লাল সুরকি ঢালা পথ আরও লাল হ'লো। এ. কে. স্কুলের ছাত্র কিশোর আলাউদ্দীন শহীদ হ'লো। আরও ৭ জন হ'লো বুলেটবিদ্ধ। ক্রুদ্ধ ছাত্র আর জনতা ভেঙে গুড়িয়ে দিল আয়ুব-নামাঙ্কিত ফলক। শহীদের তাজা রক্তে লিখল মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নাম। কারও সাধ্য নেই মুছে ফেলে সে নাম।

ছুটে গেছি বৈদ্যের বাজার (নারায়ণগঞ্জ)। দেখেছি শহীদের রক্তে-ভেজা মাটি। ছাত্ররা সেখানে পূর্বপাকিস্তান পরিষদের কনভেনশন

মুসলিমলীগের চীপ হুইপ এম. এ. জাহেরের বাড়িতে গিয়ে দাবি জানিয়েছিল কালো পতাকা তোলার। জাহেরের ভাই নুর মোহাম্মদ পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে বুলেটে দিয়েছে তার জবাব। লুটিয়ে পড়েছে একের পর এক ছাত্র। শহীদ হ'য়েছে ছ'জন। আহত হ'য়েছে ১২ জন। কিন্তু বৈগুের বাজারের ক্রুদ্ধ মানুষের আক্রোশ থেকে বাঁচতে সপরিবারে জাহেরকে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে ঢাকা মিলিটারি ক্যাণ্টনমেণ্টে। জনতার আক্রোশ থেকে রেহাই পায় নি সেই কলঙ্কিত গৃহ। পুড়ে খাক হ'য়ে গেছে।

ঢাকার গভর্নর হাউস থেকে হট লাইনে মোনেমের শুষ্ক এবং উদ্বেগজড়িত কণ্ঠে শুনতে পান আয়ুব একটার পর একটা ঘটনা। খবর যায় পশ্চিমপাকিস্তানের গর্ভনর মুসার কাছ থেকে। পিণ্ডির মিলিটারি হেড কোয়ারটার থেকে ফোন করেন জেনারেল মুসা, 'স্যার, ইটস নট ওয়াইজ টু কল মিলিটারি পারসোনেল টু কোয়েল দা মাস সো ফ্রিকুয়েণ্টলি। দে মে রিভোল্ট।' বার বার সৈন্যতলব ক'রেও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে দমানো যাচ্ছে না। পিণ্ডির প্রেসিডেণ্ট ভবনে নিজের অফিসরুমে পায়চারি ক'রতে ক'রতে আয়ুব সিদ্ধান্ত নেন লাহোর আর ঢাকায় যাবার।

ঢাকা বিমান-বন্দরে নেমেই গেলেন ভি. আই. পি. রুমে। তাঁর পিছনে পিছনে নামলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দীন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিয়া আরশাদ হোসেন এবং প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা ফিদা হাসান; গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে বসে সাংবাদিকদের আয়ুব জানালেন, শীগ্‌গীরই জরুরি অবস্থা তুলে নেবার কথা ভাবছি। আর শাসনতন্ত্রও প্রয়োজন বোধে পাল্টানো যেতে পারে। শাসনতন্ত্র কোনো ঐশী বাণী নয় যে তার রদবদল করা চলবে না। দেশের মঙ্গল হয় এমন শাসনতন্ত্র গঠনে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে রাজী আছি। আমি

তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চাই। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলোও বিবেচনা করা হ'চ্ছে। আয়ুবের সুর নরম। আগেকার সেই জোরালো আওয়াজ আর নেই। একবারও আগের মতো দম্ভ ক'রে বলতে পারলেন না বিশৃঙ্খলাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে উঠলেন গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান বিরাট ফিকে সবুজ ক্যাডিলাক গাড়িটায়। যেতে যেতে পথের তু'পাশে দেখলেন, দোকান বাড়ি স্কুল ট্রাক বাস জীপ সাইকেল—সর্বত্র উড়ছে কালোপতাকা। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় জ্বল জ্বল ক'রছে দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারগুলি। তাতে লেখা: জালিম আয়ুব ফিরে যাও, ছাত্র হত্যার জবাব চাই, বুলেট নয় খাবার চাই, আপোস নয় সংগ্রাম, গোলটেবিলে নয় রাজপথে, ১১-দফা মানতে হবে, ইত্যাদি। অনেক পোস্টারে কার্টুনও আঁকা রয়েছে। পোস্টার দেখে অবাক হ'লেন মোনেম খান। বিমানবন্দরের তু'পাশের রাস্তার পোস্টারগুলো তো লোক লাগিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হ'য়েছিল—এরই মধ্যে আবার কে সেঁটে গেল! লোকচলাচলও তো এদিকে নিষিদ্ধ! রমনা গ্রীনের পাশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে ঢুকবার মুখেই আয়ুব দেখলেন, অদূরে সারিসারি ভাঙা একচা৺র ওপরেও উড়ছে কালোপতাকা।

প্রেসিডেন্ট হাউসে ঢুকেই খবর পেলেন: ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদের ডাকে কালোপতাকা, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে মিছিল বের ক'রেছে। কণ্ঠে স্লোগান। ফাঁকে ফাঁকে চলছে ব্যঙ্গাত্মক গান। চলছে যাত্রা, কীর্তন, ভাটিয়ালি আর দেশাত্মবোধক সুরের প্যারোডি। একজন বলে যাচ্ছে, ৬০ টাকা মণ চাল খেয়ে স্বর্গে যাব গো। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ধুয়া তুলছে: স্বর্গে যাব গো—স্বর্গে যাব গো। আর-একদল ছাত্র কৃষ্ণলীলার সুরে বলে: ও আয়ুব তুই কী করিলি, ছাত্র মেরে হাত পাকালি। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া ওঠে: ক্ষমা নেই,

ক্ষমা নেই। মিছিলের আর-এক প্রান্তে জারিগানের সুরে প্যারোডি চলেছে :

এইখানে শুনুন সবে
আয়ুব-মোনেমের গান
কতো মায়ের বুক ভেঙে ক'রেছে খান্ খান্।
অন্যেরা ধুয়া তোলে : মরি হা—য় রে।
'বরিশালে মেরেছে কিশোর আলাউদ্দিনে,
ঢাকায় মেরেছে আসাদুজ্জামানে,
পিণ্ডিতে মেরেছে আবদুল হামিদে,
কতো রক্ত ঝরাবে আয়ুব-মোনেমে?
ধুয়া : মরি হায়—য় রে।

মিছিল নবাবপুর রোড দিয়ে যাবার সময় দু'পাশের বাড়ির ছাদ থেকে মেয়েরা ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। মিছিলের সামনের দিকে ছিল শহীদ মতিউরের ভাই। রাশি রাশি ফুল পড়ল তার মাথায়। মা-বোনের অভিনন্দন পেয়ে দামাল ছেলেমেয়েদের বুক ভ'রে উঠল। সূর্যের গনগনে আঁচে মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, তবু নতুন উদ্যমে স্লোগান তুলল হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে : 'ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা এক হও,' 'জালিম আয়ুব ফিরে যাও' 'সংগ্রাম চলবে—চলবে', ইত্যাদি। মিছিল ক'রে ছাত্ররা এলো শহীদমিনারে। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্যটা ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সংগ্রামের শপথ নিল তারা। সারা দেশের মানুষকে শপথ নিতে আহ্বান জানাল ৯ ফেবরুয়ারি।

সংগ্রামী ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সারা দেশের মানুষ। সকাল থেকে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে এসেছে হাজার হাজার মানুষের হাজারো মিছিল। মিলেছে পল্টন ময়দানে—বিশাল জন-সমুদ্রে। ৩৮টি মাইকেও

কুলোচ্ছে না। ছাত্রনেতাদের কথা সকলের কাছে পৌঁছোচ্ছে না ঠিকভাবে। জনতা তবু শান্ত, স্থির। মঞ্চে সার বেঁধে আসন ক'রে বসেছে সাইফুদ্দিন মাণিক, জামাল হায়দার, আনোয়ার হায়দার, মাহবুবউল্লাহ্, সামসুদ্দোহা, খালেদ মাহমুদ প্রমুখ ছাত্রনেতারা। মাঝে বসেছে তোফায়েল। সভাপতি। মঞ্চের পিছনে কালো পর্দায় সাদা আঁচড়ে আঁকা রয়েছে পাকিস্তানের মানচিত্র। তারই নিচে লেখা: 'কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রজনতা এক হও,' 'সংগ্রাম চলবে —শপথ নাও', 'এগারোদফা মানতে হবে'।

সাইফুদ্দিন আহম্মদ মাণিক উঠে দাঁড়ালো। লক্ষ হাতের তালিতে প্রকম্পিত হ'লো পল্টন ময়দান। স্টেডিয়ামের গায়ে প্রতিধ্বনি জাগাল সেই করতালি। স্টেডিয়ামের মাথায় আর দোতলায় দাঁড়ানো হাজার হাজার মানুষও করতালিতে যোগ দিল। পরক্ষণেই আটত্রিশটি মাইকে একযোগে ভেসে এলো সাইফুদ্দিনের কণ্ঠস্বর: 'পূর্ববাঙলার জাগ্রত জনতা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' এক মুহূর্ত থেমে সুরু ক'রল, 'আমরা সংগ্রামে নামতে চাই নি, নির্বিঘ্নে পড়াশুনা ক'রতে চেয়েছি। কিন্তু আয়ুব-মোনেম আমাদের সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছেন। আমরা 'শক্ষিত হই আয়ুব-মোনেম তা চান না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন, জগন্নাথ কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজের মতো প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলো প্রাদেশীকরণ ক'রে দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ছাত্রের শিক্ষার পথ রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছেন। স্কুল-কলেজের অভাবে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা ক'রতে পারছে না। —এমনি আরো হাজারো'সমস্যা রয়েছে আমাদের সামনে।

যে-দেশে বাক্ স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতা নেই সংবাদপত্রের, অধিকার নেই গণ-প্রতিনিধি নির্বাচনের; কৃষক-শ্রমিক দু'বেলা খেতে পায় না—যে-দেশে শেখ মুজিবের মতো দেশপ্রেমিককেও দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়, রাজনৈতিক নেতা আর কর্মীদের

জেলে পুরে রাখা হয় বছরের পর বছর, নির্বিচারে খুন করা হয় ছাত্র-শ্রমিক আর কৃষককে, সে-দেশে ছাত্ররা কী ক'রে ক্লাসে নীরবে বসে পড়াশুনো ক'রবে ? তাইতো আমরা বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়—বুলেট আর বেঅনেটের সামনে। রক্ত ঝরেছে পিণ্ডি, পেশোয়ার, করাচি, ঢাকা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জের পথে পথে। জানি আরো ঝরবে, কিন্তু খুনীর সঙ্গে আপোস নেই ; সংগ্রাম আমাদের চলবে।

আয়ুব বিরোধী নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে ডেকেছেন। আমরা ছাত্রসমাজ এবং পাকিস্তানের সাড়ে এগারো কোটি মানুষের পক্ষ থেকে নেতাদের হুশিয়ার ক'রে দিতে চাই—গণদাবির প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে তাঁর রেহাই নেই। আমরা চাই, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে সকল রাজবন্দীর নিঃসর্ত মুক্তি, জরুরি অবস্থা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা প্রত্যাহার।

সব শেষে আমরা বলতে চাই ডাক-এর ৮-দফা, শেখ মুজিবের ৬-দফা এবং মৌলানা ভাসানীর ৮-দফার সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমাদের এগারোদফা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের দাবির পূর্ণরূপ। এই দাবি আপনার, আমার, সকলের। আসুন, শপথ নিই, এগারোদফা দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। শপথ নিন শহীদদের নামে—সংগ্রাম আমাদের চলবে।

লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো : সংগ্রাম চলছে—চলবে।

একের পর এক ছাত্রনেতারা বলে চলেছে। বুকে তাদের অনেক জ্বালা। মুখে জ্বালা-ধরানো আগুনের ফুল্‌কি।

সব শেষে তোফায়েল উঠে দাঁড়াল। হাতে তাঁর আয়ুবের 'ফেণ্ডস নট মাস্টার' বইখানি। জনতার দিকে বইখানি তুলে ধরে তোফায়েল বলল : এই কিতাবখানায় আয়ুব দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে অভদ্রোচিত ভাষায় বিদ্রূপ ক'রেছেন ; তাঁদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ ক'রেছেন। আসুন আজ আমরা তাঁর কুশপুত্তলিকার সঙ্গে

তাঁর সাধের কিতাবও আগুনে ছুড়ে দিই। সেই আগুনের শিখায় শপথ নিই সংগ্রামের।'

জনতা উল্লাসধ্বনি ক'রল।

মঞ্চের পাশে দাউ-দাউ আগুনে পোড়ানো হ'লো আয়ুবের কুশপুত্তলিকা আর 'ফেণ্ডস নট মাস্টারস'।

তারপর সেই বিশাল জনতা এগিয়ে চলল ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সেই অর্ধলক্ষ মানুষের গর্জনে ভয় পেয়ে জেল গেটের পুলিশরা দ্রুত ছুটে গিয়ে দোতলায় আশ্রয় নিল। জানালা ফাঁক দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সেই বিশাল জনসমুদ্র। জনতার মুখে স্লোগান: 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই,' 'মণি সিং-এর মুক্তি চাই', 'তাজিমউদ্দীনের মুক্তি চাই', 'রাজ্জাক দোলনের মুক্তি চাই', 'জরুরি আইন বাতিল কর', 'ষড়যন্ত্রমামলা প্রত্যাহার কর,' ইত্যাদি। স্লোগান তো নয়, ক্ষিপ্ত সমুদ্রের গর্জন।

আয়ুব তখনো ঢাকায়, প্রেসিডেণ্ট ভবনে। শুনলেন তিনি সবই। দেখলেন ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মশাল শোভাযাত্রা। বদরুদ্দিন ওমর, বেগম সুফিয়া কামাল এবং ডক্টর এনামুল হকের মতো ব্যক্তিরাও হ'য়েছেন যার শরিক!

১২ ফেবরুয়ারি ঢাকা ছাড়ার আগে আয়ুব সকল রাজবন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়ে গেলেন। দীর্ঘদীন বাদে কারাপ্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে এলেন রাজবন্দীদের প্রথম ব্যাচটি। উল্লসিত জনতার পুষ্পমাল্যে সংবর্ধিত হ'লেন তাঁরা।

১৪ ফেবরুয়ারি।

ডাক আজ হরতালের ডাক দিয়েছে সারা দেশে। খাইবার থেকে টেকনাফ সারাদেশ সাড়া দিয়েছে সে ডাকে। রাস্তায় নেই যানবাহন।

খোলা নেই দোকানপাট-বাজার-হাট-রেল-ষ্টিমার-বিমান-ডাক কিছুই। আমরাও আজ প্রেসকার বের করি নি। পায়ে হেঁটে চলেছি রাস্তায় রাস্তায়। অন্যদিনের মতো রাস্তায় মিলিটারির একটা ভ্যানও দেখতে পেলাম না; পুলিশ পর্যন্ত না। সকাল থেকে লাল আর কালো ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল আসা সুরু হ'য়েছে পল্টনে। মিছিলের বুঝি শেষ নেই। কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনসাধারণ সকলের মিছিল। আজকের স্লোগান: 'হরতাল হরতাল,' 'আমার ঝাণ্ডা তোমার ঝাণ্ডা—লাল ঝাণ্ডা লাল ঝাণ্ডা,' 'চোখের মণি—মনি সিং-এর মুক্তি চাই,' 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই—মুক্তি চাই', 'কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রজনতা এক হও—এক হও', 'সংগ্রাম চলছে চলবে,' ইত্যাদি। নগরে বন্দরে উত্তাল জনতরঙ্গের ওই একই গর্জন। চারটের মধ্যে পল্টন হ'লো জনতার সাগর। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু মানুষ আর মানুষ, পতাকা আর পতাকা। লাল আর কালো পতাকা।

ডাক-নেতা মুজাফ্ফর আহাম্মদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিসেস আমেনা বেগম, মহীউদ্দীন আহাম্মদ, নুরুল আমিন, ফরিদ আহাম্মদ, তোফায়েল আরও অনেক বক্তৃতা দিলেন। ডাক দিলেন সংগ্রামের।

অফিসে ফিরে খবর পেলাম, লাহোরে পুলিশের গুলিতে দু'জন মারা গেছে। করাচি, লাহোর এবং হায়দ্রাবাদে সেনাবাহিনী তলব করা হ'য়েছে। পিণ্ডিতে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হ'য়েছে ১৮ জন।

পরের দিনের একটা ঘটনায় পূর্ববাঙলার জনসাধারণ আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ল। খবর পাওয়া গেল, আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রক্ষীর আঘাতে মারা গেছেন আর গুরুতর ভাবে আহত হ'য়ে কম্বাইড মিলিটারি হাসপাতালে আছেন সার্জেন্ট ফজলুল হক।

দু'জনেই আটক ছিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তৃতীয় পাঞ্জাব

রেজিমেণ্টের ৪ নম্বর ব্যারাকে। ১৫ ফেবরুয়ারি ভোর চারটের সময় ফ্লাইট সার্জেণ্ট জহুরুল হক ল্যাট্রিনে যাওয়ার তাগিদ বোধ করেন। রক্ষী তখন দ্বার খুলে দিতে অস্বীকার করে। গার্ড কম্যানডার মঞ্জুর হোসেইন শাহ্‌কে খবর দেওয়া হ'লো। ভোরে বাঁশী পড়ার আগে সে কিছু ক'রতে পারবে না বলে জানালো। সামরিক কাস্টডিয়ান মেজর নাসের কিন্তু বলেছিলেন যে-কোনো সময়ে দরকার বোধে তারা ল্যাট্রিনে যেতে পারবেন। কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেই হাবিলদার মঞ্জুর হোসেইন শাহ্ ক্ষেপে গিয়ে সার্জেণ্ট জহুরুল হককে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ সুরু ক'রলো। মিস্টার হক বললেন, মুসলমান হ'য়ে একজন মুসলমানের প্রতি এ ধরনের আচরণ করা উচিত নয়। উত্তেজিত শাহ্‌জীর মুখ দিয়ে গালি-গালাজের তুবড়ি ছুটল: তুম লোগ মুসলমান নেহি হ্যায়, তুম লোগ জানোয়ার হায়, তুম লোগ গাদ্দার হ্যায়, তুম লোগ কো মার ডালনা চাহিয়ে, তুম লোগ হামকো সোনে নাহি দেতে হো, আব তুম লোগ কো তামাশা দেখায়েঙ্গা।

ভোঁ বাজার পর একজন নায়েক এসে দরজা খুলে দিল। সার্জেণ্ট জহুরুল হক এবং সার্জেণ্ট ফজলুল হক ল্যাট্রিনের দিকে যাচ্ছেন।

গুড়ুম—গুড়ুম—

হঠাৎ গুলির শব্দে সকলে চমকিত হ'লো। সার্জেণ্ট জহুরুল হক আর সার্জেণ্ট ফজলুল হক লুটিয়ে পড়েছেন মাটিতে। গার্ড কম্যানডার মঞ্জুর হোসেইন শাহ্ গুলি ছুড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চত্বরটা। যন্ত্রণায় কাঁতরাচ্ছেন গুলিবিদ্ধ জহুরুল হক আর ফজলুল হক। পানি চাইতেই বুট দিয়ে মুখটা থেঁতলে দিতে দিতে মঞ্জুর হোসেইন শাহ্ বলল, 'আব দেখা হারামিকা বাচ্চা, ক্যায়সা মজা হ্যায়।'

অনেক কয়েদীর চোখের সামনেই ব্যাপারটি ঘটে। তাদের কাছ থেকেই পরে জানা গেছে ঘটনাটা। সরকার কিন্তু প্রেস রিলিজে

বলল, রক্ষীর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিতে গেছিল তারা, অনন্যোপায় হ'য়ে অপর একজন রক্ষী গুলি ছুড়েছে তখন।

খবর শুনে উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠল পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষ। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে উত্তাল হ'য়ে উঠল জনতা। এপিপি আর পিপিএর টেলিপ্রিণ্টার ছুটোর বিশ্রাম নেই এক মুহূর্ত। খবরের পর খবর উগ্‌রে চলেছে সারাক্ষণ।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখলাম ঘরে রোদ এসে গেছে। আলোয় আলোয় আকাশটা ভরে গেছে। কুয়াসা পর্যন্ত কেটে গেছে। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মতো শিশিরকণাগুলি বুঝি মিলিয়ে যাবার উদ্যোগ ক'রছে। কয়েকটা পাখি ডানা মেলে সূর্যের দিকে ছুটে চলেছে। কিছুদিন থেকেই অনেক রাতে বাড়ি ফিরছি, ঘুম ভাঙতে দেরি হ'য়ে যায়। লেপটা সরিয়ে উঠে পড়লাম। টেবিল-ক্যালেণ্ডারে ১৭ তারিখটাকে পাল্টে ১৮ তারিখ ক'রলাম। সোমবার পাল্টে ক'রলাম মঙ্গলবার। হাতমুখ ধুয়ে বসবার ঘরে আসতেই দেখি, আতোয়ার আর আলো। কফির কাপ হাতে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে গল্প ক'রছে। সহাস্যে বললাম, 'আরে মেমসাহেব যে!' আলোকে ঠাট্টা ক'রে আমি মেমসাহেবই বলি।

আলো নীরবে হাসল। চোখ-তোলা চশমার আড়ালে নেচে উঠল ওর সুন্দর দু'টি চোখের তারা। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। ভারি সুন্দর লাগে তখন ওকে দেখতে। গায়ে দিয়েছে হাল্কা গোলাপী কার্ডিগান। আলোকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না বয়েস হ'য়েছে। যৌবন ধরে রেখেছে এখনো। শরীরে এখনো লেগে আছে কচিপাতার মতো লাবণ্যের ছোঁয়া। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কবে এলে?'

ছোট্ট ক'রে উত্তর দিল আলো, 'কাল রাতে।'

'কারফিউতে আটকা পড়ো নি তো?'

'না, অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছি। বিরতির সময়টায় এসে পৌঁছেছি।' সেণ্টার টেবিলে কফির কাপটা রাখতে রাখতে উত্তর দিল আলো।

আমি তরলকণ্ঠে বললাম, 'আতোয়ারের না হয় জেল-টেলের ভয়

নেই, দু'চার বার গিয়ে ধাতস্থ হ'য়ে গেছে, তাই কারফিউর ধার ধারে না। কিন্তু তুমি যে এই কারফিউর মধ্যে বেরিয়েছ!'

আলো হাসিমুখে বলল, 'আমি কী ক'রব, সাতগলি ঘুরিয়ে নিয়ে এলো যে।'

'তা মেমসাহেব আতোয়ারকে একটু ধরে-টরে রেখো। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কখন যে কী হবে বলা যায় না।'

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে আলো বলল, 'আমার কোন্ কথাই-বা কানে তোলে।'

আতোয়ার এতক্ষণ নীরবে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। আলোর কথায় মুখ ফেরাল। আলোর দুই চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি আমাকে আন্দোলনে যেতে মানা করো?'

আলো চোখ নামাল। মাথা একটু নুইয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার পথই আমার পথ। শুধু তোমার পাশে পাশে আমাকে থাকতে দিও।'

দেখলাম, আলোর কথা শুনে আতোয়ারের দুই চোখ খুশিতে ঝিকিয়ে উঠেছে। আলোর কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুই কি বেরুবি?'

'হ্যাঁ, বেরুতে তো হবেই। একটু ব'স, প্রেসকার পাঠানোর জন্য অফিসে একটা ফোন ক'রে আসছি। ওতে পৌঁছে দেব তোদের।' বলে এক পিস মাখনরুটি মুখে পুরে কফির পেয়ালা হাতে চলে গেলাম ভিতরে। ফোন ক'রে কাপড় পাল্টে তৈরি হ'য়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরের ঘরে ঢুকি দেখি, আলো মাথা নিচু ক'রে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝের ওপর আঁকিবুকি ক'রে চলেছে আর আতোয়ার নীরবে সিগারেট টেনে চলেছে। পরিহাস-তরলকণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, 'ও, আপনাদের পরিচয়টাই তো করানো হয় নি এতক্ষণ, সরি।' তারপর আতোয়ারের দিকে চেয়ে বললাম, 'উনি মিস আলো—সুগায়িকা।' তারপর আলোর দিকে চোখ ঘুরিয়ে বললাম, 'উনি

মিস্টার আতোয়ার খান—লেবার লীডার এণ্ড এডভাইসর টু দি স্টুডেন্ট-লীডারস।'

'কলকল ক'রে হেসে উঠল আলো। আতোয়ারও হাসতে হাসতে বলল, 'হ'য়েছে, তোকে আর ফক্কুড়ি কাটতে হবে না।'

বললাম, 'কী ক'রব ; তোরা যে রকম চুপ চাপ বসে ছিলি, দেখে যে-কেউ মনে ক'রতে পারত, তোরা কেউ কাউকে কস্মিনকালে দেখিস নি আগে।'

অফিসের ড্রাইভার এসে দাঁড়ালো দরজায়। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যাও, আসছি।' তারপর আতোয়ারের দিকে চেয়ে বললাম, 'চল্, বেরিয়ে পড়ি।'

রাস্তায় নেমে দেখলাম বিবর্ণ পোস্টারের পাশে নতুন পোস্টার প'ড়েছে। একুশের ডাক দিয়েছে ছাত্ররা। নিন্দা ক'রেছে জহিরুল হকের হত্যার। পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হ'য়ে গেছে সারাটা শহর। লাল আঁখরে শহীদদের নাম জ্বল জ্বল ক'রছে কোথাও কোথাও। গেলাম শাহাবউদ্দীনের ওখানে। সেখানে থেকে আলোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলাম আতোয়ারের জাহাজী ইউনিয়নের অফিসে। কয়েকটা শ্রমিক ইউনিয়নের সেকরেটারি আতোয়ার। আতোয়ারকে নামিয়ে দিয়ে এলাম অফিসে। দেখলাম, কোনো গুরুত্বপূর্ণ রুটিন নেই। কয়েকটা ফোন করার ছিল ; ক'রে চলে গেলাম প্রেসক্লাবে। দুপুরে আর বাড়ি ফিরব না। খাবারের অর্ডার বুক ক'রে চলে এলাম দোতলায়। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম বেলকনিতে। বয় খবরের কাগজের ফাইল দিয়ে গেল। বসে বসে দেখছিলাম। শুধু বিক্ষোভ মিছিল আর মৃত্যুর খবর। শেখ মুজিবর রহমান প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যেতে নারাজ। আমাদের পত্রিকায় খবরটা কভার ক'রতে পারে নি। ইত্তেফাকে রয়েছে দেখলাম। প্রায় পৌনে তিন বছর বাদে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাক প্রকাশ ক'রতে দিল সরকার। শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া

গোলটেবিল বৈঠক নিরর্থক। তাকে বাদ দিয়ে 'ডাক'-নেতারা, আসগর খান, আজম খান, এমন কি ভুট্টো পর্যন্ত বৈঠকে বসতে রাজী নন। হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলা তুলে নিতে হয়, নয় তো আয়ুবের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক ভেস্তে যায়। ওদিকে আয়ুব বলে চলেছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলার সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মামলা প্রত্যাহার করা ঠিক হবে না। দেখি, কী হয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে একই টেবিলে বসে খেতে খেতে মর্নিং নিউজের ফটোগ্রাফার লালভাইয়ের সঙ্গে টুকিটাকি হাল্‌কা কথাবার্তা হ'চ্ছিল। খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে পি. পি. এ.র এক রিপোরটার জানালেন, রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার সামছুজ্জোহাকে মিলিটারিরা বেঅনটের আঘাতে গুরুতর জখম ক'রেছে। হাসপাতালে নেওয়া হ'য়েছে তাঁকে। মুমূর্ষু অবস্থা।

রাস্তায় নেমে দেখি, কী ক'রে জানি না এরই মধ্যে ছড়িয়ে গেছে খবরটা। থম থম ক'রছে সারাটা শহর। কার্জনহলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম এস. এম. হলের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে পলাশ আর শিমূলগাছগুলো ফুলে ফুলে লাল হ'য়ে আছে। নির্জন রাস্তা। মাঝে মাঝে মিলিটারির ভ্যান ছুটে চলেছে। মেডিকেল কলেজের সামনে হঠাৎ পথ আটকে ব্রেক কষল একটা মিলিটারি জীপ। একজন অফিসার আমার আইডেনটিটি জানতে চাইলেন। কারফিউ পাশ বের ক'রে দেখালাম। হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তে এ্যাসেমব্‌লির পাশ দিয়ে জীপটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সলিমুল্লাহ্‌ হলে ঢুকে দেখলাম, জরুরি মীটিং চলছে—সাইফুদ্দিন, তোফায়েল, জামাল, মাহবুবউল্লা—সকলে রয়েছে। আছে হলের প্রতিনিধিরা। আমি ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে সাইফুদ্দিন আর জামাল হায়দার ছুটে এলো। বলল, 'কলহনভাই, ডক্টর জোহাকে নাকি মিলিটারিরা গুরুতর আহত ক'রেছে?'

বললাম, 'আমিও তো তাই শুনেছি। তোমাদের বৈঠকে বসতে আপত্তি নেই তো?'

জামাল বলল, 'না না, বসুন না।'

চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের পাশেই বসলাম। উত্তেজিত কণ্ঠে ওরা কথা বলে চলেছে। মনে পড়ল, '৫২ সালের ফেবরুয়ারির এমনি দিনের কথা। গাজিউল হক, তোয়াহাভাই, অলি আহাদ ভাই-ও সেদিন বসে এমনি উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে চলেছিলেন। তোফায়েল বলে চলেছেঃ 'আর সহ্য করা চলে না। আয়ুবের অত্যাচার আর চলতে দেওয়া যায় না। আয়ুবের সৈন্যরা শুধ্ শুধু ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকই নয়, আমাদের অধ্যাপকদেরও মারধোর ক'রে চলেছে। এর আগে তুলারাম কলেজে অত্যাচার ক'রেছে, ক'রেছে ময়মনসিংহ কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবারে ক'রেছে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর সামসুজ্জোহাকে মিলিটারিরা বেঅনেটের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মম ভাবে জখম ক'রেছে। তিনি এখন হাসপাতালে। আল্লাহ করুন, ভালো হ'য়ে উঠুন তিনি। ডক্টর জোহার প্রতিবিন্দু রক্ত থেকে জেগে উঠুক হাজার হাজার সংগ্রামী ছাত্র। সোয়া তিন লক্ষ সৈনিকের ক্ষমতা নেই জনতার সেই দুরন্ত আক্রোশ থেকে আয়ুবকে বাঁচায়। আয়ুবকে বিদায় নিতেই হবে। ওরা কারফিউ জারি ক'রেছে—মানি না কারফিউ; মানি না চুয়াল্লিশ ধারা। মিলিটারির স্টেনগান আর ব্রেনগানের সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে যে ভয় পাই না আজ আমরা তাই দেখিয়ে দেব। ঢাকার রাজপথে আজ রক্তের হোলি খেলব। অগ্নি শপথ নেব শহীদের তাজা রক্তে। লক্ষ মশালের আগুনে পুড়িয়ে খাক ক'রে দেব আয়ুবশাহী।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল তোফায়েল। উত্তেজনায় দপ্ দপ্ ক'রছে ওর দু'চোখের তারা। রাগে, ক্ষোভে, অনেক জ্বালায় ওর চোখ ফেটে জল এসে গেছে।

অফিসে এসে মুসাভাইকে বললাম সব। রাতে ছাত্ররা মশাল

শোভাযাত্রা বের ক'রতে পারে। রিপোরটার আর ফটোগ্রাফারদের তৈরি থাকতে বললেন মুসাভাই। রাজশাহী থেকে আমাদের করেসপনডেনটের টেলিগ্রাম এসে গেছে। ওয়াহিদুল হকসাহেবের হাত থেকে তুলে নিলাম টেলিগ্রামটা। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তিনি :

রাজশাহীর হাজার হাজার ছাত্র এগারোটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমায়েত হ'য়েছিল। শোভাযাত্রা বের ক'রবে আয়ুবের জুলুমের প্রতিবাদে। শহরে একশ চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে। তাই ছাত্ররা ঠিক ক'রলো তিনজন তিনজন ক'রে বেরুবে। মিছিল বেরুতে যাবে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এসে একটা মিলিটারি জীপ দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। দেখে ছাত্ররা উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। প্রমাদ গুনলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। ছাত্ররা ডক্টর জোহাকে খুব শ্রদ্ধা ক'রে, মানে। তাই ভাইস-চ্যানচেলার ডক্টর জোহাকে পাঠালেন অবস্থা আয়ত্তে আনতে। ডক্টর জোহা ছাত্রদের গেট থেকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষমান ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রলেন। বললেন, অযথা মিলিটারি আসায় ছাত্ররা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। অবিলম্বে মিলিটারিদের চলে যেতে বলুন। ম্যাজিস্ট্রেট রাজী হ'লেন। মিলিটারির প্রথম জীপটি চলে যেতে-না-যেতেই ছুটে এলো একটা মিলিটারিভ্যান। মুহূর্তে লোহার হেলমেট পরা সৈনিকরা লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। কোনো হুঁশিয়ারি না ক'রেই তারা গুলি ছুড়ল এলোপাথারি। ডক্টর জোহার সঙ্গে আরো কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছুটে গেলেন তাঁরা। ছুটলেন ডক্টর জোহা। বেঅনেট উঁচিয়ে পিছনে ছুটে আসছে চার-পাঁচজন সৈনিক। ডক্টর জোহা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। পিছন থেকে তিন-চার জন মিলিটারি এসে বেঅনেটের খোঁচায় খোঁচায় রক্তাক্ত ক'রলো ডক্টর জোহাকে।

ডক্টর জোহার আর্ত চীৎকারে মতিহারের রাস্তা কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে কেঁদে উঠল ছাত্ররা। কেঁদে উঠলেন অধ্যাপকরা। কেউ এগিয়ে যেতে পারছেন না। তখনও এলোপাথাড়ি গুলি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রীডারকে এমন নৃশংসভাবে জখম ক'রতে পৃথিবীতে বোধ হয় একমাত্র আয়ুবের সৈন্যরাই পারে। মিলিটারিরা তুলে নিয়ে গেল সেই রক্তাক্ত দেহ।

খবর পেলাম ডক্টর জোহা হাসপাতালে আছেন। ছুটে গেলাম সেখানে। হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক আর সাধারণ মানুষ হাসপাতালের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা ক'রছেন। রাত নেই বিরেত নেই মখদুমহলের ছাত্রদের অসুখ-বিসুখে পাশে আছেন জোহা। ফুটবল খেলায় জিতেছে ছাত্রেরা—আনন্দোৎসবে যোগ দিচ্ছেন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে। ছাত্রের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতো কতোদিন তাঁকে মতিহারের রাস্তায় বেড়াতে দেখা গেছে। 'ভাই' ছাড়া ছাত্রদের যিনি সম্বোধন করেন না, সেই স্বাস্থ্যবান ফুর্তিবাজ মানুষটি আজ মৃত্যুশয্যায়! সকলে ডক্টর জোহার খবর শোনার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রয়েছে। থম থম ক'রছে তাদের মুখ। কয়েকজন ছাত্রকে দেখলাম কেঁদে চলেছে। ভিতরে ঢুকে কাচের দরজার এপাশ থেকে দেখলাম সারা শরীরে অসংখ্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজগুলো রক্তে ভিজে উঠেছে। অকসিজেন দেওয়া হ'চ্ছে তাঁকে। আলুথালু বেশে ছুটে এসেছেন বেগম জোহা। তাঁর দুগাল বেয়ে গড়িয়ে চলেছে জলের ধারা। ভুলে গেছেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা। কেঁদে কেঁদে বাইরের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে পড়েছে তাঁদের ছোট্ট মেয়ে সাবিনা।....

টেলিগ্রামটা ফিরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সবে সন্ধ্যা হ'য়েছে। জিন্নাহ্ এভিনিউ দেখলাম এরই মধ্যে নিঝুম হ'য়ে পড়েছে। নিওন আলোগুলো নীরবে আলো ছড়াচ্ছে। মিলিটারির ভ্যান টহলে বেরিয়েছে। মোজাম্মেলও সঙ্গে র'য়েছে আমার। গভর্নর হাউসে ট্যাঙ্ক এনে মোতায়েন ক'রেছেন মোনেম খান। ট্যাঙ্কগুলো

গাছপালায় কামোফ্লেজ করা তায় কুয়াসা পড়েছে ঘন হ'য়ে। সহসা ধরার জো নেই। মর্টার আর স্টেনগান হাতে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে গভর্নর হাউস। মোড়ে মোড়ে সৈন্য। সৈন্য জিন্নাহ্ এভিনিউতে, বায়তুল মোকাররমের সামনে, সেকরেটারিয়েট ভবনের ফটকে। কেউ কোথাও নেই, তবু যেন ঝড়ের গন্ধ পাচ্ছি আজ। গাটা কেমন ছম ছম ক'রছে। হন্ হন্ ক'রে পা চালিয়ে এলাম প্রেসক্লাবে। রেডিওটা ধরলাম। সন্ধ্যার খবরে ডক্টর জোহার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। ডক্টর জোহার সংবাদ শুনবার জন্য মহল্লায় মহল্লায় দেখলাম মানুষের জটলা। সর্বনাশের ইঙ্গিত সকলের চোখে। মুখে পড়েছে সন্ত্রাসের ছায়া। ইতস্তত আলাপ ক'রছে গত কয়েকদিনে সান্ধ্য আইনের দোহাই দিয়ে সৈন্যরা যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তারই টুকরো টুকরো কাহিনী : বস্তিতে বস্তিতে ঢুকে মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট ক'রেছে সৈন্যরা ; জোয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে। মিলিটারির ভ্যানের আওয়াজ পেলেই মানুষগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে, কুয়াসায়।

রাত এগারোটার সংবাদ শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। ফেটে পড়ল ছাত্ররা। ডক্টর জোহা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন। সাবিনা বড়ো হ'য়ে হয়তো বাবার ফিকে স্মৃতি নিয়ে সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু যে-শিশু এখনো পৃথিবীর আলো দেখে নি সে কী বলবে ? সে যখন জিজ্ঞেস ক'রবে : মা গো, বাবা কোথায় ? বেগম জোহা হয়তো বলবেন, জালিম আয়ুবের সৈন্যরা তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। শিশু যখন ফের জিজ্ঞেস ক'রবে, কেন ? কে দেবে সেই 'কেন'র জবাব ? সারা দেশের মানুষের কণ্ঠেও আজ ওই একই প্রশ্ন ? কেন—কেন—কেন ? মুখে তাদের ফুটে উঠেছে বজ্রকঠিন শপথ।

রাত তখন বারোটা। গাঢ় কুয়াসা জমেছে। হঠাৎ দেখলাম, কুয়াসা ভেদ ক'রে মশাল হাতে মহল্লার লেন-বাইলেন থেকে হাজার

হাজার মানুষ বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। মনে হ'চ্ছে অসংখ্য কালো কালো ছায়া মশাল হাতে কুয়াসা ভেদ ক'রে এগিয়ে আসছে। মুখে তাদের স্লোগান: 'সান্ধ্য আইন মানি না,' 'ডক্টর জোহাকে হত্যার জবাব চাই', 'গণহত্যা চলবে না', 'আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা তুলে নাও', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', '১১-দফা মানতে হবে', ইত্যাদি। সেই স্লোগানে মধ্যরাত্রির ঘুমন্ত শহর জেগে উঠেছে। হাতের কাছে ছেঁড়া কাপড়-জামা যা পাচ্ছে খুঁটির মাথায় জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে মুহূর্তে মশাল বানিয়ে বেরিয়ে পড়ছে ছেলেরা রাস্তায়। কমলাপুরের দিকে বিশাল জনতা মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে নবনির্মিত স্টেশনের দিকে। সৈন্যরা যে কোথায় ওঁৎ পেতে আছে কুয়াসার জন্য বোঝা যাচ্ছিল না। যদিও মশালের আলোয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে অনেকটা জায়গা। এগিয়ে চলেছে বিশাল জনতা। কমলাপুর বাস ডিপো অতিক্রম ক'রে টি এণ্ড টি স্কুলের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল তারা শাহজাহানপুরের দিকে। মিছিলে মেহনতী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শাহজাহানপুরের রাস্তায় বসাবো-মুগাপাড়া থেকে আর-একটি মিছিল এসে মিলল আগেকার মিছিলটির সঙ্গে। এগিয়ে চলল সেই দীর্ঘ মিছিল বড়ো রাস্তার দিকে। কোত্থেকে একটা মিলিটারি জীপ হঠাৎ এসে পথ আটকে দাঁড়ালো তাদের। মিছিল থেকে একজন গিয়ে জীপটিকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রল। ফল হ'লো না। এগিয়ে চলল জনতা। মুহূর্তে জীপ থেকে চার-চারটে রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠলো। লুটিয়ে পড়ল অনেকে। তবু থামল না তারা।

মগবাজার, পুরানো পল্টন, নয়া পল্টন থেকেও এগিয়ে আসছে অনেক মিছিল। রাতের নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ ক'রে স্টেনগান আর রাইফেলের আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে।

সঙ্গে 'প্রেসকার' রয়েছে। গেলাম ইউনিভারসিটিতে। সলিমুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক হল, রোকেয়াহল, ইডেন হোস্টেল, প্রকৌশল

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মশাল হাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। মিছিলের পুরোভাগে তোফায়েল মাইক হাতে বলে চলেছে: তোমরা কে কে মরতে চাও এগিয়ে এসো। এগিয়ে এসো বাঙলার দামাল ছেলে-মেয়েরা—এগিয়ে এসো বরকত-সালাম শফিকুরের উত্তরসূরীরা—ঢাকার রাজপথ লাল ক'রো রক্তে।

বায়তুল মোকারামের কাছে এসে ছাত্রদের সঙ্গে মিলল কমলা-পুরের সেই বিশাল মশাল শোভাযাত্রীদল। রাইফেল তাদের পথ রুখতে পারে নি। জিন্নাহ্ এভিনিউ ধরে নবাবপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর হাজার মানুষের মশাল-মিছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মশাল আর মশাল। মশালের আগুনে ছেলে-মেয়েদের মুখগুলো লাল দেখাচ্ছে। চোখ ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়। আলোয় আলোয় কুয়াসা পর্যন্ত উবে গেছে। এগিয়ে চলেছে জনতা। কণ্ঠে গান:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!........

গর্জে ওঠে স্টেনগান। ঠা-ঠা-ঠা-ঠাট্-ঠাট্।

চীৎকার উঠল। জানিনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কয়জনা। ছায়া আর মশাল ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম........রাইফেলের আওয়াজ।

আবার বুঝি কেউ লুটিয়ে পড়লো। মিছিল থেমে নেই। এগিয়ে চলেছে ভিক্টোরিয়া পার্কের শহীদমিনারের দিকে। ছাত্রনেতারা মাইকে বলে চলেছে: কে কে মরতে চাও এগিয়ে এসো, মশাল হাতে এগিয়ে এসো। পুড়ে খাক ক'রে দাও জঙ্গী আয়ুবের সাধের তখত্। নবাবপুরের অলিগলি থেকেও শ'য়ে শ'য়ে ছেলে বেরিয়ে আসছে মশাল হাতে। পূর্ববাঙলার দামাল ছেলেমেয়েদের অভূতপূর্ব মশাল শোভা-যাত্রা দেখতে দু'ধারের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে হাজার হাজার মানুষ। কারফিউ অমান্য ক'রে, মৃত্যুর পরোয়া না ক'রে এতো লোককে

মশাল হাতে বেরিয়ে পড়ছে কে কবে দেখেছে! মিছিলের সামনেটা এসে পৌঁছল নবাবপুর রোডের মাঝামাঝি। এখানেই ১৯৩১ সালে বিপ্লবী সরোজ গুহ আর রমেন ভৌমিকের রিভলভারের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ডুনো। কপাল ভালো বেঁচে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু আর-এক মুহূর্তও থাকতে ভরসা পান নি; চলে গিয়েছিলেন বিলেত। স্লোগান চলছে: 'জেলের তালা ভাঙব, রাজবন্দীদের আনব', 'কুর্মিটোলা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব', 'জেলের তালা ভাঙব, মণি সিংকে আনব', 'ডক্টর জোহাকে মারল কে আয়ুব-মনেম, আবার কে?' 'খুনেদের বিচার চাই', ইত্যাদি।

আবার আওয়াজ পেলাম টাট্-টাট্-টাট্……। বোধ হয় মর্টার চালিয়েছে। জানি না কতো মানুষ লুটিয়ে পড়েছে রাস্তায়; তবু এগিয়ে চলেছে মশাল-মিছিল। এমন নির্ভীক মিছিলের কথা কে কবে শুনেছে! ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে গিয়ে পৌঁছল জনতা। সিপাহীযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা, তাদের স্মরণে সৌধ নির্মাণ হ'য়েছে এখানে। পাথরের গায় মশালের লকলকে শিখাগুলো জ্বলছে, নড়ছে, প্রতিফলিত হ'য়ে অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রেছে। শহরের দুই প্রান্তে দুই শহীদমিনার থেকে ঢাকার ছাত্ররা সংগ্রামের শপথ নেয়; প্রেরণা পায়। শহীদবেদীতে উঠে মাইক হাতে তোফায়েল বলে চলেছে: ভাইসব, আমাদের এই ঐতিহাসিক মশাল-শোভাযাত্রার বহু যাত্রীই পেছনে রয়ে গেছে; লুটিয়ে পড়েছে বুলেটের গুলিতে। ঢাকার পথ আজ আবার শহীদের রক্তে স্নান হ'লো। এমন ক'রে রক্ত দেওয়া কে কবে দেখেছে? আয়ুব-মোনেম দেখুক, আমরা ওদের রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না, ভয় পাই না বুলেট আর বেঅনেটে। মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য। পথ আমাদের রুখবে কে? আজকের এই ঐতিহাসিক মশাল শোভাযাত্রা দেখে আয়ুবের বশংবদরা ভীত সচকিত হ'য়ে আশ্রয় নিচ্ছে মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্টে। আসুন, শ'য়ে শ'য়ে শহীদের তাজা রক্তের তিলক প'রে আজ আমরা শপথ নিই:

আয়ুব-মোনেমের সুখের প্রাসাদ ছারখার ক'রে দেব মশালের আগুনে, টেনে নামাব তাঁদের পাকিস্তানের তখত্ থেকে। এ-দেশ আমাদের—তুরখাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাড়ে এগারো কোটি মানুষের। দাবি আমাদের আদায় ক'রবই, জালিম আয়ুবকে গদী থেকে টেনে নামাবই। শহীদ-দিবসের আগের রাত্রে আবার আমরা মশাল শোভাযাত্রা বের ক'রব। লক্ষ হাতে জ্বলবে সেদিন সর্বনাশা মশাল।' বেদী থেকে নেমে এলো তোফায়েল।

রাত তখন তিনটে।

মশালের আগুন ততক্ষণে ক্ষীণ-প্রায় হ'য়ে নিভতে সুরু ক'রেছে।

নবাবপুর রোড নিঝুম হ'য়ে পড়েছে। কুয়াসা জমেছে গাঢ় হয়ে। একটু দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডি. আই. টি বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে টুয়েন বি সার্কুলার রোড হ'য়ে অফিসে এসে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি, আতাউস সামাদ, মতিউর রহমান ওরা সবাইও এসে গেছে। ওদের কাছে শুনলাম আজকের সংগ্রামের আরো কাহিনী। নাখলি-পাড়া, মালিবাগ, চৌধুরী পাড়া, খিলগাঁও, নওয়াবগঞ্জ, রাজপুরা, হাতির পুল এলাকায়ও হাজার হাজার মানুষ মশাল হাতে বেরিয়ে পড়েছিল। ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট শব্দে গর্জে উঠেছে মেসিনগান। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বহু মানুষ। তবু তারা এগিয়ে গেছে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে। অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছে মতিউর। সময়মতো শুয়ে না পড়লে মেসিনগানের গুলিতে দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে যেত।

কতো মানুষ যে আজ মরেছে জানি না। জানি না কতো মায়ের বুক ভেঙেছে! কতো মায়ের আর্ত চীৎকারে আজকের রাতটা হাহাকার ক'রে উঠেছে জানি না। ফোন ক'রলাম, সরকারি সূত্র থেকে হিসাব পেলাম না। মিডফোর্ড আর মেডিকেল কলেজে ফোন ক'রলাম। ওরা জানাল, বুলেটবিদ্ধ হ'য়ে লোক এসেছে অনেক, এখনো আসছে; সংখ্যা বলতে পারব না।

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি, বেডে বেডে, মেঝেয়,

বারান্দায়—সর্বত্র বীভৎস দৃশ্য। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেহগুলো অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁতরাচ্ছে। নার্স আর ডাক্তাররা ছুটোছুটি ক'রছে গুলিবিদ্ধ মানুষদের বাঁচাতে, ব্যথা উপশম ক'রতে। মায়ের স্নেহ, বোনের স্নেহ দিয়ে যত্ন ক'রে চলেছে আহতদের। কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হ'য়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য। একমুখ উৎকণ্ঠা আর জ্বালা নিয়ে বহু লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কতো মা বাবা আহতদের তালিকায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের সেলিম আক্তার সিরাজ শাহজাহানকে। সেই যে মশাল নিয়ে বেরিয়েছিল তারা আর ফেরে নি! ডুকরে ডুকরে কাঁদছে কতোজনা।

হাসপাতালের সূত্রে জানিয়েছে মারা গেছে ৩০ জনের মতো, আহত হ'য়েছে ক'য়েক শ মানুষ। জানি, সঠিক হিসেব এটা নয়; আহত আর নিহতের সংখ্যা হয়তো এর দশগুণ কি তারও বেশি হবে। অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। অনেকের কথা হয়তো কোনোদিনই জানতে পারব না।

দুপুরে বাসায় গিয়ে খবর পেলাম আতোয়ারের হাতে গুলি লেগেছে কাল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে; বুলেটের গুলিতে হাতের খানিকটা ছড়ে গেছে শুধু। গিয়ে দেখলাম, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়েই শ্রমিকদের সঙ্গে দরবার ক'রছে। যেতেই বলল, ব'স্। তিরস্কার করব ক কী বলব ভেবে পেলাম না। নীরবে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে চলে এলাম।

সেদিনও মালিবাগ— খিলগাঁও এলাকায় কারফিউ অমান্য ক'রে বিশাল ছাত্র আর শ্রমিক-জনতা শোভযাত্রা বের ক'রল। মিছিল গত রাত্রের গুলি-বর্ষণে হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানায়, দাবি জানায় কারফিউ আর সেনাবাহিনী তুলে নেওয়ার। কিন্তু জবাবে পেল বুলেট। আবার অনেকে মরল; আহত হ'লো বহু লোক।

খবর এল টেলিপ্রিন্টারে। কুষ্টিয়ায় ডক্টর শামসুজ্জোহাকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ জাগাতে গিয়েছিল জনতা, পুলিস গুড়ি ছুড়েছে। একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। নোয়াখালিতেও গুলি চলেছে। মারা গেছে ৩ জন। আহত হ'য়েছে অনেকে। রাজশাহীতে নিহত হ'য়েছে বারো বছরের একজন ছাত্র; আহত হ'য়েছে কয়েকজন। সেনাবাহিনী তলব ক'রেছে সেখানে।

২০ ফেব্রুয়ারি।

কয়েকদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কারফিউ চলেছে। মাঝে দু-এক ঘণ্টার বিরতি অবশ্য ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে আজই যা-একটু বেশি সময়ের বিরতি আছে। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিরতি। হঠাৎ বারোটার দিকে দেখলাম দোকান-পাট ঝটাঝট্ বন্ধ হ'তে সুরু হ'য়েছে। সাধারণ মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে গৃহে। বারোটা থেকে নাকি কারফিউ জারি হ'চ্ছে। প্রেসক্লাব থেকে ডি. সি.র কন্ট্রোল রুমে ফোন ক'রলাম। ওরা জানাল, ওটা গুজব। পাঁচটা থেকেই কারফিউ সুরু হবে। এদিকে রিক্সায় মাইক বসিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ছাত্ররা সন্ধ্যের সময় কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে মশাল নিয়ে উপস্থিত থাকার ডাক দিচ্ছে। কথার ফুল্‌কিতে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে শিরায় শিরায়।

বিকেল চারটে থেকেই মশাল আর প্ল্যাকার্ড হাতে বেরিয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কমলাপুর, খিলগাঁও, মালিবাগ, তেজগাঁ, সারা ঢাকা শহরের লেন-বাইলেন থেকে বেরিয়ে আসছে খণ্ড খণ্ড মিছিল। কণ্ঠে স্লোগান। দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েছে পোস্টার; অসংখ্য পোস্টার। প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মিছিলের পর মিছিল। মনে হচ্ছে:

এখন 'একটাই রঙ—লাল
একটাই সংগীত—স্লোগান

একটাই হাত—মিছিল
একটাই কাগজ—পোস্টার।
একটাই রঙ—লাল।

যখন এদেশের মানুষের হাসিগুলো
শুকিয়ে কান্নায় বিবর্তিত,
যখন এদেশের মানুষের সুরেলা কণ্ঠগুলো
আর্ত চীৎকারে রূপান্তরিত,—
তখন একটা 'রঙিন ল্যাণ্ডস্কেপ' থেকে
বিক্ষুব্ধ মানুষেরা বলে,
'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচতে চাই ;
বলে—এদেশ আমার
এ মাটি আমার—এর প্রতিটি ধূলিকণা
আমার রক্তের সাথে জড়িত।

তাই,
এ-রূপময়ী দেশের মানুষের কণ্ঠে আজ অধিকারের দাবি :
লড়াইয়ের মাঠে হারজিত আছে
থামবো কেন তা' বলে ?

পোস্টার পোস্টার পোস্টার
মিছিল মিছিল মিছিল
জনতা জনতা জনতা!'

এগিয়ে গেলাম শহীদমিনারের দিকে। মিলিয়ে দিলাম নিজেদের হাজারো মানুষের ভিড়ে। সঙ্গে শাহাবউদ্দীনও ছিল। ইউনিভার্সিটির কাছে পৌঁছতেই দেখলাম শুধু মানুষ আর মানুষ, প্ল্যাকার্ড আর প্ল্যাকার্ড। মশাল তখনো জ্বলে নি। লক্ষ মশাল জ্বলে উঠলে রমনার বুকে আজ কী দৃশ্যের সৃষ্টি হবে তাই ভাবছি। কোনোমতে

জনতার ফাঁক গলে বিসর্পিল পথে এগিয়ে চললাম শহীদমিনারের কাছে। শীতের সন্ধ্যা। ছায়া-ছায়া হ'য়ে এসেছে পাঁচটার মধ্যেই। গাছে গাছে শোনা যাচ্ছে পাখির চিক্‌চিক্‌ চিড়িক চিড়িক, আর ডানা ঝাপটানির শব্দ। শহীদমিনারে দাঁড়িয়ে প্রথম মশাল জ্বালাল তোফায়েল। একে একে সাইফুদ্দিন, জামাল হায়দার, মাহবুবুল্লাহ্‌, আনোয়ার হায়দার—সকলে। জ্বলে উঠছে একটার পর একটা মশাল। অন্ধকার ফুটে অসংখ্য আলোর বিন্দু জেগে উঠল। এ্যাসেম্‌বলি হাউসের শেষ মাথা থেকে ইউনিভারসিটি ছাড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলাম আলোর ফুট্‌কিগুলো ক্রমশ শিখা হ'লো—আঁকাবাঁকা আগুনের রেখাগুলো বড়ো হ'তে হ'তে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। লক্ষ মশালের আলোয় দূর হ'য়ে গেল অমানিশা, লালে লাল হ'য়ে উঠল রমনা। সকলের চোখে মুখে আগুনের শিখাগুলো থিরথির ক'রে কাঁপছে। মনে হ'চ্ছে রক্ত ফেটে পড়ছে লক্ষ মানুষের মুখ থেকে। হিমেল বাতাস বইছে। কিন্তু বাতাসটা আর ঠাণ্ডা লাগছে না। মশালের আগুনে তেতে উঠেছে শরীর। শহীদমিনারের একেবারে কাছটিতে চলে এলাম। দেখলাম, আতোয়ারের হাতে জ্বলছে মশাল। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আলো। আমি আর শাহাবউদ্দীন এগিয়ে গেলাম। এমন সময় খবর ছড়িয়ে পড়ল কারফিউ তুলে নিয়েছে। মুজিবর রহমানকেও নাকি ছেড়ে দেবে। ছাত্রনেতারা মাইকে ঘোষণা ক'রল সে-কথা। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। লক্ষ কণ্ঠের গর্জনে রমনার রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল। স্লোগান উঠল :

'শেখ মুজিবকে এনেছি
জেলের তালা ভেঙেছি।'
জেলের তালা ভাঙব,
মণি সিংকে আনব।'

'জেলের তালা ভাঙব,
মতিয়া চৌধুরীকে আনব।'
'রাজবন্দীদের আনব
জেলের তালা ভাঙব।'
'কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ!'

শহীদবেদী থেকে মাইকে তোফায়েলের কণ্ঠ ভেসে এলো: 'এ-জয় আপনার, আমার, সকলের জয়। ঝিলাম-চেনাব-রাভী নদীর দেশ থেকে কর্ণফুলি-পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গার দেশের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে; বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে; কণ্ঠে ধ্বনিছে জয়ের গান। আয়ুব-মোনেম-মুসার সাধ্য নেই জনতার সেই কণ্ঠ স্তব্ধ ক'রে দেয়। ওদের বেঅনেট ভোঁতা হ'য়ে গেছে। বুলেট ছুড়তে হাত কেঁপে উঠছে। ওরা আজ কোটি কোটি জনতার ক্রুদ্ধ গর্জনে ভীত, সচকিত। জয় আমাদের হবেই হবে। পথ আমাদের রুখবে কে? এগিয়ে চলুন—এগিয়ে চলুন—এগিয়ে চলার ডাক এসেছে।'

এগিয়ে চলে লাখো মশালবাহী ছাত্রজনতার মিছিল নিউ মার্কেটের দিকে। কণ্ঠে স্লোগান। পথের দুধারে জমেছে হাজার হাজার মানুষ। ছাত্রদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় তারাও। মিছিল এগিয়ে চলে সেন্ট্রাল লাইব্রেরী বাঁয়ে ফেলে শাহাবাগ হোটেলের দিকে। পেরিয়ে গেলাম আর্টস্ কলেজ। আমাদের চারজনের মধ্যে একমাত্র আতোয়ারের হাতেই মশাল। আতোয়ারের কাছ থেকে একে একে মশাল তুলে নিল আলো, শাহাবুদ্দিন। শাহাবাগ হোটেল বাঁয়ে ফেলে ঢাকা ক্লাবের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে মিছিল। শাহাবাগের বারান্দায় নানান্ দেশের লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছে অভূতপূর্ব মশাল-মিছিল। সামনের বড়ো ফোয়ারাটা লাল হয়ে গেছে। রেসকোর্সের পাশের সদা ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাটা আগুনের আলোয় আলোকিত ক'রে এগিয়ে চলল মিছিল।

তোপখানা হ'য়ে কার্জন হলের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। শাহাবউদ্দীনের হাত থেকে মশালটা এবারে তুলে নিলাম আমি। আজকের এই মহান মশাল-মিছিলের শরিক হ'তে না পারার মতো দুঃখ থাকত না কিছুই। মিছিল গিয়ে আবার পৌছল কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে। মাইকে তোফায়েল ঘোষণা করল: 'এ মিছিল একুশের প্রস্তুতি মিছিল। অমর একুশের প্রত্যুষে আবার আমরা মিলব, গান গাইব, ফুল দেব শহীদদের মাজারে, মিনারে।'

নিভতে সুরু ক'রল মশালের আলো। ছায়া-ছায়া থেকে ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল রমনা। ঠিক হ'লো, খুব ভোরে প্রেসক্লাবে এসে মিলব আমরা। প্রজেশকেও খবর দিতে বললাম।

অফিসে ফিরে টাইপরাইটার নিয়ে বসলাম। হাত চলছে আজ দ্রুত।

তখনো ভোরের আলো ফোটে নি; কাটে নি কুয়াসা। হাজারো মিছিলের হাজারো কণ্ঠের গানে জেগে উঠল সারাটা শহর। ঘুম-ভাঙা মানুষেরাও চোখ রগড়ে খালি পায়ে নেমে এলো রাস্তায়। একুশের ডাকে কি ঘরে বসে থাকা যায়! 'ভুলি নাই আমার ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো একুশে ফেবরুয়ারি' গানটি শীতের সকালেও সারা শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে; দোলা দিচ্ছে রক্তে।

একই লক্ষ্যে চলেছে একটার পর একটা মিছিল। চলেছে আজিমপুর গোরস্তানে; বরকত-সালাম-রফিক যেখানে ঘুমিয়ে আছে। লক্ষ মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ফুল হ'য়ে ঝরবে আজ তাদের মাজারে। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষ শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে মিনারে মিনারে দেবে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বুকে কালো ব্যাজ, হাতে কালো ব্যাণ্ড এঁটে খালি পায়ে চলেছে হাজারো মানুষের হাজারো মিছিল। মেয়েরা পরেছে চওড়া কালোপাড় শাড়ি, হাতে ফুলের

সাজি। কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক আইনজীবি কেউ বাদ নেই। সবাই এগিয়ে চলেছে সেই মহাতীর্থে। মনে হ'চ্ছে :

'চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা
নানান মুখীন্ হাজার লোকের
একত্র অস্তিত্ব
একুশে ফেবরুয়ারি।'

মনে হ'চ্ছে গত কয়েক সপ্তাহে—

'শহরে যাদের মৃত্যু হ'য়েছে
ফিরে আসছে, ফিরে আসছে,
হাজারে হাজারে মিছিল ক'রে।'

প্রেসক্লাব থেকে নেমে এলাম পথে। আমি, আতোয়ার, আলো, শাহাবউদ্দীন, প্রজেশ। হাতে ফুল। রক্ত গোলাপ। গানে গানে মুখরিত মিছিলের ভিড়ে মিশে গেলাম আমরা। গান চলেছে একটার পর একটা: 'আমার সোনার বাঙলা তোমায় ভালো বেসেছি', 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা,' 'রক্ত রাঙানো একুশে ফেবরুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি', 'জাগো বাঙালী জাগো', ইত্যাদি। গানের সুরে সুরে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। পুব আকাশে আলো ফুটি-ফুটি ক'রছে; পাখিরা ডানা মেলেছে আকাশে। একুশের লাল বড়ো সূর্যটা উঠবে একটু পর; বয়ে আনবে বজ্রকঠিন শপথের বাণী।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম আজিমপুর গোরস্তানের দিকে। ফুলে ফুলে পাহাড় হ'য়ে উঠেছে মাজারটা, কতো মানুষ আসছে যাচ্ছে কে জানে। ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলাম মাজারে। মাজার জিয়ারত ক'রে আতোয়ার হাতের রক্ত গোলাপগুলো ছড়িয়ে দিল পরম যত্নে। একুশের সূর্যটা উঠে গেছে; কেটে গেছে কুয়াসা। লাল আলো এসে পড়েছে মাজারে। এগিয়ে গেল আলো, গেলাম

আমি, গেল শাহাউদ্দীন, গেল প্রজেশ। মাজারে ফুল ছড়িয়ে দিতে দিতে মনে হ'লো সার্থক হ'লো আজকের প্রভাত। মনটা ভরে উঠল তৃপ্তিতে, বাঙালা ভাষার জন্যে এমনি এক দিনে রমনার পিচঢালা কালো পথে যারা রক্ত ঢেলে দিয়ে ছিল তাদের অর্ঘ্য দেওয়া হ'লো সারা।

সেখান থেকে গেলাম কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে। শহীদমিনারের এপাশে-ওপাশে চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল মানুষ আর মানুষ। দেড়লক্ষ-দুলক্ষ-আড়াইলক্ষ—কতো মানুষ জানি না! মাথা উঁচিয়ে রয়েছে হাজার হাজার ফেস্টুন। তাতে লেখা: 'একুশে ফেবরুয়ারি অমর হোক', 'আমার ভাষা তোমার ভাষা বাংলাভাষা,' 'সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু কর,' 'বাংলাভাষার ওপর হামলা বরদাশত্ ক'রব না,' 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই', '১১-দফার প্রশ্নে আপোস নাই, আপোস নাই', 'সংগ্রাম চলছে, চলবে', ইত্যাদি। এক জায়গায় দেখলাম একদল মেয়ে একটা ব্যানার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার কয়েকটা লাইন: আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাঙলার, হয়তো মানুষ নয়—হয়তো-বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে।

শহীদমিনারের বেদীতে উঠে দাঁড়িয়েছে একজন ছেলে। নাম বলল, আল-আজাদ। গলায় আবেগ ঢেলে আবৃত্তি ক'রে চলেছে নিজেরই লেখা একটা কবিতা। তার থরো থরো কথার তরঙ্গ মাইকে ছড়িয়ে পড়ছে ভোরের আকাশে:

যে-ভাষায় আমরা কাঁদি, হাসি
যে-ভাষায় আমরা ভালোবাসি
যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথের
যে-ভাষা নজরুলের
যে-ভাষা মায়ের
যে-ভাষা ভাইয়ের

যে-ভাষা বোনের
যে-ভাষা জীবনের
যে-ভাষা গানের
যে-ভাষা বাঙালীর,
যে-ভাষা জন্মভূমির,
বলো মা, এমন সুন্দর মধুর ভাষা,
কেউ কি জীবন থাকতে ছাড়তে পারে ?
স্বর্গীয় সম্পদ ! 'মা মণি আমার,
তোমার এ দুষ্টু ছেলের প্রতি
রাগ ক'রো না, কেমন।
মাত্র তো ক'টা দিন....।

নারকেলের নাড়ু নষ্ট হ'য়ে গেছে
আচার-মোরব্বা ফুরিয়ে গেলো
পাটালিগুড়-মুড়কি-মুড়ি শেষ হ'য়ে এলো।
পিঠা আর তৈরি করা হ'লো না।

'যাদু আমার এলি ?'
কাঁদতে কাঁদতে
ঝাপসা চোখে মা তাকায়,
উঠোনে পেয়ারাগাছটার তলায়—
যেখানে ছেলের পরেত,
স্বাপদ-শকুনিরা হিংস্র আঁচড়ে
বিদারণ ক'রে নারকীয় মউজে ;
এ যেন পলাশের সবুজ সমুদ্রে
সূর্য-স্নাত রক্তের গান।'
ভাবছি এতো শুধু রফিক-জাব্বার-বরকত-শফিকুরের কথা নয়,

আলাউদ্দীন, মণিরুল ইসলাম, আসাদুজ্জামানেরও যে এই কথাই ছিল। আল-আজাদের কথার সুর শিরায় শিরায় উন্মাদনার জ্বালা ছড়ালো। ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা-ধরানো কান্নায় উথলে উঠছে। দেখলাম, আলোর দু'চোখের কোণে সোনার কুচির মতো কয়েক কুচি জল চিক চিক ক'রছে।

সাইফুদ্দীন আহাম্মদ মাণিক উঠে দাঁড়ালো মাইকের সামনে। বুকের অনেক জ্বালা ভাষা হ'য়ে মাইকে মাইকে ছড়িয়ে পড়ল একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ঃ 'আজ আমাদের শপথ নেবার দিন। শপথ নিতে হবে বরকত-সালাম-শফিক-রফিক-জাব্বারের নামে, শপথ নিতে আলাউদ্দীন-মণিরুলইসলাম-আসাদুজ্জামান-সামসুজ্জোহার নামে। বাঙলার বিরুদ্ধে, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যারা আপোস নেই তাদের সঙ্গে। পূর্ববাঙলার সংগ্রামী ছাত্রদের রুদ্ররোষ ছারখার ক'রে দেবে বাংলাভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা যাদের। একদিন আমাদের ন্যায্য দাবির কাছে মাথা নোয়াতে হ'য়েছিল মুসলিমলীগ সরকারকে, নোয়াতে হ'য়েছে আজ আয়ুবকে। আজ মোটরগাড়ি-বাস-লরি-রিকসায় বাংলায় নম্বর পড়েছে, টেলিগ্রাম লেখা চলছে বাংলায়, নোটেও বাংলা লিখতে বাধ্য হ'য়েছেন আয়ুব। কিন্তু এখনো সর্বস্তরে বাংলা চালু হয় নি। ব্যাঙ্কের চেক এখনো বাংলায় হয় নি। আজকে সেটাই হবে আমাদের স্লোগান। স্লোগান তুলতে হবে, এগারোদফা দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। আয়ুব জরুরি আইন তুলে নিয়েছেন, কয়েকজন রাজবন্দীকে মুক্তিও দিয়েছেন, রাজী হ'য়েছেন বিরোধীদলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেও। কিন্তু এই জয়ে উল্লসিত হ'লে চলবে না। চালিয়ে যেতে হবে ১১-দফার সংগ্রাম। জানি, তার জন্য দিতে হবে আরও রক্ত। কিন্তু জয় আমাদের হবেই। সাড়ে এগারো কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ ক'রে দেবার ক্ষমতা কারু নেই। এগারোদফা শুধু ছাত্রদের দাবি নয়, এ-দাবি কৃষক-শ্রমিক—সকল শোষিত

মানুষের দাবি, ১১-দফা শুধু স্বায়ত্তশাসন আর ভোটাধিকারের দাবিই নয়। এতে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিও রয়েছে; রয়েছে ব্যাঙ্ক-বীমা-পাটব্যবসা সহ সব পুঁজি জাতীয়করণ, শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়নের অধিকার দান, কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার দাবি; দাবি মার্কিনী যুদ্ধজোট বাতিল করার এবং ছাত্রদের গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার।

শোনা যাচ্ছে, পূর্বপাকিস্তান থেকে একজনকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ক'রে আমাদের আন্দোলন বানচাল ক'রবার চেষ্টা চলছে। আমরা নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই, ১১-দফার প্রশ্নে যিনি আপোস ক'রবেন, দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবেন তাঁর ক্ষমা নেই। ঢাকা বিমানবন্দরে নামতে দেব না তাঁকে। আপনারা আওয়াজ তুলুন, এগারোদফার প্রশ্নে আপোস করা চলবে না।'

মুহূর্তে গর্জে উঠল লাখো জনতা: আপোস করা চলবে।

তোফায়েল উঠে দাঁড়াল। মাইকের স্টাণ্ডটাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে তাকালো অগণিত মানুষের দিকে। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য আয়ুব-মোনেম লেলিয়ে দিচ্ছে সৈন্যদের। আমরা তাঁদের হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই, এ-অবস্থার অবসান না হ'লে ছাত্ররাও অস্ত্র তুলে নেবে হাতে। শুনছি, মার্শাল জারির ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা তা কখনোই বরদাশ্‌ত ক'রব না। সংগ্রাম আরও তীব্র হ'য়ে উঠবে। খুনীদের সঙ্গে কোনো আপোস নেই—আপোস নেই ১১-দফার প্রশ্নে। আজ আপনারা শহীদের নামে শপথ নিন, হাত তুলে বলুন: সংগ্রাম চলছে—চলবে।'

মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ হাত ওপরে উঠল; সাইক্লোনের মতো গর্জন ক'রে শপথ নিল এগিয়ে চলার।

সভাশেষে দিকে দিকে এগিয়ে চলল মিছিল। জিন্নাহ্‌ এভিনিউর দোকানগুলোর ইংরেজি-উর্দু সাইনবোর্ড টেনে নামাল মাটিতে; লেপ্টে দিল আলকাতরায়। প্রেসক্লাবে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একদল ছাত্র

'ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সারভিস' লেখাটা টেনে নামাল। পুঁতে দিল সেখানটায় কালোপতাকা। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত হলগুলোর ফলক তুলে নতুন নামকরণ ক'রল। কোনো হলের নাম দিল 'শহীদ সূর্য সেন', কোনোটার নাম 'ক্ষুদিরাম'। 'আয়ুব গেটের' নামফলক তুলে লিখল 'শেরেবাঙলা গেট'। 'আয়ুব-নগর' হ'লো 'শেরে বাঙালা নগর'।

রাত্রে অফিসে খবর পেলাম, পাবনার সুজানগরে থানাতে কালো-পতাকা তুলতে গিয়েছিল ছাত্ররা, গুলি চালিয়েছে পুলিশ। ২ জন শহীদ হ'য়েছে। শহীদ-স্মরণে খুলনায় ছাত্ররা মিছিল বের ক'রেছিল, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আর কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুরের গৃহে কালোপতাকা তুলতে গিয়েছিল, গুলি চালিয়েছে পুলিশ। ৮ জন ছাত্র শহীদ হ'য়েছে; আহত হ'য়েছে ২৯ জন। ভীষণ আক্রোশে একজন পুলিশকে ছাত্ররা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। খবর এলো আরও অনেক জায়গা থেকে। থানায় থানায় ছাত্ররা তুলেছে কালোপতাকা। হাজার হাজার ছাত্রের আক্রমণে প্রশাসন অচল হ'য়ে পড়ছে। মফস্বল শহরের থানাগুলো কার্যত চলে গেল ছাত্রদের হাতে। ছাত্ররা জোতদার আর খুনেদের আগুনে পুড়িয়ে মারল, ফাঁসি দিল অনেককে।

বজ্রনিনাদে কম্পিত আজি শহর নগর গ্রাম—সংগ্রাম-সংগ্রাম!

বিকেলে দু'লক্ষ মানুষের সামনে ৩ মার্চ হরতালের ডাক দিল ছাত্ররা।

সন্ধ্যের সময় এক বিশেষ বেতারভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা ক'রলেন, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবেন না।

পরদিন দুপুরের সংবাদে হঠাৎ ঘোষণা করা হ'লো: আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলা তুলে নেওয়া হ'য়েছে, আওয়ামীলীগনেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা কুর্মিটোলা সামরিক হেফাজত থেকে

মুক্তি পেয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছেন। মুক্তি পেয়েছে অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী আর রাশেদ খান মেনন। সন্ধ্যের পর মণি সিংকে মুক্তি দেওয়া হবে। মুক্তি দেওয়া হবে অন্যান্য রাজবন্দীদের।

বিদ্যুৎ বেগে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। উল্লাসে ফেটে পড়ল সারা দেশের মানুষ। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় বাজি পুড়ল, আকাশে লাল নীল সবুজ নানারঙের গ্যাস বেলুন উড়ল। প্রকৃতিতেও সেই সময়টায় পড়ে গেছে আনন্দের সাড়া। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। ফাগুয়া চলল। পাড়ায় পাড়ায় চলল লাল রঙে হোলি খেলা। জনতার স্রোত চলেছে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডীর বাসায়; এগিয়ে চলেছে রেসকোর্সের ময়দানে। সংবর্ধনা-সভায় একক-দশক-শতক নয়, অজুত লক্ষ জনতা এসে হাজির হ'য়েছে। মুখে নতুন ফাগুয়ার নতুন গান:

জেলের তালা ভেঙেছি,
শেখ মুজিবকে এনেছি,
জেলের তালা ভেঙেছি,
রাজবন্দীদের এনেছি।
মতিয়া-রাশেদকে এনেছি,
জেলের তালা ভেঙেছি।
জেলের তালা ভাঙব,
মনি সিংকে আনব।

রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনার উত্তরে শেখ মুজিব বললেন, আপনারা আমায় ভালোবাসেন, আমি যেন সব সময় আপনাদের ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারি—এই আমার একমাত্র কামনা। গোলটেবিলে যাচ্ছি এগারোদফার দাবি নিয়ে। এগারোদফার প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। মুহুর্মুহু করতালির ভিতরে উঠে দাঁড়াল মতিয়া এবং অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা। সভা শেষে বিরাট জনতা চলল জেলগেটের দিকে। কণ্ঠে তাদের সাত সাগর

জেল বন্দীর গর্জন : 'জেলের তালা ভেঙেছি, রাজবন্দীদের এনেছি', 'জেলের তালা ভাঙব, রাজবন্দীদের আনব'।

রাত আটটায় বেরিয়ে এলেন মণি সিং। মতিয়া প্রথম ফুলের মালা পরিয়ে দিল তাঁর কণ্ঠে। উল্লাসে ফেটে প'ড়ছে জনতা। রাতের তারাভরা আকাশে উড়ল রঙবেরঙের হাউই।

একদিন মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকদের ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, ময়মনসিং-এর টংক ও নানকার কৃষক-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; বৃটিশ-সরকারের মনে ত্রাস ধরিয়ে দিয়েছিলেন যিনি, পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেছে যাঁকে ধরতে, কৃষকদের সেই প্রাণের মণি মহারাজ ছাত্র-শ্রমিক সাধারণ মানুষের হৃদয়েও যে কতোখানি জায়গা জুড়ে র'য়েছেন দেখলাম।

জেলগেটের বাইরে বেরিয়ে সেই লক্ষ জনতার উল্লাসধ্বনি শুনে পঁচাত্তর বৎসর বয়সের নেতা মণি মহারাজ কথা বলতে পারছিলেন না। আবেগে কাঁপছিল তাঁর কণ্ঠ। শুধু বললেন, 'আমার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন গণ-অভ্যুত্থান আমি আর কখনো দেখি নি। আয়ুব-মোনেম আজীবন আমাদের আটকে রাখতে চেয়েছিল। পারে নি। এ জয় আপনাদের সংগ্রামের জয়।'

মিছিল চলল শহীদমিনারে। ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে মণি মহারাজ; গলায় মালা। দুপাশে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে জামাল হায়দার, সাইফুদ্দীন প্রমুখ ছাত্রনেতারা। জনতার কণ্ঠে চলেছে ধ্বনি : মণি সিংকে এনেছি, জেলের তালা ভেঙেছি, জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি, ইত্যাদি।

পাড়ায় পাড়ায় গভীর রাত পর্যন্ত চলল সেই বিজয়োল্লাস।

শেখ মুজিব পরদিন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে পিণ্ডি রওনা হ'লেন। সঙ্গে গেল নারায়ণগঞ্জের মোস্তফা সারওয়ার। শেখ মুজিব গত রাতেই সাক্ষাৎ ক'রেছেন, জেড. এ. ভুট্টো, আসগর খান, আজম খান, সাবেক বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ এবং মৌলানা

ভাসানীর সঙ্গে। সমস্ত নেতা আজ এগারোদফার পতাকা তলে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাইতো আন্দোলন হ'য়ে উঠেছে এতো দুর্বার। প্রেসিডেন্টের ডাকে মোনেম খানও ছুটে গেলেন পিণ্ডি। রাস্তায় বেরুতে সাহস পেলেন না। ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টার এসে তুলে নিল তাঁকে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামপরিষদের ডাকে ৩ মার্চ সারা পূর্বপাকিস্তানে হরতাল হ'লো। থানায় থানায় ছাত্ররা তুলল কালোপতাকা। একটাও গাড়ি বেরুল না রাস্তায়। খুলনাতে বাস বের ক'রেছিল একজন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে তাকে ছাত্ররা! কেউ খুলতে সাহস পায় নি; পুলিশও না। ছাত্রদের ডাকে রোজ শ'য়ে শ'য়ে বুনিয়াদী গণতন্ত্রী পদত্যাগ ক'রে চলেছে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে আয়ুবের সাম্রাজ্য। জোতদার আর সমাজবিরোধীদের ছাত্ররা চাবুক মারল, আটক ক'রল। মধুর ক্যান্টিন থেকে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের কড়া নির্দেশ গেল গ্রামে গ্রামে বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় ছাত্ররা গাড়ি-ঘোড়া যেন না চড়ে, চাঁদা আদায়ের নামে জবরদস্তি না করে, ধান চাউল না পোড়ায়, নিরীহ লোকের ওপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার না ক'রে। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ ছাড়া আটক ব্যক্তিদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। শ্রমিক ধর্মঘট হ'চ্ছে—ছুটে যাচ্ছে তোফায়েল সাইফুদ্দিন। ন্যায়সঙ্গত চুক্তিতে মিটিয়ে দিচ্ছে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ। বলতে গেলে, তোফায়েল এ্যাকটিং গভনর হ'য়ে পড়েছে। তোফায়েল সাইফুদ্দিন জামাল হায়দরের নির্দেশে চলেছে থানা-পুলিশ-সরকারি অফিস। ভেঙে পড়েছে সরকারি প্রশাসন।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হ'লো। আয়ুব মেনে নিলেন না

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। কয়েকজন ডাক-নেতা বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছেন। ছাত্ররা রুদ্ধ রোষে গর্জন ক'রে উঠল—বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা নেই। ক্ষমা নেই চৌধুরি মহম্মদ আলী আর ফরিদ আহম্মদের। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি—মৃত্যু।

চৌধুরি মহম্মদ আলী ফরিদ আহম্মদ প্রমুখ কয়েকজন নেতা ঢাকা ফিরতে সাহস পেলেন না—সাহস পেলেন না পূর্ববাঙলার মাটিতে নামতে।

সোয়ালটী হোটেলেই পেলাম চিঠিটা। শাহাবউদ্দীন লিখেছে। এক ট্রেড ডেলিগেশনের সঙ্গে নেপাল এসেছি। বেলকনিতে বসে পড়ছিলাম চিঠিটা। ধূসর আকাশটা ছিঁড়েখুঁড়ে কোথাও বেরিয়ে পড়েছে ফিকে নীল, কোথাও-বা রঙটা গাঢ়। কয়েকটা বেগুনী মেঘ দূরে পাইনগাছের মাথায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। আরো দূরে রোদে চিক্ চিক্ ক'রছে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরটা। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে সুরু ক'রলাম :

কল্হন,

জানি না এ চিঠি তোর কাছে পৌঁছবে কিনা। তবে ভরসা এই, নেপালগামী চিঠিতে সেনসরের কড়াকড়ি নেই ততটা। তুই নিশ্চয় জেনে গেছিস যে ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার মার্শাল জারি হ'য়েছে। আয়ুব গিয়ে এসেছেন ইয়াহিয়া খান। প্রতি মুহূর্তে জেলে যাওয়ার আশঙ্কা ক'রছি। আমার সেই আই. বি. বন্ধুর কাছে শুনেছি তুইও নিরাপদ না। আতোয়ার থাকলে তো সবার আগে তাকে নিয়ে জেলে পুরত। 'থাকলে' কথাটা শুনে নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিস।

আতোয়ারের কথা বলবার জন্যই তোকে এই চিঠি লিখছি। তুই তো জানিস, আমাদের মধ্যে আতোয়ারটা বরাবরই একরোখা। কয়েকদিন আগেই ঢাকায় শোনা যাচ্ছিল, দু-চার দিনের মধ্যেই মার্শাল ল জারি হ'চ্ছে। ২১ মার্চ খবর পেলাম করাচি থেকে সৈন্য বোঝাই হ'য়ে দু'টি জাহাজ পূর্বপাকিস্তানের দিকে রওনা দিয়েছে। চিটাগাং পোর্টে ভিড়বে সে-জাহাজ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। খবর পেয়ে তোফায়েল সাইফুদ্দিন ওরা মধুর ক্যান্টিনে বসে ঠিক ক'রল, পোর্টে সৈন্য নামতে দেবে না। আতোয়ারও সেদিন ছিল সেখানে। ও উত্তপ্ত বারুদের মতো বিস্ফারিত হ'লো

সেদিন। ওর প্রতিটি কথা ছাত্রনেতাদের রক্তের কণায় কণায় জ্বালা ধরিয়ে দিল। আতোয়ার বলল, রক্ত ঢেলেছি, আরও ঢালব। কিন্তু সৈন্য নামতে দেবো না। পূর্ববাঙলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষ বরদাশত্ করবে না সামরিক-শাসন। দাবি আমাদের মানতেই হবে।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ছাত্র আর শ্রমিক নেতাদের কাছে খবর গেল, পোর্টে মিলিটারি অবতরণ রোধ করো। আতোয়ারও গেল চট্টগ্রাম। যাবার আগের দিন আতোয়ার, আলো আর আমি মধুর ক্যান্টিন থেকে গিয়েছিলাম রমনা গার্ডেনে। অনেকক্ষণ বসেছিলাম চন্দ্রাকৃতি লেকের ধারে। কথাটা আমিই তুলেছিলাম। বলেছিলাম, আতোয়ার, আলো তো তোর যাত্রাপথের বাধা নয়, বরং ও পাশে থাকলে তুই পূর্ণতাই পাবি। আতোয়ার কিছুক্ষণ কথা বলল না। কী এক ভাবনায় তলিয়ে গেছে। আলোর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে চোখ ফেরাল ও। মৃদু বিষণ্ণকণ্ঠে আতোয়ারকে উদ্দেশ ক'রে আলো বলল, আমি তোমার বোঝা হ'তে চাই না। কখন কোথায় থাক, কেমন থাক এ খবরটা জানিয়ে মাঝে মাঝে একটা পোস্টকার্ড দিও। তাতেই আমি খুশী থাকব।

আলোর কথা শুনে এই প্রথম বারের মতো আতোয়ারকে কেমন যেন বিচলিত, দুর্বল মনে হ'লো। মৃদু জড়ানো গলায় বলল, চিটাগাং যাচ্ছি, যদি ঠেকাতে পারি মার্শাল ল, যদি ফিরে আসি তবে বিয়ে হবে। তারপর আলোর দিকে ফিরে বলল, জানি না আমার মতো ছন্নছাড়া তোমাকে সুখী ক'রতে পারবে কি না।

আলো কিছু বলল না। নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদল। প্রাণভরে কাঁদতে দিলাম ওকে। তুই তো জানিস, এ-কান্না কতো সুখের। প্রথম বসন্তের মৃদু উতল হাওয়ায় ওর পিঠে একরাশ চুলের কয়েক-গাছি কেঁপে কেঁপে উড়ে চলল।

ত্রিশ-চল্লিশ হাজার শ্রমিক আর ছাত্র নিয়ে আতোয়ার এগিয়ে

গেল পতাঙ্গার দিকে। আমিও গেলাম সঙ্গে। সৈন্যজাহাজ ভিড়তে দেবে না। কর্ণফুলির মোহনায় এসে গেছে তখন একটা জাহাজ। ঝড়ের রাতে ক্ষিপ্ত সাগরের মতো গর্জনে স্লোগান তুলল সেই বিশাল জনতা: 'দেবো না, দেবো না, সৈন্য নামতে দেবো না' সামরিক শাসন চলবে না চলবে না'। সারা চট্টগ্রাম শহর ভেঙে ছুটে আসছে জনতা। লাঠি চার্জ হ'লো। পুলিশ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না তাদের। হঠাৎ শোনা গেল, ই. পি. আর. বাহিনী এসে গেছে। চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলকে সচকিত ক'রে হঠাৎ গুড়ুম ক'রে আওয়াজ উঠল। না ই. পি. আর নয়, একজন পোর্ট-পুলিশ গুলি ছুড়েছে। গুলি এসে লাগল আতোয়ারের বুকে। পড়ে গেল ও মাটিতে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। পতাঙ্গার মাটি লাল হ'লো। মুমূর্ষু আতোয়ার জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল, 'তোমরা এগিয়ে যাও—খু-নে দে-র ক্ষমা ক-রো না। নামতে দিও না—' আতোয়ারের অবস্থা দেখে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছিল দু'জন শ্রমিক। আমার ভিতরটা হুহু ক'রে কেঁদে চলেছে। ধরাধরি ক'রে দ্রুত নিয়ে চললাম হাসপাতালে। রক্তে আমার সারা শরীর ভিজে গেল। হাসপাতালে যেতে পারলাম না, পথেই সব শেষ হ'য়ে গেল। ওর মুখে শেষ কথা ছিল: 'আলোকে—।' কী যেন বলতে চেয়েছিল, শেষ ক'রতে পারে নি।

গিয়েছিলাম দু'জনে, ফিরে এলাম একা। তোকে যখন এই চিঠি লিখছি, পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল। আলোর চিঠি। আতোয়ারের চিঠি না পেয়ে ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছে। আতোয়ারের খবর জানতে চেয়েছে। মার্শাল ল জারি হ'য়ে যাওয়ায় ওর মৃত্যু-সংবাদ পত্রিকায় আর ওঠে নি। সেনসরড্ করা হ'য়েছে। না হ'লে আলো এতো দিনে খবরটা পেয়ে যেত! আমাকে জানাতে হ'তো না এই দুঃসংবাদ। তুই তো লিখিস-টিখিস। বলতে পারিস, কোন্ ভাষায় আতোয়ারের মৃত্যু-সংবাদটা আলোকে জানাব, কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেব?

বছরের পর বছর প্রতীক্ষার পর যে আজ একটু সুখের স্বপ্ন দেখছে, কোন্ প্রাণে গুঁড়িয়ে দেবো তার সেই স্বপ্নসৌধ ?

তোর শাহাব

স্তম্ভিত, নিথর হ'য়ে বসে রইলাম। জলে চোখ ঝাপসা হ'য়ে গেছে। দূরে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরটা আর দেখা যাচ্ছে না। চোখের সামনে শুধুই ধূসর আকাশের ক্যানভাস। সেখানে একটিই ছবি ; মশাল হাতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে একটি ছেলে পাশে তার আলো।

কতো সময় কতো লোকের মৃত্যু খবর লিখে গেছি অবলীলায়। কিন্তু আজ ? আমার অন্তরাত্মা কেঁদে কেঁদে চীৎকার ক'রে বলছে, না শাহাব, জানি না, আলোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি জানি না—জানি না।